মহাকাশের কথা

ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী

প্রকাশনার তিন দশকে

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০০১
পুনর্মুদ্রণ
এপ্রিল ২০০৯

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
বিল্লাল কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
১৪০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-70152-0087—9

MOHAKASHER KOTHA (Features of the Deep Sky)
By Farseem Mannan Mohammedy.
Published By Milan Nath, Anupam Prokashani
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price Tk. 140.00 Foreign US $ 5

মুখবন্ধ

"মহাকাশ আমাদের পরম ঠিকানা" —এই স্লোগান সামনে রেখে আমরা কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহী তরুণ যখন ১৯৯১ সালে 'বিশ্ব জ্যোতির্বিজ্ঞান দিবস' পালন করি তখন ঘূণাক্ষরেও ভাবিনি বাংলায় মহাকাশ বিষয়ে আমার দ্বারা কোনো বই লেখা হবে। কিন্তু আজ প্রায় এগারো বছর পর যখন আমার আরেকটি বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে এবং সেটাও মহাকাশের উপর, আমার সত্যিই বেশ আনন্দ হচ্ছে। বিশেষ করে এই সময়ে যখন আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভূষিত হয়েছে। আজ বাংলায় বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় নিয়ে লিখতে পেরে তাই বেশ গর্ব হচ্ছে। যাহোক ব্যক্তিগত সংলাপের এখানেই ইতি টানা যাক।

"মহাকাশের কথা" বইটি লেখা হয়েছে সাধারণ পাঠকের জন্যে। মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ছে বা তার বেশি যেকোনো বয়সের পাঠক এই বইটি পড়ে আনন্দ পাবেন আশা করি। মহাকাশের সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি ছবি দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মহাকাশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যথাসম্ভব সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি পাঁচ পর্বে ভাগ করা—প্রথম পর্বে মহাকাশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে সৌরজগতের নানা বিষয়, তৃতীয় পর্বে নক্ষত্রের বিবিধ ধর্মাবলী সংক্ষেপে এবং চতুর্থ পর্বে গ্যালাক্সিদের নিয়ে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম পর্বে সৃষ্টিতত্ত্বের নানা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। বলে রাখা ভালো, এ বইয়ে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য উল্লিখিত হয়েছে তা বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। তত্ত্ব ঠিক থাকলেও এসব তথ্য সময়ের সাথে বদলে যেতে পারে। সেটাই বাঞ্ছনীয়, কারণ মহাকাশ বিষয়ে সর্বদাই নতুনতর তথ্যের আবির্ভাব ঘটছে। তাই পাঠক সরবরাহকৃত তথ্যের কাল সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। দ্বিতীয় পর্ব ব্যতিরেকে এ বইয়ে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তার উপর বিস্তারিত জানতে হলে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আমার লেখা *জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান পরিচিতি* পড়ে দেখা যেতে পারে। মূলত উক্ত গ্রন্থের একটি সহজ সংস্করণ হলো বর্তমান বইটি। তাছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জানতে হলে আমার লেখা বাংলা একাডেমী প্রকাশিত *জ্যোতির্বিজ্ঞান শব্দকোষ* দেখা যেতে পারে। যারা মহাকাশ বিষয়ে আরো বেশি জানতে ইচ্ছুক তাদের জন্যে উক্ত বইটি একটি চমৎকার হ্যান্ডবুকের কাজ করবে। তাছাড়া মহাকাশ বিষয়ে জানবার জন্যে সহায়ক বইপত্রের একটি তালিকা বর্তমান বইয়ের শেষে 'গ্রন্থসূত্র' -এ সংযোজিত হয়েছে। এই বইয়ের শেষে যুক্ত 'জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ওয়েবসাইট' আগ্রহী পাঠককে ইন্টারনেটে মহাকাশ বিষয়ে তথ্য আহরণ করতে সাহায্য করবে।

১৯৯৪ থেকে ২০০০— এই সাত বছর সময়কালে এ বইয়ের প্রবন্ধগুলি রচিত এবং এদের প্রায় সবগুলিই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; যেমন—*দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক সকালের খবর, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, পুরোগামী বিজ্ঞান* ও *মহাকাশ বার্তা*। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠানোর ব্যাপারে যিনি নিরন্তর তাগাদা দিতেন এবং যিনি একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখার ব্যাপারে সবসময়ে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, সেই অগ্রজপ্রতিম অপরেশ ব্যানার্জির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ বই দ্রুত প্রকাশের ব্যাপারে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং যিনি এ বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন তিনি শ্রদ্ধেয় সুব্রত বড়ুয়া। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে লেখার ব্যাপারে তাঁর মতামত পদে পদে সাহায্য করেছে। অনুপম প্রকাশনীর মিলন নাথকে ধন্যবাদ তাঁর মৌলিক সহযোগিতার জন্য।

আমরা থার্ড মিলেনিয়ামে পা দিয়েছি। তাই নতুন মিলেনিয়ামে বাংলা ভাষাভাষী নতুন মানুষের কাছে মহাকাশকে জানতে এ বইটি সহায়ক হবে— এই আশাই রাখছি।

১ ফেব্রুয়ারি ২০০১

ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী
প্রভাষক, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

মহাকাশের কথা (৯—১৮)
মহাবিশ্ব : আমাদের পরম ঠিকানা / ১১
গতিময়তার বিশ্বে / ১৩
ব্যাপকতার বিশ্বে / ১৫
সৃষ্টি রহস্য যুগে যুগে / ১৮

সূর্য ও তার সাথীরা (২১—৬০)
আমাদের সৌরপরিবার / ২৩
সৌরপরিবারের জন্মরহস্য / ৩২
চাঁদমামার গল্প / ৩৭
ধূমকেতু সমাচার / ৪৩
তুঙ্গাস্কার অমীমাংসিত রহস্য / ৫০
ধূমকেতু-বৃহস্পতি সংঘর্ষ / ৫৬

তারার জগতে হাতছানি (৬১—৭৮)
তারার দূরত্ব ও উজ্জ্বলতা / ৬৩
তারা বর্ণালি / ৬৫
তারা জ্বলে মিটমিট / ৬৮
তারার নিয়তি / ৭০
তারার জন্মকথা / ৭৫
নক্ষত্র ও আমরা / ৭৭

"ওই যে সুদূর নীহারিকা" (৭৯—৯৬)
"ওই যে সুদূর নীহারিকা" / ৮১
আকাশগঙ্গা ছায়াপথ / ৮৩
হরেকরকম গ্যালাক্সি / ৮৬
প্রতিবেশী কয়েকটি গ্যালাক্সি / ৮৮
গ্যালাক্সিদের ধর্ম / ৮৯
দূরাকাশের দূরতম বস্তু : কোয়েসার / ৯১
দলবদ্ধ গ্যালাক্সিগুচ্ছ / ৯৩
গ্যালাক্সির জন্মকথা / ৯৫

"মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে" (৯৭—১৩৫)
প্রসারমান বিশ্ব / ৯৯
বিশ্বের পটভূমি বিকিরণ / ১০১
বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বসমূহ / ১০৩
হকিঙের ভাবনাগুচ্ছ /১০৬
বস্তুকণার গভীরে / ১১০
প্রকৃতির বল-চতুষ্টয় / ১১৩
সৃষ্টির মাহেন্দ্র ক্ষণে / ১১৫
মহাবিশ্বের নিয়তি / ১১৭
বহির্বিশ্বে প্রাণ / ১২৩
বিশ্বের সৌন্দর্য / ১৩১

শেষের অধ্যায় / ১৩৬

গ্রন্থসূত্র / ১৩৮
জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি ওয়েবসাইট / ১৪১
সৌরজগতের তথ্যাবলী / ১৪২

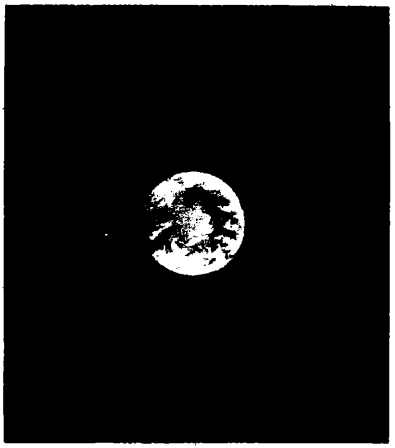

মহাকাশের কথা

মহাবিশ্ব : আমাদের পরম ঠিকানা

অনেকে বর্তমান সময়কে বলে থাকেন 'মহাকাশ যুগ'। ভাবতে অবাক লাগে, যে মানুষ একসময় ছিল প্রকৃতির দাস, বিজ্ঞানের উন্নতির বদৌলতে সে কিনা প্রাচীন পাথরের যুগ থেকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে মহাকাশ যুগে! বিরাট, সুবিপুল এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের বাস। আমাদের অতি পরিচিত, অতি আপন পৃথিবী এই ব্রহ্মাণ্ডেরই একটি অতিক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু এই মহাকাশে আর কী কী থাকে? তারা কারা, কী তাদের পরিচয়?

রাতের আকাশে আমরা লক্ষ-কোটি তারার মেলা দেখতে পাই। এদের নিয়েই আমাদের বিশ্বজগত। একসময় মানুষ মনে করত তারাগুলো সব বহুদূরে কোথাও স্থির হয়ে জ্বলছে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা আজ জানতে পেরেছি যে এগুলো শুধু জ্বলন্ত প্রদীপ নয়। বরঞ্চ কেউ কেউ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্যাস ও ধূলির সমাহার, কেউ নীহারিকা, কেউ গ্যালাক্সি, কেউ বা তারা, কেউ বা গ্রহ। অকল্পনীয় দূরত্বের কারণেই এদের এত ছোট্টটি দেখায়। রাতের আকাশের এইসব অতন্দ্র প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে কত অজানা কবি, দার্শনিকের হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে সেটা বিশ্বসাহিত্যের সাথে যাঁরা সম্যক পরিচিত তাঁরাই বুঝতে পারবেন। শিশু শ্রেণীতে পড়া "twinkle, twinkle, little star.....". কবিতার ঐ মিটিমিটি তারাগুলো যে কি বিরাট, বিপুল আকৃতির ও ভরের সমাহার তা কল্পনা করাই দুঃসাধ্য। যাহোক আস্তে আস্তে এদের সাথে প্রাথমিক পরিচয়টা সেরে ফেলা যাক্।

নীহারিকা (nebula) হচ্ছে গ্যাস ও ধূলির এক বিপুল সমাহার। বহু বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই নীহারিকার গ্যাস ও ধূলি হতে নক্ষত্র জন্ম নিতে পারে। অন্ধকার রাতে, মেঘমুক্ত আকাশে লক্ষ করলে দেখা যাবে এক দিগন্ত হতে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত মহাকাশ জুড়ে একটি আলোর পথ। এর নাম **গ্যালাক্সি** (galaxy)। গ্যালাক্সি আসলে কোটি কোটি গ্রহ, নক্ষত্র ও নীহারিকার সমাহার। আমরা যে ছায়াপথে বাস করি প্রাচীন পণ্ডিতরা তার নাম দিয়েছিলেন আকাশগঙ্গা (সুরগঙ্গা বা স্বর্গগঙ্গা)। পাশ্চাত্য নাম হচ্ছে Milky Way। **নক্ষত্র** বা **তারা** হচ্ছে এক একটি অতি উত্তপ্ত গ্যাসের বল। যেমন আমাদের সূর্য। **গ্রহরা** কোনো তারার চারদিকে ঘুরপাক খায়। যেমন আমাদের পৃথিবী। গ্রহদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। এরা নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত। আর গ্রহকে ঘিরে ঘুরপাক খায় **উপগ্রহ**। যেমন আমাদের চাঁদমামা। গ্রহের ইংরেজি নাম Planet—যা একটি গ্রীক শব্দ এবং এর অর্থ হল যাযাবর (wanderer)। আমাদের সূর্যের চারদিকে নয়টি গ্রহ ঘুরছে। এরা হলো—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এরা সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে। এছাড়া আছে **ধূমকেতু** (Comet)। এরা পানি, মিথেন ইত্যাদির জমাটবদ্ধ বরফ ও ধূলিকণার সমন্বয়ে গঠিত। এরা উপবৃত্তাকার বা অধিবৃত্তাকার পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। যখন এরা সূর্যের কাছে

আসে তখন উত্তাপে এদের উপাদানগুলো বাষ্পীভূত হয়ে লেজ তৈরি করে। ধূমকেতুর সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো এদের কোটি কোটি মাইল লম্বা লেজ। অনেকে এদের "নোংরা বরফের গোলা" বলেন। **গ্রহাণুরা** হলো বড় বড় পাথরের টুকরো (৫ থেকে ১০ কি. মি. ব্যাসার্ধের)। **উল্কা** হচ্ছে গ্রহাণুর সমান বা ছোট পাথরের টুকরো যারা ইতস্তত ছুটে বেড়ায়। এদের মহাজাগতিক আবর্জনা বলে। এই সমস্ত মিলিয়েই আমাদের সৌর-পরিবার।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে দূরত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সূর্য থেকে গ্রহদের দূরত্ব নির্ণয়ে যদিও মাইল-কিলোমিটার ব্যবহৃত হয় তথাপি সৌরজগৎ ছাড়িয়ে গেলেই এত বড় বড় দূরত্ব আর মাইল-কিলোমিটারে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তাই নতুন একক ব্যবহার করতে হয়। সবচেয়ে ব্যবহৃত একক হলে **আলোক-বছর** (light-year)। আলো এক বছর সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই এক আলোকবছর। আমরা জানি আলোর বেগ ৩,০০,০০০ কি. মি. / সে.। তাহলে এক বছরে এটি মোট ৩ × ১০^{৫} × (৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০) = ৯·৪ × ১০^{১২} কি. মি. পথ অতিক্রম করে। কাজেই ১ আলোকবছর = ৯·৪ × ১০^{১২} কি. মি. = ৫·৮৬ × ১০^{১২} মাইল। কি বিশাল দূরত্ব, ভাবতেই হাত-পা হিম হয়ে যায়! আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্র হতে সূর্যের দূরত্ব ৩০,০০০ আলোকবছর। সূর্যের সবচেয়ে কাছের তারা প্রক্সিমা-সেন্টরি'র দূরত্ব ৪·৩ আলোকবছর। আরেকটি একক হলো **'পারসেক'** (Parsec)। কোনো তারা পার্থিব দুটি পর্যবেক্ষণস্থানের মধ্যে যদি ১ সেকেন্ড (১″) কোণ তৈরি করে তবে ঐ তারার দূরত্ব ১ পারসেক। অর্থাৎ ১ পারসেক = ৩.২৬৩ আলোকবর্ষ। আরেকটি তবে কম ব্যবহৃত একক হলো **জ্যোতির্বিদ্যার একক** (Astronomical Unit, A. U.)। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্বকে ১ জ্যোতির্বিদ্যার একক বলে। ∴ ১ জ্যোতির্বিদ্যার একক = ৯,৩০,০৫,০০০ মাইল।

প্রায় ১২ বিলিয়ন বছরের বুড়ো এই মহাবিশ্বে আমাদের বাস। রাতের তারায় ভরা আকাশ শুধু সৌন্দর্যের আধারই নয় বরঞ্চ বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য ভরা এক বিস্ময়কর স্থান। পারস্যের জ্যোতির্বিদ, কবি ওমর খাইয়ামের সুরে বলতে ইচ্ছে হয়ঃ

পৃথিবী থেকে সাত আকাশের বিস্তৃতি বহুদূর
শনি গ্রহের দুয়ার পেরিয়ে পথরেখা বক্রর
সকলই বন্দী আমার জ্ঞানের সীমানার বন্ধনে,
তবু অজ্ঞাত মৃত্যু এবং ভাগ্যলিপির সুর।।

গতিময়তার বিশ্বে

প্রাচীন কালে মানুষ মনে করত দূর আকাশের ঐ মিটিমিটি তারাগুলো আসলে স্থির, নিশ্চল প্রদীপ—দেবতারা যাদের রেখেছেন রাতের আকাশ পাহারা দিতে বা নাবিকের দিক নির্দেশনার জন্য। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের এই 'বিশ্বচিত্রটি' আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে উন্নতির সাথে সাথে আজ আমরা জানতে পেরেছি ওরা মোটেও স্থির নেই। বিপুল গতিবেগে সবাই এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু অকল্পনীয় দূরত্বের কারণেই ওরা আমাদের কাছে আপাতভাবে স্থির মনে হয়। 'বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার' চিত্রটি হচ্ছে বিশ্বচরাচরের প্রত্যেকটি বস্তুই চলমান। 'পরম স্থিতি' বা 'যেখানে কোনো কিছু চলে না' জাতীয় কোনো ধারণা বৈজ্ঞানিক বিশ্বচিত্রে অনুপস্থিত। আমাদের দৃষ্টির সীমারেখা আমরা যতই বাড়াই ততই দেখি গতির জয় জয়কার। সৌরজগতে গ্রহগুলো চলমান সূর্যকে ঘিরে, সূর্য গ্রহদের নিয়ে চলমান ছায়াপথের কেন্দ্রকে ঘিরে, সম্পূর্ণ ছায়াপথ চলমান বিরাট একটি গ্যালাক্সি স্তবকের দিকে। এবং পুরো মহাবিশ্বই সম্প্রসারমান। অর্থাৎ স্থান-কাল বিস্তৃতি সর্বদাই প্রসারিত হচ্ছে। ফলে কোনো কিছুরই স্থির থাকার জো-টি নেই। অন্যদিকে দৃষ্টি যদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুতে দেই দেখবো কেন্দ্রীনকে ঘিরে ইলেকট্রন প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। কী অদ্ভুত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। "গতিতে জীবন, স্থিতিতে মরণ" -এই যেন বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ছাড়া পণ!

আমাদের পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একটি উপবৃত্তাকার (ডিমের মতো) কক্ষপথে ঘুরছে এবং এই পরিভ্রমণের বেগ হচ্ছে ১৮.৫ মাইল প্রতি সেকেন্ডে (৩০ কি. মি. / সে.)। আর সূর্য সেকেন্ডে ১৯.৫ কিলোমিটার বেগে একটি বিন্দুর দিকে ছুটে চলছে। এই বিন্দুটি অভিজিৎ (Vega) তারার খুব কাছে। এই যাত্রাপথে সূর্যের সঙ্গী তার বিরাট সৌরপরিবার ঃ ৯টি গ্রহ, তাদের উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু। শুধু এখানেই শেষ নয়। সূর্য ও তার আশপাশের নক্ষত্ররাজি ; একটি কেন্দ্রীয় অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। এই অক্ষটি ধনুরাশির তারাস্তবকের দিকে অবস্থিত। একবার পুরো ঘুরে আসতে সময় লাগে বিশ কোটি (দুশো মিলিয়ন) বছর!

আড়াই শতক আগে হ্যালী দেখিয়েছিলেন যে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধক (Sirius) নিশ্চল নয়। এর একটা বেগ আছে ; যদিও তা বড়ই সূক্ষ্ম। আসলে খালি চোখে তারাদের গতিবেগ বের করা বা বোধগম্য হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। বড় কথা হলো, মানবজাতির এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোনো তারাস্তবকই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গাঠনিক পরিবর্তন আনেনি। আর আগেই বলেছি এর কারণ হচ্ছে তারাদের অকল্পনীয় দূরত্ব। একটি তারা আছে, নাম বার্নার্ডের তারা। এটি সূর্যের দ্বিতীয় নিকটতম। এই তারাটি একবছরে আকাশে যতটুকু পথ চলে তা চোখে মাত্র ১০″ (দশ সেকেন্ড) কোণ তৈরি করে। অর্থাৎ চাঁদের আপাত ব্যাস (পৃথিবীতে চাঁদের ব্যাস যে কোণ তৈরি করে, প্রায় $\frac{১^{০}}{২}$) অতিক্রম করতেই বার্নার্ডের তারা দু'শো বছর সময় নেবে। আর এটাই আকাশের তারাদের মধ্যে আপাতভাবে সবচেয়ে বেশি বেগমান নক্ষত্র।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের কথায় আসা যাক। এর পাশ্চাত্য নাম Big Dipper বা Great Bear। আরো একটি নাম Ursa Major। এর প্রতিটি তারার বেগ আছে এবং যেহেতু তাদের বেগ একইদিকে নয় তাই এই মণ্ডলীর চেহারা বদলে যাওয়া কথা এবং সেটা হয়েছেও। এর প্রতিটি তারার যে বেগ সেটা হিসেব করে এক লক্ষ বছর আগে এটি কেমন ছিল এবং এক লক্ষ বছর পর কেমন হবে তা বোঝা যায় নিচের ছবি তিনটে দেখলেই। অতীতে একে অনেকটা বর্শার মতো দেখাত। আরেকটি স্তবক, সিংহ রাশির তারাসমূহ এখন যেমন সিংহের বিক্রম দেখায়, ১০ লক্ষ বছর পরে এরা একই রকম বিক্রম কিছুতেই দেখাতে পারবে না। কারণ তাদের চেহারাটাই বদল হয়ে যাবে। এযাবৎ কালে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ বেগ (আপাত বেগ নয়, সঠিক বেগ) হচ্ছে কপোতমণ্ডলের (Columba) একটি তারার। যার বেগের মান হচ্ছে সেকেন্ডে ৫৮৩ কি. মি.।

মার্কিন মুলুকের জ্যোতির্বিদ ড. কার্ল সেগান এই মহাজাগতিক গতির একটি নান্দনিক বর্ণনা দিয়েছেন ঃ "পৃথিবী প্রতিদিন সূর্যের চারদিকে ২$\frac{১}{২}$ মিলিয়ন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ; এই বেগ পৃথিবী যে বেগে আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে তার আটগুণ এবং আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সি স্বয়ং যে বেগে কন্যারাশির (Virgo) দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার দ্বিগুণ।"

অন্যভাবে বলা যায়, জন্মসূত্রেই আমরা মহাকাশচারী।

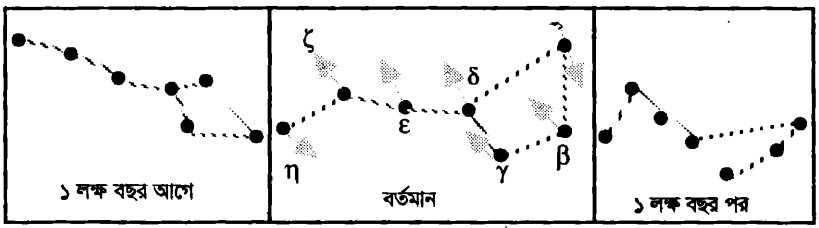

সপ্তর্ষিমন্ডলের চলন।

ব্যাপকতার বিশ্বে

অকল্পনীয়ভাবে বড় এক বিশ্বে আমাদের বাস। এমন অনেক নক্ষত্র আছে যারা সূর্যের তুলনায় কয়েক হাজার গুণ বড়, অথচ সুবিশাল দূরত্বের জন্য এদেরকে একটি বিন্দুর মতো দেখায়। আর এরকম হাজারে হাজারে দানবাকৃতির নক্ষত্র আছে। ইতোমধ্যে পূর্ববর্তী রচনাগুলোর মাধ্যমে আলোকবর্ষ নামে দূরত্বের এককের সাথে পরিচয় ঘটেছে। এখন আমরা এর প্রায়োগিক দিকটি দেখব।

আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথে মোট নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার কোটি (২০০ বিলিয়ন ; ১ বিলিয়ন =১০^{৯})। আমাদের সূর্যের নিকটতম তারার নাম প্রক্সিমা সেন্টরি। এর দূরত্ব ৪.৩ আলোকবর্ষ। অর্থাৎ সেখান থেকে আলো আসতেই সময় লাগে ৪ বছরের মতো। দুটি নক্ষত্রের মধ্যের দূরত্ব এত তাহলে ২০ হাজার কোটি নক্ষত্রের প্রত্যেকের মধ্যের দূরত্ব এরকম ধরে নিলে আমাদের ছায়াপথের আকারটা কীরকম দাঁড়ায় সেটা ভাবা যেতে পারে। আমাদের ছায়াপথ একটা প্যাঁচানো ছায়াপথ, অনেকটা স্প্রিঙের মতো। একে বলে কুণ্ডলিত ছায়াপথ। চওড়ায় এটি প্রায় ১ লক্ষ আলোকবর্ষ ঃ মানে এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আলোকরশ্মি পৌছতে সময় নেয় ১ লক্ষ বছর। আমাদের সূর্য এই ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ পৃথিবী কোনো বিশেষ অবস্থানেও নেই। আমাদের ছায়াপথের সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সিটির নাম অ্যান্ড্রোমিডা (ধ্রুবমাতা)। এটিও একটি কুণ্ডলিত গ্যালাক্সি। এর দূরত্ব ২০ লক্ষ (দুই মিলিয়ন) আলোকবর্ষ। এই দুই ছায়াপথের মাঝখানের স্থানকে বলা হয় আন্তঃগ্যালাক্সীয় স্থান। এখানে হয়ত নিরুত্তপ্ত গ্যাস, ধূলা বা অবপারমাণবিক কণিকা সামান্য পরিমাণে থাকতে পারে।

দূরত্ব ও বিশালত্বের আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'জ্যেষ্ঠা' বা Antares নামের নক্ষত্রটি সূর্য থেকে ৫২০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এর ব্যাস প্রায় ৫৬ কোটি কি. মি.। অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে যদি সূর্যের স্থানে বসানো যায় তবে মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথ পর্যন্ত এর ভেতর চলে যাবে। পশ্চিম আকাশে লালচে তারা হিসেবে একে দেখা যায়। আরেকটি নক্ষত্র 'স্বাতী' (Arcturus) যার ব্যাস সূর্যের ৩০ গুণ, অর্থাৎ ২৭ হাজার সূর্যকে এর মধ্যে এঁটে দেওয়া যাবে। মার (Mira) নামের আরেকটি বিশাল অতিদানব তারা আছে যার ব্যাস ৪.২৪ × ১০^{৮} কি. মি. —সূর্যের প্রায় ৩০০ গুণ। ফলে ২.৭ কোটি সূর্যকে এর মধ্যে ঠেসে দেওয়া যাবে। আর একা সূর্যের মধ্যে ভরা যাবে ১৩ লক্ষ পৃথিবী। এর বেশি আর উদাহরণ দেবার দরকার আছে কি!

সম্প্রতি কোয়েসার নামে একধরনের অতিদূর মহাজাগতিক বস্তু পাওয়া গিয়েছে। এদের একটি হচ্ছে 3C 9। এর দূরত্ব ৯০০ কোটি আলোকবর্ষ। এরাই বর্তমান বিশ্বের শেষ সীমানা (এখন পর্যন্ত)। এই দূরত্বের ওপারে ($১০^{২৬}$ মিটার) যে কী আছে তা কেউ জানে না।

গড়ে প্রতিটি ছায়াপথে তারার সংখ্যা ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রায় দশ হাজার কোটি ($১০^{১১}$)। আবার মহাবিশ্বের গ্যালাক্সির সংখ্যাই দশহাজার কোটি। অর্থাৎ মোট তারার সংখ্যা $১০^{১১} \times ১০^{১১} = ১০^{২২}$; অর্থাৎ দশ কোটি কোটি কোটি (দশ বিলিয়ন ট্রিলিয়ন)। এইসব নক্ষত্রের কেউ সূর্যের মতো, কেউ বা দানবাকৃতির, কেউ বা ছোট বামনাকৃতির।

এই বিপুল তারার মেলায় পৃথিবীর স্থান কত নগণ্য। এমনকি এটা কোনো বৈশিষ্ট্যসূচক অবস্থানেও নেই, কোনো কিছুর কেন্দ্রেও নেই। আর বোঝাই যাচ্ছে সূর্যের অবস্থাও অনুরূপ। অথচ প্রাচীনকালে মানুষ বিশ্বাস করত পৃথিবীই সবকিছুর কেন্দ্রে। এই 'পৃথিবীকেন্দ্রীক' মতবাদের সুসংহত রূপ দিয়েছিলেন টলেমী। এই মতবাদের যখনই বিরোধিতা করা হয়েছে তখনই পুরোহিততন্ত্র বেঁকে বসেছে। পৃথিবী যে কোনো কিছুর কেন্দ্রে নেই এবং আমাদের জগতের মতো যে (প্রায়) অসীম সংখ্যক বিশ্ব থাকতে পারে—এ কথা বলার জন্য জিওর্দানো ব্রুনোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। গ্যালিলিওকে কারাভোগ করতে হয়।

যাহোক, বস্তুজগতের বাস্তবতায় ফেরা যাক। এখন আলোকবর্ষের ব্যাপারটা চিন্তা করা যাক। ১ বছর সময়ে আলোর অতিক্রান্ত দূরত্বই আলোকবর্ষ। ফলে যেসব বস্তুর দূরত্ব আলোকবর্ষের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে তাদের আলো পৃথিবীতে আসতেই বছরকে বছর পেরিয়ে যায়। ফলে বর্তমানে আমরা যেসব নক্ষত্রের আলো দেখি সেটা কিন্তু বহুবছর আগেকার আলো। অর্থাৎ আমরা অতীত দেখছি! না, এটা কোনো ফ্যান্টাসি নয়, এটা বাস্তব সত্য। মহাজাগতিক দূরবর্তী বস্তুসমূহের কেবলমাত্র অতীত চিত্রটাই আমরা দেখতে পাই। ঠিক এই মুহূর্তে সেখানে কী ঘটছে তা আমরা কোনোদিনই জানব না। কারণ আলোর বেগই চূড়ান্ত বেগ। এর চেয়ে দ্রুতগামী কিছু হতে পারে না। (কারণ, আপেক্ষিকতত্ত্ব অনুযায়ী তখন ভর অসীম হয়ে যায় যা অসম্ভব)। এখানেই কিন্তু কাল-প্রসারণ (Time dilation) এর ধারণা নিহিত। এটা অনেক উচ্চতর বিষয় এবং বর্তমান আলোচনার সীমাবহির্ভূত।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, মহাবিশ্বে এতো শূন্যতা কেন? কয়েকটি জায়গায় ভরের সমাবেশ হলো কেন? সর্বোপরি বিশ্বের চেহারা এরকম কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর হয়ত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান দিতে পারবে। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদী মনে ওমর খাইয়ামের সুর প্রতিধ্বনিত হয় :

প্রথম যেদিন প্রজ্জ্বলন্ত ধূমকেতু পার হয়ে
যাত্রা আমার মাটির ধূলায় জীবন-পণ্য লয়ে
আকাশে তখন সজাগ প্রহরী পারভীন-মুশতারী
আমাকে অশেষ আশ্বাসবাণী কানে কানে গেল কয়ে।।
[পারভীন = কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডল, মুশতারী = বৃহস্পতি গ্রহ]

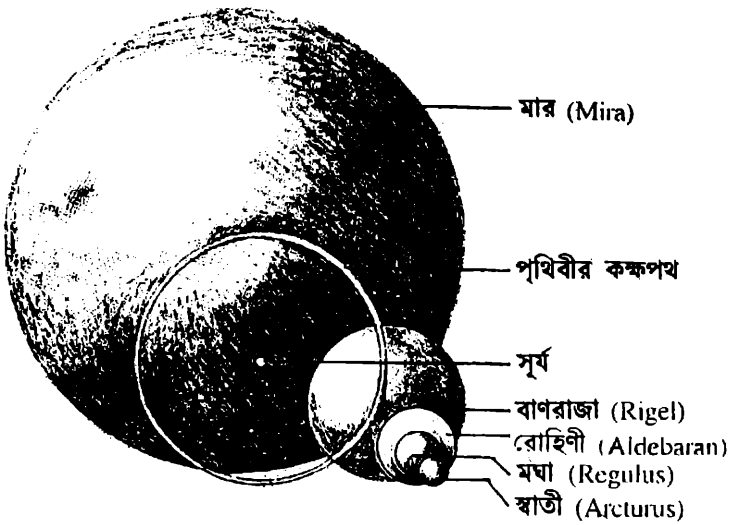

কয়েকটি নক্ষত্রের তুলনামূলক চিত্র।

সৃষ্টিরহস্য যুগে যুগে

প্রাচীন গ্রন্থ 'ঋগ্বেদ' থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

১। সেকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কী ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল? ২। তখন মৃত্যুও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না।.....৩। সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও জলময় ছিল। .....৭। এ নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হলো, কেউ সৃষ্টি করেছেন কি করেননি, তা তিনিই জানেন, যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানতে পারেন! (১০ম মণ্ডল, ১২৯ সুক্ত)

ঋগ্বেদের এই নির্বেদ উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যে সময়ে ঋগ্বেদ লেখা হয়েছিল তখনও সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে মানুষের চিন্তা ছিল ভয়াতুর রহস্যে ভরা। একটা রহস্য, একটা প্রহেলিকার পর্দা বিরাজ করছে যেন। কিছুই ছিল না আবার ছিলও। অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের এক মিস্টিক টানাপোড়েন লক্ষ করা যায়। এমনও বলা হয়েছে যে যিনি স্রষ্টা তিনিই সব রহস্য জানেন, কিন্তু তার পরক্ষণেই তার এই ঐশ্বরিক জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে (৭ম শ্লোকটি খেয়াল করুন)। কিন্তু এত রহস্য কেন? কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই কেন সৃষ্টি সম্পর্কে? এবার আমরা দৃষ্টি ফেরাই ঋগ্বেদের প্রায় দেড় হাজার পর রচিত বাইবেল-এ। বাইবেলের আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের (জেনেসিস) প্রথম কয়েকটি বাণীতে সৃষ্টিকাহিনী রচিত হয়েছে :

১। আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ২। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল (লেট দেয়ার বি লাইট, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট)। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন। আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস এবং অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল। ৩। পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক ও জলকে দুইভাবে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন, তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।

দেখা যাচ্ছে, বাইবেলের সময়ে মানুষের চিন্তাভাবনা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এখানে একজন ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং কীভাবে সৃষ্টি করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ করতে হবে যে এখানে সৃষ্টিকার্যে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। ঋগ্বেদের রচয়িতাদের প্যাগান মনে সৃষ্টি সংক্রান্ত যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল তার জায়গায় বাইবেলে আছে নিশ্চিত জ্ঞান। স্বীকার করতেই হবে, অনিশ্চয়তা থেকে নিশ্চয়তায় এই উত্তরণ মানুষের চিন্তার ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এরপর আমরা বাইবেলের প্রায় দুই হাজার বছর পরেকার একজন প্রোথিতযশা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিঙের সৃষ্টি সংক্রান্ত চিন্তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। একালের বিখ্যাত বিজ্ঞানী হকিং তাঁর সাড়া জাগানো বই 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' -এ লিখেছেন :

ঘটনার ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক বিধিসমূহের সার্থকতা দেখে আজকাল অনেকেই বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর বিশ্বকে একসেট ভৌত আইনের অধীনে বিবর্তিত হতে দিয়েছেন এবং এই সব আইন ভাঙার জন্য বিশ্বের ঘটনায় তিনি কখনো বাধা দেন না। যাহোক, এই আইনগুলি কিন্তু আমাদের বলে না সৃষ্টির সময়ে বিশ্ব কীরকম ছিল—তাই ঘড়িতে দম দেবার কাজটা এখনো ঈশ্বরের হাতেই ন্যাস্ত আছে এবং তিনিই নির্ধারণ করবেন এটি কীভাবে চালু করতে হবে। বিশ্বের যদি কোনো শুরু থাকে তবে মনে হতে পারে যে এর একজন স্রষ্টা আছে। কিন্তু বিশ্ব যদি সম্পূর্ণ স্বয়ংভর হয়, যার কোনো সীমানা বা ধার নেই, তাহলে বিশ্বের কোনো শুরুও থাকবে না এবং এর কোনো শেষও থাকবে না : এর কেবল অস্তিত্ব থাকবে। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের অবস্থান কোথায়?

উপরের এই তিনটি লেখনি মানবেতিহাসের তিনটি সময়কালের প্রতিভূ যাদের মধ্যে সময়ের পার্থক্য দেড় থেকে দুই হাজার বছর। গত চারহাজার বছরে মানুষের চিন্তা কীভাবে বদলেছে এই তিন টুকরো চিত্র তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রথমে বেদে আমরা দেখেছি আদিতে কিছুই ছিল না, সবই জলমগ্ন ছিল। তারপর সব কিছু সৃষ্টি হলো। কে করল, কীভাবে করল তা আমাদের জানানো হয়নি। এর দেড় হাজার বছর পর বাইবেলে দেখা যাচ্ছে সবকিছুই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এবং কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ দিনানুক্রম আছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মানুষের চিন্তায় হঠাৎ করেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। হকিঙের সীমানাহীনতার শর্ত মেনে নিলে বিশ্বের কোনো শুরু এবং শেষ থাকে না। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের অবস্থান নিয়ে সংশয় আছে বৈকি! এই তিনটি খণ্ডচিত্র মানুষের চিন্তার ইতিহাসে সৃষ্টি সংক্রান্ত ভাবনার বিবর্তন চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। আজ থেকে দুই হাজার বছর পর সৃষ্টিতত্ত্ব কেমন হবে জানতে ইচ্ছে হয়!

কসমোলজির বিষয়টি মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে পুরনো বিষয়—সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জানতে চেয়েছে মহাবিশ্বের কীভাবে বিবর্তন হয়েছে, এটা কোথা থেকে এসেছে, কী এর নিয়তি, এটা সসীম না অসীম—সর্বোপরি বিশ্ব আসলে কী? এই দার্শনিক ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরসুরী আজকের কসমোলজি। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার মিথে, পোড়ামাটির ট্যাবলেটে, পুঁথিতে-গল্পে-গাথায় আমরা এইসব চিরন্তন প্রশ্নকে ঘুরেফিরে আসতে দেখি। বিভিন্ন ধার্মিক-আঞ্চলিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-আচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক কসমোলজি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রথাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের এই চিরন্তন কৌতূহলের একটি সুসঙ্গত, যুক্তিগ্রাহ্য এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস পেয়েছে। ড. কাজী মোতাহার হোসেনের অননুকরণীয় প্রবন্ধ *"অসীমের সন্ধানে"* থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "জ্ঞানপিপাসু মানব-মন ক্রমাগত চেষ্টার ফলে জ্ঞানের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। সে জানে যে তাহার জানিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তথাপি সে আকাশমণ্ডলের আশ্চর্য ঘটনা ও নিদর্শনাদি দেখিয়া তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সচেষ্ট। সে দৃশ্যমান জগৎকে মনশ্চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া আকৃতি-বিহীন কুজ্ঝটিকা হইতে পরিণত নক্ষত্রের এবং পরিণত নক্ষত্র হইতে মৃতকল্প অন্ধকার জ্যোতিষ্কের সৃষ্টিরহস্য আলোচনা করিতেছে।"

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রসারিত হয়ে চলেছে অর্থাৎ গ্যালাক্সিসমূহ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই মহাজাগতিক প্রসারণের শুরু হয়েছে বহু আগে (~১২ বিলিয়ন বছর) ঘটে যাওয়া এক মহাবিস্ফোরণ থেকে। ভবিষ্যতে হয়ত এই প্রসারণ বন্ধ হয়ে শুরু হবে সংকোচন — এবং বিশ্ব একসময়ে পুনরায় একটি বিন্দুতে মিলিত হবে। অথবা এমনও হতে পারে যে বিশ্ব অনন্তকাল ধরে প্রসারিত হতে থাকবে। এই মূল সমস্যাই কসমোলজির কেন্দ্রীয় বিষয়।

তবে বলে রাখা ভালো, এসব সমস্যা খুব একটা সহজ নয় এবং এককথায় এদের উত্তর দেওয়াও সম্ভব নয়। কসমোলজির কোনো একটি প্রতিভাসকে ব্যাখ্যা করতে হলে আনুষঙ্গিক অন্যবিধ বহু বিষয়ই জানতে হয়। কাজেই এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অধিকতর অসমাহিত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এটাই তরুণবিজ্ঞানীদের সামনে সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ! প্রায়োগিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মহাশূন্যে হাব্‌ল দুরবিন সংস্থাপিত হয়েছে ; বৃহস্পতি, ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহ ছাড়িয়ে প্রায় সৌরজগতের সীমানা ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে ভয়েজার-২ নভোযান ; মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠে জরিপ চালিয়েছে দূর-নিয়ন্ত্রিত যান পাথফাইন্ডার ; দূরবর্তী বেশ কয়েকটি নক্ষত্রে গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

মহাবিশ্বের কাঠামো (structure) বলতে নক্ষত্র-গ্যালাক্সি-গ্যালাক্সিস্তবক এবং গ্যালাক্সিসমূহের মহাস্তবক কাঠামোর যে পারম্পর্য তৈরি করেছে তাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এরাই বিশ্বের গাঠনিক উপাদান। কসমোলজিতে একটি প্রসারমান বিশ্বের কথা চিন্তা করা হয় যা ব্যাপক পটভূমিতে (large scale) সমসত্ত্ব ও দিকনিরপেক্ষ বা সমরূপ। অর্থাৎ যেকোনো দিক থেকে বিশ্বকে একইরকম দেখাবে। কাজেই এখানে দর্শকের কোনো বিশেষ অবস্থান নেই। আধুনিক বিশ্বচিত্রে প্রতিটি দর্শকই নিজকে সমগ্র জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব দিকনিরপেক্ষ (isotropic)। ব্যাপক পটভূমিতে বিশ্ব যে দিকনিরপেক্ষ তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় মাইক্রোতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের সুষমতা থেকে। এসব সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হতে পারে যে, হয় আমরা কোনো গোলকাকার বিশ্বের একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় অবস্থানে অবস্থান করছি ; নতুবা একটি সুষম-দিকনিরপেক্ষ বিশ্বে আমাদের বাস যেখানে দর্শকের কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই। প্রথম বিশ্বচিত্রটি সুপ্রাচীন এবং টলেমীর হাতে তা পরিপক্বতা পায়। তাছাড়া বিশ্বের অন্য যেকোনো গ্যালাক্সির বাসিন্দাই এরকমটি ভাবতে পারেন। তাই দ্বিতীয় বিশ্বচিত্রটিই গ্রহণযোগ্য। এখানে মানুষ তার কেন্দ্রীয় চরিত্রটি হারিয়ে ফেলে ; এখানে সে অনেকটাই যেন ব্রাত্য! আধুনিক বিশ্বচিত্রে হাব্‌ল বিধি কার্যকর— গ্যালাক্সিসমূহ দূরত্বের অনুপাতে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিস্ফোরণের পর বিশ্বের প্রসারণের ফলে এর তাপমাত্রা কমে যায় এবং বর্তমানে তা পটভূমি বিকিরণ হিসেবে বিরাজ করছে। এই বিশ্বচিত্রে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব যোগ করলে বিশ্বে বিরাজমান হাল্কা মৌলের অনুপাত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যা পর্যবেক্ষণসম্মত। তাছাড়া বিশ্বের বয়স সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

এসব সার্থকতা মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। সে এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সৃষ্টির রহস্য উদ্ধার করা সম্ভব এবং তা বোধগম্য। নিজের মনীষার উপর এই আস্থা মানুষকে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। এর জোরেই মানুষ বর্তমানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে দূর ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় :

সর্বব্যাপী বাজয় জগৎ;
নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন, মৃত্যুঞ্জয় জ্বলন্ত হৃদয়;
হয়তো মানুষ মরে, কিন্তু তার বৃত্তি বেঁচে রয়;
জন্ম হতে জন্মান্তরে সংক্রমিত প্রত্ন মনোরথ।।

এই 'নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন' কেবল মানুষের দ্বারাই রচনা সম্ভব।

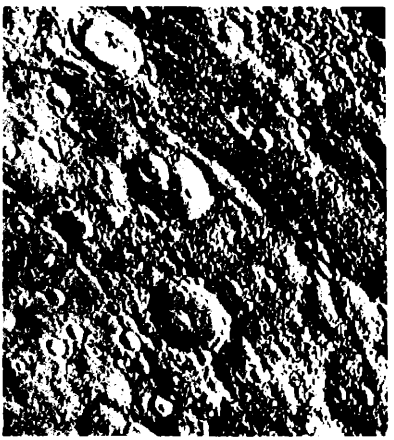

সূর্য ও তার সাথীরা

আমাদের সৌরপরিবার

চিরপরিচিত এই সৌরজগতের বাসিন্দাদের নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব। এই বিশাল পরিবারের অধিপতি সূর্য, কিন্তু এর সদস্য সংখ্যা মোটে নয়টি। এছাড়া আছে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রহাণু, ধূমকেতু এবং গ্রহদের উপগ্রহ। সম্প্রতি সৌরপরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানা গিয়েছে। গত দুই দশক ধরে যেসব নভোযান বিভিন্ন গ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল তারা অত্যাশ্চর্য অপার্থিব সব ছবি পাঠিয়েছে। ১৯৭৪ সালে বৃহস্পতির পাশ দিয়ে পায়োনিয়ার-১০ উড়ে যায়। এর কিছু পরেই ভয়েজার-১ ও তারপর ভয়েজার-২ বৃহস্পতি, ইউরেনাস ও নেপচুন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাঠায়। বর্তমানে ভয়েজার-২ নভোযানটি সূর্য থেকে ১০.৪ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটাই এখন পর্যন্ত মানুষের পাঠানো সবচেয়ে দূরবর্তী নভোযান। এটি এখন সৌরজগতের সীমানা পেরিয়ে আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে প্রবেশের অপেক্ষায় আছে। অতিসম্প্রতি মঙ্গলে প্যাথপাইন্ডার এবং গ্লোবাল এক্সপ্লোরার নভোযান অভিযান চালিয়েছে। প্যাথফাইন্ডার ও তার ছোট্ট রোভার সোজার্নার মঙ্গলের মাটি-পাথর নিয়ে গবেষণা করেছে। যার সম্পর্কে চূড়ান্ত ফলাফল ও সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। বৃহস্পতি এবং এর বেশ কয়েকটি উপগ্রহকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে গ্যালিলিও নভোযান। এটি অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে। তাছাড়া শনির উদ্দেশ্যে প্রেরিত ক্যাসিনি মিশন ভবিষ্যতে তার লক্ষ্যে পৌঁছবে এবং আশা করি এ থেকে আমরা অনেক তথ্য পাবো।

সূর্য

আমাদের সৌরজগতের অধিপতি। পৃথিবীর প্রাণচাঞ্চল্যের যাবতীয় উৎস এই সূর্য। সূর্যের প্রবল মহাকর্ষীয় আকর্ষণই গ্রহগুলোর কক্ষপথ নিয়ন্ত্রণ করে। নক্ষত্র হিসেবে সূর্য তেমন আহামরি গোছের কোনো তারা নয়। এটি মাঝারি ধরনের বামন তারা যার বর্ণালি শ্রেণী জি-টু। এর ভর পৃথিবীর ভরের তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার গুণ, আয়তন পৃথিবীর তিন লক্ষ গুণ এবং ঘনত্ব এক-চতুর্থাংশ। সূর্যের উপরের পৃষ্ঠভাগকে *আলোকমণ্ডল* (ফটোস্ফিয়ার) বলে। এই অঞ্চলে চৌম্বকক্ষেত্রের আবির্ভাবের জন্য *সৌরকলংকের* সৃষ্টি হয়। যেখানে সৌরকলংকের সৃষ্টি হয় সে অঞ্চলের তাপমাত্রা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় কম থাকে বলে পৃথিবী থেকে একে কালো দেখায়। সৌরকলংক বা Sunspot সাধারণত ১১ বছর পরপর দেখা যায়। এ সময়ে পৃথিবীর বেতার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় যথেষ্ট গোলযোগ হয়। সৌরকলংকের সময়ে আলোকমণ্ডলের উপরে বর্ণমণ্ডলে (ক্রোমোস্ফিয়ার) বিস্তৃত আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এ থেকে ক্ষণস্থায়ী, অতিপ্রখর আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হয়, একে সৌরছটা (flare) বলে। বর্ণমণ্ডলেরও উপরে সূর্যের আবহাওয়াকে *সৌরমুকুট* (corona) বলে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ে কেবল একে চাঁদের

কালো চাকতির, যা সূর্যকে ঢেকে দেয়, চারপাশে দেখা যায়। সৌরমুকুটের তাপমাত্রা এক থেকে দেড় মিলিয়ন কেলভিন অথচ সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৫৭০০ কেলভিন। এই আপাত অসামঞ্জস্যের কোনো কারণ জানা যায়নি। সৌরমুকুটের কোনো কোনো জায়গায় পদার্থ ঘনীভূত হয়ে উজ্জল দেখায়—একে *সৌরশিখা* (prominence) বলে।

সূর্যের ভেতরটা কীরকম? বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করে সূর্যের অভ্যন্তরভাগের সম্ভাব্য মডেল প্রস্তাব করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, সূর্যের কেন্দ্রভাগের ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের ০.৩ গুণ। এর বাইরের অঞ্চলটি বিকিরণ অঞ্চল যার পুরুত্ব সূর্যের ব্যাসার্ধের ০.৪ গুণ। এবং এখানকার তাপমাত্রা ৮ মিলিয়ন কেলভিন। সবশেষে আছে পরিচলন অঞ্চল যেখানে তাপ পরিচলন প্রক্রিয়ায় বাহিত হয়ে পৃষ্ঠে পৌঁছে। ঠিক যেভাবে পানিকে গরম করা হয় সেভাবেই অভ্যন্তরীণ তাপীয় চুল্লির সাহায্যে সূর্যের পৃষ্ঠভাগকে উত্তপ্ত করে তোলা হয়।

সূর্যের মধ্যে চলছে এক ব্যাপক তেজ উৎপাদন এবং তেজ বিকিরণের কর্মকাণ্ড। আসলে এটি একটি প্রকাণ্ড নিউক্লিয়ার চুল্লি। এটি মূলত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতি সেকেন্ডে সূর্যে ৪০ লক্ষ টন পদার্থ ফিউশন প্রক্রিয়ায় শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। কি বিপুল এই শক্তি সম্ভার! সূর্যের মোট বিকিরিত শক্তির পরিমাণ ৩.৯ × $১০^{২৭}$ কিলোওয়াট। সূর্য আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে ৩০০০০ আলোকবর্ষ দূরে ধনুরাশির দিকে অবস্থিত। সূর্যের বর্তমান বয়স ৪.৫ বিলিয়ন বছর এবং এটি আরো ৬ বিলিয়ন বছর প্রজ্জ্বলিত থাকবে। এরপর সূর্য প্রসারিত হয়ে অবশেষে সাদা বামনতারায় পরিণত হবে। সূর্যের পুরো জীবনকাল সম্ভবত ১০ বিলিয়ন বছর। অতিসম্প্রতি ইউলিসিস নামের একটি নভোযান সূর্যকে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে। এখান থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এক নজরে সূর্য

		সূর্যের অভ্যন্তরে ঃ	
দূরত্ব	১৪৯৬০০০০০ কি. মি.	ঘনত্ব	১৪০ গ্রাম / সি. সি.
ব্যাস	১৩৯২০০০ কি. মি.	তাপমাত্রা	১৫.৫ মিলিয়ন কেলভিন
পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল	৬.০৮৭ × $১০^{১২}$ কি. মি.^{২}	ঘূর্ণনকাল	
আয়তন	১.৪১২ × $১০^{১৮}$ কি. মি.^{৩}	বিষুবীয় অঞ্চলে	২৬.৯ দিন
ভর	২ × $১০^{৩০}$ কি. গ্রা.	মেরু অঞ্চলে	৩১.১ দিন
গড় ঘনত্ব	১.৪১ গুণ (পানির তুলনায়)		
মুক্তিবেগ	৬১৮ কি. মি. / সে.	বর্ণালি	G2V বামন
পৃষ্ঠতাপমাত্রা	৫৭৭০ কেলভিন		

বুধ (Mercury)

সূর্যের সবচেয়ে কাছের, বোধহয় সবচেয়ে আদরের গ্রহ বুধ। রোমান পুরাণের দেবদূত মার্কারির নামানুসারে এর নাম করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর সংকেত ☿ যা প্যাঁচানো সাপ নির্দেশ করছে। সূর্যের প্রখর আলোর জন্য একে সহসা খালি চোখে দেখা যায় না। বসন্তকালে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে এবং শরৎ বা হেমন্তে সূর্যোদয়ের পূর্বে

পুব-দিগন্তে একে দেখা যায়। সূর্যের খুব কাছে বলে এর পৃষ্ঠতাপমাত্রাও অত্যন্ত বেশি। বুধগ্রহে তেমন কোনো কৌতূহলোদ্দীপক কিছু নেই। একেবারে খটখটে নটবর! এর চেহারাটাও চাঁদের মতোই কুৎসিত। মেরিনার-১০ নভোযানের তোলা ছবি থেকে দেখা গেছে যে এর ভূ-ভাগ অসংখ্য চড়াই-উৎরাই ও খাদে পরিপূর্ণ। বুধের পৃষ্ঠের ক্র্যাটার, শৈলশিরা, উপত্যকা, খাড়াই, পাহাড়-পর্বত ও সমভূমির স্পষ্ট ছবি তুলেছে এই নভোযান। বুধের দুর্বল অভিকর্ষের কারণে কোনো বাতাবরণ নেই বললেই চলে। অতীব হাল্কা যে বায়ুমণ্ডল আছে তার উপাদান হলো হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন। প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে থেকেই বুধের সমস্ত আগ্নেয় ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাই এর পৃষ্ঠদেশের কোনো পরিবর্তন নেই। বুধের রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চৌম্বকক্ষেত্র। লক্ষ করা গেছে, বুধের কক্ষপথের একটা ধীর পরিবর্তন ঘটছে। বুধের অনুসূর (সূর্যের সবচেয়ে কাছের বিন্দু) বিন্দুর পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ঘটনা মূর্ত হয়ে ওঠে। একে বলে বুধের অনুসূর বিন্দুর অগ্রগমন। দেখা গেছে, এক লক্ষ বছরে কক্ষটি একবার পূর্ণ আবর্তন করে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব দিয়ে এটি ব্যাখ্যা করা যায়।

এক নজরে বুধ

সূর্য থেকে দূরত্ব : ৫৭৯১০০০০ কি. মি.	নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণনকাল : ৫৮.৬৪৬২ দিন
ভর : ৩.৩০৩ × $১০^{২৩}$ কি. গ্রা.	কক্ষের চারপাশে আবর্তনকাল : ৮৭.৯৬৯ দিন
ব্যাসার্ধ : ২৪৩৯.৭ কি. মি.	তাপমাত্রা : রাতে -১৮০ ডিগ্রি এবং দিনে ৪৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
গড় ঘনত্ব : ৫.৪২ গ্রাম / সি. সি.	

শুক্র (Venus)

শুক্রকে পৃথিবীর *যমজবোন* বলা চলে। কারণ এর আকৃতি-প্রকৃতির সাথে পৃথিবীর অনেকখানি সাদৃশ্য রয়েছে। রোমান পুরাণের সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী ভেনাসের নামে এর নাম; এর কারণ গ্রহটির উজ্জ্বলতা। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর সংকেত ♀ যা একটি ছোট হাত-আয়না নির্দেশ করছে। শুক্রগ্রহের বাতাবরণে অত্যন্ত ঘন মেঘস্তর আছে। এর ফলে যে গ্রীনহাউজ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাতে এর ভূপৃষ্ঠ থাকে অত্যন্ত উত্তপ্ত। পৃষ্ঠের পাথরগুলো অত্যধিক তাপে তেতে লালচে হয়ে ওঠে। পুরু সালফিউরিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ মেঘ ভেদ করে রেডারের মাধ্যমে জানা গেছে যে এখানে বড়ো বড়ো আগ্নেয়গিরি আছে এবং এরা সক্রিয়ও বটে। গ্রহপৃষ্ঠের অত্যধিক তাপমাত্রা, আধা অন্ধকার পরিবেশ এবং অ্যাসিড মেঘ—এসব বিষাক্ত উপাদান শুক্রগ্রহকে নরকতুল্য করে তুলেছে। কাজেই এ পরিবেশে প্রাণের সম্ভাবনা চিন্তাও করা যায় না। এর কোনো উপগ্রহ নেই। এই গ্রহ সম্পর্কে ভেনেরা-৪ (১৯৬৭) এবং মেরিনার-৫ (১৯৬৭) ও ১০ (১৯৭৪) নভোযান অনেক তথ্য দিয়েছে। শুক্রগ্রহে জোরালো বায়ুপ্রবাহ লক্ষ করা গেছে। বাতাসের এই স্রোত গ্রহটিকে চারদিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। শুক্রের পৃষ্ঠে মসৃণ সমতলভূমি যেমন আছে তেমনি

পাহাড়, আগ্নেয়গিরি ও মহাদেশীয় উচ্চভূমিও দেখা যায়। শুক্রের ঘূর্ণন যথেষ্ট ধীর বলে এর চৌম্বকক্ষেত্রও খুব দুর্বল। নিজস্ব অক্ষের চারিদিকে শুক্রগ্রহ ডানাবর্তে (ঘড়ির কাঁটার দিকে) ঘোরে। অন্যান্য গ্রহে (ইউরেনাস ও প্লুটো বাদে) উল্টোটি দেখা যায়। ভোরের আকাশে 'শুকতারা' এবং সন্ধ্যার আকাশে 'সন্ধ্যাতারা' হিসেবে শুক্রগ্রহ দীর্ঘদিন মানুষের সুখ-দুঃখের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

এক নজরে শুক্র

সূর্য থেকে দূরত্ব : ১০৮২০০০০০ কি. মি.	নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণনকাল : ২৪৩.০১৮৭ দিন
ভর : ৪.৮৬৯ × $১০^{২৪}$ কি. গ্রা.	কক্ষের চারপাশে আবর্তনকাল : ২২৪.৭০১ দিন
ব্যাসার্ধ : ৬০৫১.৮ কি. মি.	তাপমাত্রা : পৃষ্ঠভাগে ৪৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
গড় ঘনত্ব : ৫.২৫ গ্রাম / সি. সি.	

পৃথিবী (Earth)

সৌরজগতের একমাত্র স্থান যেখানে বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশ ঘটেছে। আমাদের অতিপ্রিয় মাতা ধরিত্রী। প্রাচীন গ্রীকদের ধরিত্রীদেবী ছিল গেইয়া। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর সংকেত ⊕ যা গ্রীসে গোলকের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা পরিবর্তনশীল। পানি বিধৌত এই সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বসুমতী কিন্তু ভূগাঠনিকভাবে এখনো সক্রিয়। এর মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় প্লেটগুলো ধীরে সঞ্চরমান। পৃথিবী পৃষ্ঠে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির জন্য দায়ী হলো পৃথিবীর একদা সংকোচন, পরিচলন, খনিজের দশা পরিবর্তন, অগ্ন্যুতপাত ইত্যাদি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে (ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ কি. মি. উপরে) প্রতি ঘনসেন্টিমিটার জায়গায় ০.১৩২ ওয়াট সৌরবিকিরণ এসে পড়ে যার মাত্র ৪৯% ভূপৃষ্ঠে এসে পৌছে। পৃথিবীর জলবায়ু নির্ভর করে অনেকগুলো নিয়ামকের উপর। সমুদ্রতটের সাথে পানির ঘর্ষণের ফলে পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্য ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবী সম্পর্কে এত কিছু বলার আছে যে তা লিখতে গেলে কয়েকখানি বই-ই লিখে ফেলা যায় এবং তা হয়েছেও। এখানে তাই বেশি কিছু বলার সুযোগ সীমিত। মহাশূন্য থেকে এই স্বপ্নভূমিকে নীল, বাদামী আর সবুজের মিশেলে এবং চিরচঞ্চল সাদা মেঘের আঁচড়ে অদ্ভুত সুন্দর মনে হয়।

এক নজরে পৃথিবী

সূর্য থেকে দূরত্ব :১৪৯৬০০০০০ কি. মি.	নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণনকাল : ০.৯৯৭২৭ দিন
ভর : ৫.৯৭৬ × $১০^{২৪}$ কি. গ্রা.	কক্ষের চারপাশে আবর্তনকাল : ৩৬৫.২৫৬ দিন
ব্যাসার্ধ : ৬৩৭৮.১৪ কি. মি.	তাপমাত্রা : গড়ে ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
গড় ঘনত্ব : ৫.৫১৫ গ্রাম / সি. সি.	

মঙ্গল (Mars)

সূর্যের চতুর্থ গ্রহ। কখনো কখনো শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলকে একত্রে *'তিনবোন'* বলা হয়। মঙ্গলের রয়েছে হাল্কা একটি বাতাবরণ। এর বাতাস লৌহসমৃদ্ধ ধূলোয় পূর্ণ তাই একে লাল দেখায়। এর বাতাবরণে প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া গেছে। মঙ্গলের লালচে রঙের জন্য একে রোমান যুদ্ধ দেবতা 'মার্স' এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর সংকেত ♂ যা মার্সের বর্শা ও ঢাল নির্দেশ করছে। মঙ্গলের আকৃতি ছোট বলে এর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ। মঙ্গলে একটি সুউচ্চ আগ্নেয়গিরি আছে যার নাম *অলিম্পাস মন্‌স্‌* যার কাছে ভাইকিং নভোযান অবতরণ করেছিল। এর উচ্চতা প্রায় ১৫ মাইল। এর মেরু অঞ্চল বরফাচ্ছাদিত। মঙ্গলের দুটি বিসদৃশ উপগ্রহ আছে যাদের নাম ফোবোস এবং ডিমোস। বড়োটি অর্থাৎ ফোবোস মঙ্গলকে ৭.৬৫ ঘণ্টায় এবং ডিমোস ৩০.৩ ঘণ্টায় পরিভ্রমণ করে। দুটোই বহু খাদযুক্ত। মঙ্গলে বালিয়াড়ি জাতীয় গঠন দেখা গেছে। এখান থেকে বালির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। তাছাড়া মঙ্গলে বায়ুর ক্ষয়ক্রিয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখা গেছে। মঙ্গলের উত্তর গোলার্ধে নতুন সৃষ্ট সমভূমি দেখা যায়। আর দক্ষিণ গোলার্ধে দেখা যায় প্রাচীন ক্র্যাটারের সমাবেশ এবং বড়ো বড়ো অববাহিকা। উত্তর গোলার্ধে খালের মতো অসংখ্য নালা জালের মতো বিস্তৃত। মনে হয় আদিম পরিবেশে মঙ্গলে ছিল তরল পানির অস্তিত্ব । এমনকি বর্তমানেও মঙ্গলের পৃষ্ঠের নিচে তরল পানির অস্তিত্ব থাকা বিচিত্র নয়। এই পানি সম্ভবত মঙ্গলে অণুজীবের বিকাশে সাহায্য করেছিল। এই অণুজীবের সম্ভাব্য মাইক্রো-ফসিল অ্যান্টার্কটিকার একটি উল্কাপিণ্ডে পাওয়া গেছে। এটাই বর্তমানে বিজ্ঞানীদের মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট আশাবাদী করে তুলেছে। সম্প্রতি প্যাথফাইন্ডার ও তার ছোট রোভারযান সোজার্নার মঙ্গল-পৃষ্ঠে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং এর মাটি, পাথর, বালি নিয়ে গবেষণা করেছে। এর সম্পূর্ণ তথ্য ও ফলাফল নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি।

এক নজরে মঙ্গল

সূর্য থেকে দূরত্ব : ২২৭৯৪০০০০ কি. মি	নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণনকাল : ১.০২৫৯৫৭ দিন
ভর : ৬.৪২১ × $১০^{২৩}$ কি. গ্রা.	কক্ষের চারপাশে আবর্তনকাল : ৬৮৬.৯৮ দিন
ব্যাসার্ধ : ৩৩৯৭.২ কি. মি.	তাপমাত্রা : গড়ে -৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
গড় ঘনত্ব : ৩.৯৪ গ্রাম / সি. সি.	

বৃহস্পতি (Jupiter)

গ্রহরাজ বৃহস্পতি ভরে এবং ভারে সৌরজগতের সবচেয়ে বড়ো গ্রহ। সে সূত্রে সব গ্রহের গুরুজন। অন্য সব গ্রহের মিলিত ভরের দ্বিগুণের চেয়েও বৃহস্পতির ভর বেশি। এর আরবি নাম *'মুশতারী'*। রোমান পুরাণের দেবরাজ জুপিটারের নামানুসারে এর নাম করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর সংকেত ♃ যা বজ্রপাতের প্রাচীন চিহ্ন নির্দেশ করছে। ভর পৃথিবীর ৩১৮ গুণ অথচ ঘনত্ব মোটে এক-চতুর্থাংশ। এর আবর্তন বেগ সবচেয়ে কম। এই গ্রহটি আসলে ঘুরন্ত গ্যাসের বল যার অভ্যন্তরভাগে অর্থাৎ কেন্দ্রে চাপের ফলে

গ্যাস তরলীভূত হয়ে রয়েছে। এর বায়ুমণ্ডলে অনবরত চলছে প্রচণ্ড আলোড়ন। এরকম একটি প্রচণ্ড আলোড়নে সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী এক ঘূর্ণির যাকে দূর থেকে বৃহস্পতির গায়ে একটি লালচে দাগের মতো মনে হয়। এর নাম Great Red Spot—এর আয়তনই পৃথিবীর তিনগুণ। বৃহস্পতির বাতাবরণে নানান গ্যাসের মিশেল দেখা যায়—হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, মিথেন, অ্যামোনিয়া, পানি-বাষ্প ও সালফারের যৌগ ইত্যাদি। এতোসব গ্যাসের মিশ্রণের ফলে এটি এতো বর্ণিল! ভয়েজার-১ ও ২ নভোযানের অভিযানের ফলে বৃহস্পতির একটি ক্ষীণ বলয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত গ্রহরাজের ১৭টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের নাম : গ্যানিমিড, ক্যালিস্টো, ইউরোপা, আয়ো, অ্যাড্রাস্টিয়া, মেটিস, অ্যামালথিয়া, থিবি, লেডা, হিমালিয়া, লাইসিথিয়া, এলারা, আনাঙ্কে, কার্মে, প্যাসিফি ও সিনোপি। প্রথম চারটি গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন বলে এদের নাম *গ্যালিলিয়ান স্যাটেলাইট*।

এক নজরে বৃহস্পতি

সূর্য থেকে দূরত্ব : ৭৭৮৩৩০০০০ কি. মি.	নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণনকাল : ০.৪১৩৫৪ দিন
ভর : ১.৯ × ১০^{২৭} কি. গ্রা.	কক্ষের চারপাশে আবর্তনকাল : ৪৩৩২.৭১ দিন
ব্যাসার্ধ : ৭১৪৯২ কি. মি.	তাপমাত্রা : মেঘের উপরে -১৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
গড় ঘনত্ব : ১.৩৩ গ্রাম / সি. সি.	

বেশ কিছুদিন আগে ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে শুমেকার-লেভি-৯ নামের ধূমকেতুটি ২১ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বৃহস্পতির পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে। এ নিয়ে দুনিয়াজোড়া আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সম্প্রতি গ্যালিলিও নভোযান বৃহস্পতিসহ এর বেশ কয়েকটি উপগ্রহকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে। এমনকি এটি ইউরোপার মাত্র ২০০ কি. মি. ওপর দিয়ে উড়ে যায়। এই ইউরোপার রয়েছে একটি চমৎকার মসৃণ পৃষ্ঠ যা সারা সৌরজগতে বিরল। এটি আমাদের চাঁদের তুলনায় ৫ গুণ বেশি উজ্জ্বল। ইউরোপার পৃষ্ঠের ঠিক নিচে একটি ভূগর্ভস্থ মহাসমুদ্রের জোর সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়। ইউরোপার ভর পৃথিবীর ০.০০৮৩ গুণ এবং ব্যাস ৩১৩৮ কি. মি.। আয়োতে রয়েছে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি যেখানে সালফারের যৌগ পাওয়া গেছে। এই আগ্নেয়-সক্রিয়তার কারণ হচ্ছে বৃহস্পতি, ইউরোপা ও গ্যানিমিডের মধ্যকার মহাকর্ষীয় টানাপোড়েন। উপগ্রহ ক্যালিস্টোর পৃষ্ঠ খাদে ভর্তি। বহু বর্ণের অদ্ভুত সুন্দর মিশেলে সুন্দরী বৃহস্পতি এখনো অনেক রহস্যের আধার।

শনি (Saturn)

সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এর ঘনত্ব পানির ঘনত্বের ০.৭ গুণ। অর্থাৎ শনিগ্রহকে যদি পানিতে ডোবানো যেতো তবে তা ভুস্ করে ভেসে উঠত। বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ শনিগ্রহের সাথে পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম অব্দ থেকে এটি ব্যাবিলনে পরিচিত ছিল। রোমান পুরাণের শস্য কাটার দেবতা হলো স্যাটার্ন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর সংকেত ♄ যা বাঁকা কাস্তে নির্দেশ করছে। শনির বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম সমৃদ্ধ। যে সামান্য মিথেন থাকে তার সূর্যালোকে ভেঙে গিয়ে অ্যাসিটিলিন, ইথেন ও প্রোপেন তৈরি করে। শনির চৌম্বকক্ষেত্রটি পৃথিবীর চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী। শনির সুবিখ্যাত এবং অতিরহস্যময় রাজকীয় বলয়-ব্যবস্থাটি গঠিত হয়েছে অগণিত কণা, পাথর ও ধূলিকণার সমন্বয়ে। পর পর দুটি বলয়ের মধ্যে রয়েছে বিশাল ফাঁক। এরকম সর্ববৃহৎ ফাঁকটির নাম *ক্যাসিনি ডিভিশন*। শনির এ পর্যন্ত ২১টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে : অ্যাটলাস, এপিমেথিয়াস, জ্যানাস, টেলিস্টো, ডাইয়ন, রিয়া, টাইটান, হাইপেরিয়ন, আইয়াপিটাস, ফীবি ইত্যাদি। টাইটান সৌরজগতের সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহ এবং এর একটি নিজস্ব বাতাবরণও রয়েছে। হাইপেরিয়ন উপগ্রহটি অনেকটা এবড়ো-থেবড়ো আলুর মতো। শনি সূর্য থেকে যে পরিমাণ বিকিরণ পায় তার অন্তত দুইগুণ বিকিরণ করে। অভ্যন্তরীণ কোনো শক্তি উৎসই এর জন্য দায়ী বলে মনে হয়।

এক নজরে শনি

সূর্য থেকে দূরত্ব : ১৪২৯৪০০০০০ কি. মি.	নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণনকাল : ০.৪৪৪০১ দিন
ভর : ৫.৬৮৮ × $১০^{২৬}$ কি. গ্রা.	কক্ষের চারপাশে আবর্তনকাল : ১০৭৫৯.৫ দিন
ব্যাসার্ধ : ৬০২৬৮ কি. মি.	তাপমাত্রা : মেঘের উপরে -১৮৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
গড় ঘনত্ব : ০.৬৯ গ্রাম / সি. সি.	

ইউরেনাস (Uranus)

সূর্যের সপ্তম গ্রহ। এই গ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে রোমান পুরাণে স্যাটার্নের পিতা এবং জুপিটারের দাদু দেবতা ইউরেনাসের নামানুসারে। প্লাটিনামের চিহ্ন থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর সংকেত ♅ আহরণ করা হয়েছে। আয়তনে পৃথিবীর চারগুণ। এর বায়ুমণ্ডল মিথেন সমৃদ্ধ। এই মিথেন সূর্যের লাল আলো শোষণ করে, তাই একে নীলচে দেখায়। এরও একটি অস্পষ্ট বলয়-ব্যবস্থা আছে। ইউরেনাসের অক্ষ তার কক্ষতলের প্রায় সমতলে ৯৮ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকে। ইউরেনাসের ৯৯% গঠনোপাদানই হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ; এছাড়া আছে সামান্য পরিমাণে মিথেন, অ্যামোনিয়া ও পানি-বাষ্প। এর উপগ্রহ ১৭টি : কর্ডেলিয়া, ওফেলিয়া, বিয়াঙ্কা, ক্রেসিডা, ডেসডিমোনা, জুলিয়েট, পোর্শিয়া, রোজিল্যান্ড, বেলিন্দা, পুক, মিরান্ডা, এরিয়েল, আম্ব্রিয়েল, টাইটানিয়া, ওবেরন এবং অতিসম্প্রতি আবিষ্কৃত ক্যালিবান ও সিকোরাক্স (৫ মি. ব্যাসের হেল টেলিস্কোপ ব্যবহার করে কর্ণেল ও টোরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এ দুটি অতীব ক্ষীণ উপগ্রহ আবিষ্কার করেছেন ; এদের ব্যাস যথাক্রমে ৮০ ও ১৬০ কি. মি.)। মিরান্ডাতে খাঁচ কাটা খাদ দেখা যায়। টাইটানিয়া ইউরেনাসের সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহ। এর পৃষ্ঠে অসংখ্য উপত্যকা, খাত ও চ্যুতি দেখা যায়। এরিয়েলে খাতের সংখ্যা খুবই কম।

এক নজরে ইউরেনাস

সূর্য থেকে দূরত্ব : ২৮৭০৯৯০০০০ কি. মি.	নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণনকাল : -০.৭১৮৩৩ দিন
ভর : ৮.৬৮৬ × $১০^{২৫}$ কি. গ্রা.	কক্ষের চারপাশে আবর্তনকাল : ৩০৬৮৫ দিন
ব্যাসার্ধ : ২৫৫৫৯ কি. মি.	তাপমাত্রা : মেঘের উররে -২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
গড় ঘনত্ব : ১.৬৪ গ্রাম / সি. সি.	

নেপচুন (Neptune)

এর গঠন ইউরেনাসের মতোই। সমুদ্রের মতো নীল রঙের হওয়ায় এই গ্রহটির নাম রাখা হয়েছে নেপচুন যিনি রোমান পুরাণের সমুদ্রদেবতা। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর সংকেত ♆ যা মাছ ধরার কোঁচ নির্দেশ করে। ইউরেনাসের মতোই এর রয়েছে ক্ষীণ বলয়-ব্যবস্থা। এর বাতাবরণ বৃহস্পতির মতো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। এর রয়েছে ৮টি উপগ্রহ : থ্যালাসা, ডেসপিনা, গ্যালাটিয়া, ল্যারিসা, প্রোটিয়াম, ট্রাইটন, নেরেইদ। ট্রাইটনের পৃষ্ঠ বেশ নবীন। এর নাইটোজেন সমৃদ্ধ বাতাবরণ আছে। জমাটবদ্ধ নাইট্রোজেন গেইসারের মতো ১০ কি. মি. উচুঁতে উঠে পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে।

এক নজরে নেপচুন

সূর্য থেকে দূরত্ব : ৪৫০৪৩০০০০০ কি. মি.	নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণনকাল : ০.৬৭১২৫ দিন
ভর : ১.০২৪ × $১০^{২৬}$ কি. গ্রা.	কক্ষের চারপাশে আবর্তনকাল : ৬০১৯০ দিন
ব্যাসার্ধ : ২৪৭৪৬ কি. মি.	তাপমাত্রা : মেঘের উপরে -২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
গড় ঘনত্ব : ১.৬৪ গ্রাম / সি. সি.	

প্লুটো (Pluto)

সৌরপরিবারের সর্বশেষ গ্রহ। গ্রীক পুরাণের ঐশ্বর্যের দেবতা হলো প্লুটো। তিনি আবার পাতালেরও শাষক। তাই সৌরজগতের সবচেয়ে দূরের এবং সবচেয়ে শীতল গ্রহটির নামও রাখা হয়েছে তার নামে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর সংকেত ♇ যা প্লুটোর নামের দুটি আদ্যক্ষর P এবং L বোঝাচ্ছে। এটি একটি পাথুরে গ্রহ এবং সূর্য থেকে অনেক দূরে বলে ভীষণ শীতল। এর একটি উপগ্রহ আছে। নাম ক্যারন, যার ব্যাস ১২০০ কি. মি.। প্লুটো ও ক্যারন আসলে একটি দ্বৈত গ্রহ-ব্যবস্থা। প্লুটোতে সম্ভবত কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড ও নাইট্রোজেন আছে। মেরু অঞ্চলে নাইট্রোজেন অথবা মিথেনের বরফ দেখা যায়। পরবর্তী দশকে এই দূরান্তের পড়শীর উদ্দেশ্যে একটি নভোযান পাঠানো হবে।

এক নজরে প্লুটো

সূর্য থেকে দূরত্ব : ৫৯১৩৫২০০০০ কি. মি.	নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘূর্ণনকাল : ৬৩৮৭২ দিন
ভর : ১.২৯ × ১০^{২২} কি. গ্রা.	কক্ষের চারপাশে আবর্তনকাল : ৯০৮০০ দিন
ব্যাসার্ধ : ১১৬০ কি. মি.	তাপমাত্রা : মেঘের উপরে -২৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
গড় ঘনত্ব: ২.০৫ গ্রাম / সি. সি.	

গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids)

মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে এক বিস্তৃত এলাকাব্যাপী অসংখ্য পাথর টুকরোকে দেখতে পাওয়া যায়। এরাও সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে। এদেরকে একত্রে *গ্রহাণুপুঞ্জ* বলে। বড় গ্রহাণুর ব্যাস কয়েকশ' কিলোমিটার এবং ছোটদের ব্যাস মাত্র কয়েক কি. মি. হতে পারে। মনে হয়, এরা প্রাক্তন কোনো গ্রহের ধ্বংসাবশেষ। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রহাণু হলো সেরেস, প্যালাস, জুনো, ভেস্টা। এ পর্যন্ত ৩৫০০টি গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের সম্মিলিত ভর চাঁদের ৫%। মাঝে মাঝে কোনো কোনো গ্রহাণু পৃথিবীর বিপজ্জনকভাবে কাছে চলে এসে পৃথিবীবাসীর ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দূর অতীতে পৃথিবীর ইতিহাসে গ্রহাণুর সাথে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটেছে বলে মনে হয়। নিকট অতীতে এর উদাহরণ হলো ১৯০৮ সালে সাইবেরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘটে যাওয়া প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আজকাল এই ঘটনার জন্য বহিরাগত কোনো গ্রহাণুকেই দায়ী করা হচ্ছে। লক্ষ্যহীন ভাসমান কোনো গ্রহাণুর সাথে সংঘর্ষ হলে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাণীই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মানবজাতীর অবস্থাও হবে তথৈবচ! তাই এসব গ্রহাণুদের চলার পথ সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এসব গ্রহাণুর চলার পথ বৃহস্পতির খবরদারীতে আর সূর্যের আকর্ষণের ফলে খুব জটিল হয়ে যায়। তাই খুব বেশি দূর ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সম্প্রতি একাজে কেয়স তত্ত্বকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

সৌরজগতের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ধূমকেতুদের আলোচনা করা হয়েছে পৃথক একটি অধ্যায়ে। আমাদের সৌরপরিবারের সাথে পরিচয় পর্বটুকুর সমাপ্তি এখানেই।

সৌরপরিবারের জন্ম রহস্য

আমাদের সৌরপরিবার নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। বর্তমান প্রবন্ধে সৌরপরিবারের জন্মরহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হবে। এটা অনেকটা ডিটেকটিভ কাহিনীর মতো। কারণ সেই প্রায় ৪৫০ থেকে ৫০০ কোটি বছর আগে আমরা কেউই ছিলাম না। কিন্তু বর্তমানে দৃষ্ট সৌরপরিবারের সদস্যদের আচরণ যদি লক্ষ করি তবে এ সম্পর্কে বেশ কিছু সূত্র পাবো। এদের অবলম্বন করে এবং বিশ্বের অন্যত্র পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে পুঁজি করে আমাদের এই সুপরিচিত বিশাল সৌরপরিবারের জন্ম রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা যাক।

লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর কাছাকাছি বুধ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের ঘনত্ব বেশি অর্থাৎ এসব অন্তস্থ গ্রহগুলো প্রধানত পাথুরে উপাদান এবং ধাতুজ বস্তু দিয়ে তৈরি। অন্যদিকে শনি, বৃহস্পতি, ইউরেনাস, নেপচুন—এসব বহিস্থ গ্রহগুলো প্রধানতই বায়বীয় পদার্থে নির্মিত। এই গ্রহগুলোর ঘনত্ব পানির তুলনায় খুব একটা বেশি না (তবে সব গ্রহেই আইসোটোপ অনুপাতের মান প্রায় একই)। আরেকটি ব্যাপার লক্ষ করার মতো, তা হলো এদের কক্ষীয় এবং অক্ষীয় ঘূর্ণন। সবগুলো গ্রহের কক্ষতল একই সমতলে অবস্থিত (সামান্য বিচ্যুতি ছাড়া) এবং সবগুলো গ্রহই ঘড়ির কাটার উল্টোদিকে সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে। আরেকটি ব্যাপার হলো যে সবগুলো গ্রহের নিরক্ষীয় তলই ভূ-কক্ষের সাথে কিছুটা আনত। অর্থাৎ এদের অক্ষ কিছুটা হেলে থাকে যেমন পৃথিবীর অক্ষ ২৩½ হেলে থাকে। কিন্তু ইউরেনাসের এই আনতি প্রায় ৯৮ ডিগ্রি যেটা বিসদৃশ। আরেকটা বিসদৃশ ব্যাপার হলো শুক্র গ্রহ সূর্যের চারদিকে যেদিকে দিয়ে ঘোরে নিজ অক্ষের চারদিকে ঘোরে তার উল্টোদিক দিয়ে। এছাড়া সবমিলিয়ে যে সূত্রগুলো আমাদের হাতে আছে সেগুলোকে সাজিয়ে লিখলে এরকম দাঁড়াবে ঃ

অক্ষীয় ও কক্ষীয় গতি ঃ

১। গ্রহ ও উপগ্রহসমূহের কক্ষপথ একই তলস্থিত।

২। এদের প্রায় সবার অক্ষীয় ও কক্ষীয় গতির দিক অভিন্ন।

৩। এদের প্রায় সবার অক্ষ ভূ-কক্ষের* উপর মোটামুটি লম্ব।

গ্রহের উপাদান ঃ

১। অন্তস্থ গ্রহ—ছোট আকৃতির, উচ্চঘনত্ব, কম উদ্বায়ী উপাদান।

২। বহিস্থ গ্রহ—দানবাকৃতির, নিম্ন ঘনত্ব, অধিক উদ্বায়ী উপাদান।

আন্তঃগ্রহ পদার্থ ঃ

১। গ্রহাণুপুঞ্জের নির্দিষ্ট বলয়।

২। ধূমকেতুর কক্ষ ও তাদের জন্মস্থল উর্টের মেঘ।

৩। আন্তঃগ্রহ ধূলিকণার বিস্তৃত বন্টন।

---

* ভূ-কক্ষ বা সূর্যপথ (ecliptic) হচ্ছে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষতল।

এবার আলোচনা করা যাক উৎপত্তি রহস্য। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে সৌরজগৎ সৃষ্টির বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন। তবে এখানে পৃথিবীকেন্দ্রিক সৌরজগতের যেকোনো তত্ত্বকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি। সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ নিয়ে প্রথম কাজ করেন রেনে দেকার্তে। দেকার্তের সৃষ্টিতত্ত্বকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান ইমানুয়েল কান্ট। এসবই ১৭৬০ সালের আগের ঘটনা। ১৭৯৬ সালে পিয়েরে সাইমন ডি লাপ্লাস, ১৯৪০ এ ফন ভাইৎস্যাকার নতুন চমক দেন এ ক্ষেত্রে। এর মাঝেও প্রচুর মতবাদ আমরা পেয়েছি। তবে বর্তমান সৃষ্টিচিত্রটি সযতনে গড়ে তোলা হয়েছে পূর্বতন এসব তত্ত্ব এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের মিশেল ঘটিয়ে।

সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রথম ধাপে দরকার একটি আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘের। মহাশূন্যে নক্ষত্রদের মাঝে থাকে বিশাল ব্যাপ্তি। এই শূন্যস্থানে থাকে অসংখ্য ধূলিকণা, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি। এসবই বিশাল একটা এলাকাব্যাপী ছড়িয়ে থাকে। এরকম বড় কোনো আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘ যদি যথেষ্ট ঘন হয় তবে সেটা তার পেছনের তারাদের আলো আসতে বাধা দেয় এবং তাপ শোষণ করে উত্তপ্ত হয়। এজন্য কোনো কোনো তারাস্তবকের ছবিতে দেখা যায় এদের মাঝে অনিয়মিত আকারের অন্ধকার অংশ—যেমন Horsehead এবং কালপুরুষ নীহারিকা। আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে এই মেঘ ও ধূলিকণা সুষমভাবে না ছড়িয়ে অনিয়মিতভাবে এখানে ওখানে মেঘের আকৃতিতে থাকে। এখানে ঘনত্ব কিছুটা বেশি থাকে। সূর্যের সমান ভরের পদার্থ এরকম মেঘে ছড়িয়ে থাকবে প্রায় দশ আলোকবর্ষ ব্যাপী। এ ধরনের মেঘে যেসব পদার্থের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়, একই পদার্থ সূর্যেও দেখা যায়—এতে থাকে ৮০ শতাংশ হাইড্রোজেন, ২০ শতাংশ হিলিয়াম ও অন্যান্য ভারি মৌল। কোনোভাবে এই গ্যাস খুব ছোট জায়গায় ঘন হতে থাকে। ঠিক কীভাবে এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় সেটা সুনিশ্চিত নয়। তবে এক্ষেত্রে জেম্‌স্ জীনসের তত্ত্ব কিছুটা সাহায্য করে। যখন মেঘটি মহাকর্ষীয় পতনের শিকার হলো তারপর থেকে সূর্যের জন্ম সূচিত হয়। আদি মেঘটিকে অবশ্যই ঘূর্ণায়মান হতে হবে (এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা-ই ঘটে)। কেন্দ্রের অংশটি খুব দ্রুত সংকুচিত হয়ে ভারি হয়ে ওঠে। এই অংশটি যতো সংকুচিত হয় ততো দ্রুত ঘূর্ণায়মান হবে। আর আদিমেঘের যদি কোনো চৌম্বকক্ষেত্র থাকে তবে কেন্দ্রেই তা শক্তিশালী থাকবে কারণ সেখানে ভর বেশি। বোঝাই যাচ্ছে কেন্দ্রে তৈরি হচ্ছে আমাদের নতুন সূর্য। একে আমরা বলব ভ্রূণসূর্য (protosun)।

এই ভ্রূণসূর্যের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। প্রথমে এটি অবলোহিত বিকিরণ দিতে থাকে এবং অনেক সময় পরে দৃশ্যমান আলোর বিকিরণ দেয়। যখন কেন্দ্রের তাপ ও চাপ যথেষ্ট বেড়ে যায় তখন শুরু হয় নিউক্লিয় বিক্রিয়া এবং এ পর্যায়ে প্রোটোসূর্য পরিপূর্ণ সূর্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়ের আগ পর্যন্ত যে আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘে এই জন্ম প্রক্রিয়াটি চলছিল তা কিন্তু পুরো অন্ধকারই ছিল। কারণ সূর্যের গর্ভে উৎপন্ন একটি আলোক-কণাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে সময় লাগে পুরো এক মিলিয়ন বছর! সূর্য সৃষ্টির এ প্রক্রিয়াটি মোটামুটি সুসংজ্ঞায়িত। তবে গ্রহ তৈরির ব্যাপারে আমাদের একটু বিশদ বর্ণনা দরকার হবে।

কেন্দ্রে যখন সূর্য তৈরি হয় তখন আশপাশের পদার্থ ঘূর্ণনের ফলে চাকতির বা ডিস্কের আকৃতি নেয়। কান্ট নিউটনের গতিবিজ্ঞান প্রয়োগ করে দেখান যে ঘূর্ণায়মান গ্যাসের মেঘ যখন সংকুচিত হয় তখন তা চাকতির রূপ নেয়। কেন্দ্রে নতুন সূর্য ও চতুর্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান এই গ্যাস চাকতিকে বলে সৌর নীহারিকা। এই সৌর নীহারিকায় কঠিন বস্তুকণার উদ্ভব হতে থাকে। কেন্দ্র থেকে যতোই বাইরে যাওয়া যায় তাপমাত্রা ততোই কমতে থাকে। ফলে সৌর নীহারিকার ভেতরের অংশের তুলনায় বাইরের অংশে উদ্বায়ী গ্যাসসমূহের আধিক্য বেশি। ভেতরের অংশে থাকে অনুদ্বায়ী পদার্থ যারা তুলনামূলক উষ্ণ তাপমাত্রায়ও কঠিন হয়। এর ফলে কেন্দ্রের কাছাকাছি অংশে তৈরি হয় পাথুরে উপাদানসমৃদ্ধ অসংখ্য গ্রহাণুসদৃশ বস্তু।

এই সময়ে মহাকর্ষীয় অস্থায়িত্বের কারণে সৌর নীহারিকায় কিছু আবর্ত (eddies, ছোট ছোট স্বতন্ত্র ঘূর্ণি) সৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি গ্রহাণুসদৃশ অসংখ্য ছোট ছোট বস্তু পরস্পর মিলে আকারে বড় হতে থাকে যা পরে গ্রহের আকৃতি নেয়। এবং সৌর নীহারিকা চাকতির ঘূর্ণনের দিক যেটি ছিল সেই দিকেই গ্রহদের ঘূর্ণন করতে দেখা যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম শুক্র ও ইউরেনাস। হয়ত কোনো বড় বস্তুপিণ্ডের সাথে এদের সংঘর্ষের ফলে ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তিত হয়েছে। এভাবে অন্তস্থ গ্রহদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় ঃ ১. ছোট ছোট কঠিন বস্তু ঘনীভূত হয়ে গ্রহাণুসদৃশ বস্তু তৈরি করে ; ২. গ্রহাণুসদৃশ বস্তু সম্মিলিত হয়ে গ্রহ তৈরি হয়। বহিস্থ গ্রহদের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে যে, প্রত্যাশিত পরিমাণে বেশি উদ্বায়ী পদার্থ সম্বলিত গ্রহাণুসদৃশ বস্তু প্রথম তৈরি হয় এবং পরে এগুলো মিলে গ্রহ তৈরি হয়। কিন্তু আরেকটি বিকল্প প্রস্তাব আছে। সেটি এই যে বহিস্থ গ্রহরা কোনো মধ্যবর্তী ঘনীভবন পর্যায়ে না গিয়েই সরাসরি সৌর নীহারিকার গ্যাস থেকে তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ সূর্য যেমন একটা ঘূর্ণায়মান গ্যাস আবর্ত থেকে জন্ম নিয়েছে, ঠিক তেমনি সৌর নীহারিকারই অন্তর্ভুক্ত স্বতন্ত্র কোনো গ্যাস আবর্ত থেকে এদের জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ ভ্রূণসূর্যকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান চাকতির দূরবর্তী অংশে পৃথক পৃথক আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে যা পরে দানবাকৃতির গ্রহের আকার নিয়েছে। এই দৃশ্যের সাক্ষ্য দেয় বহিস্থ গ্রহগুলোর দানবাকৃতি, নিম্ন ঘনত্ব ও বলয় ব্যবস্থা। এ ধরনের আবর্তে কেন্দ্রভাগ ঘনীভূত হয়ে গ্রহের সৃষ্টি করে (ঠিক যেমন সৌর নীহারিকার কেন্দ্রে সূর্য সৃষ্টি হয়) আর বাইরের অংশে তৈরি হয় উপগ্রহ এবং যদি বাইরের অংশে উৎপন্ন কঠিন উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট সীমার ভেতর থাকে তবে বলয় সৃষ্টি হয়। এভাবে ইউরেনাসের ৯৮° হেলে থাকা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যে আবর্ত থেকে ইউরেনাস ও তার উপগ্রহসমূহ তৈরি হয়েছিল সেটা পুরোটাই ৯৮° হেলে ছিল। এই তত্ত্বের আরো একটি প্রমাণ হলো বহিস্থ গ্রহদের দ্রুত ঘূর্ণন।

এখানে আরো একটি ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে হবে। সেটা হলো আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘ যতো সংকুচিত হয় কেন্দ্রের সূর্যের ঘূর্ণন ততো বেশি হবে (কারণ পদার্থবিজ্ঞানের একটি আইন আছে কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা: একটা ঘূর্ণায়মান জিনিস যখন ছোট হতে থাকে তখন তার ব্যাসার্ধ কমে, ফলে কৌণিক ভরবেগও কমে যায়, কিন্তু আদি কৌণিক ভরবেগ যা থাকবে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর শেষ কৌণিক ভরবেগও তাই থাকবে, ফলে ব্যাসার্ধ কমার সাথে সাথে ঘূর্ণনবেগ বেড়ে যায়)। কিন্তু সূর্যের ঘূর্ণন

অনেকটা ধীর। কেন ? কারণ সূর্য সবসময়ে আহিত কণা নির্গত করে। যেহেতু সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্র আছে এবং যেহেতু কণাগুলো আহিত, ফলে এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করবে। তাছাড়া সৃষ্টির আদিতে আহিত কণাদের পরিমাণও ছিল অনেক বেশি। ফলে এই আকর্ষণ দীর্ঘ সময় ধরে সূর্যের ঘূর্ণনকে মন্দীভূত করে দিতে সক্ষম। এই পদ্ধতিকে বলে ম্যাগনেটিক ব্রেকিং।

গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে সেসব অব্যবহৃত গ্রহাণুসদৃশ বস্তুদের দিয়ে, গ্রহ তৈরিতে যারা কাজে লাগেনি। গ্রহ তৈরি হতে এসব বস্তুদের এক জায়গায় সমবেত হতে হয়। কিন্তু যখন গ্রহরাজ বৃহস্পতি জন্ম নিলো তখন এর শক্তিশালী আকর্ষণ এর নিকটবর্তী বস্তুপিণ্ডগুলোকে এমনভাবে আন্দোলিত করল যে এরা একত্রই হতে পারেনি। ফলে এই অঞ্চলে গ্রহ তৈরি সম্ভব হয়নি। এবং বৃহস্পতির এই খবরদারি এখনো বহাল আছে।

ধূমকেতুদের সৃষ্টি হয়েছে খুব সম্ভবত ইউরেনাস ও নেপচুনের কাছাকাছি অঞ্চলে। এই ধূমকেতুগুলো যখনই সূর্যের কাছাকাছি আসত তখনই বড় গ্রহগুলো, বিশেষ করে বৃহস্পতি ও শনি, তাদের শক্তিশালী মহাকর্ষের দ্বারা এদের গতি বাড়িয়ে দিত এবং এভাবে এরা সৌরজগৎ থেকে দূরে সরে যেত। বর্তমানে এরা সূর্য থেকে ৫০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ A. U. (জোতির্বিদ্যার একক, পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব) দূরে একটি মেঘমালা গঠন করেছে। এর নাম উর্ট মেঘ। এর থেকেই টুকরো টাকরা ধূমকেতু হয়ে এখনো ছুটে আসে।

এ অবস্থায় সৌরজগতে ভরা ছিল প্রচুর অবশিষ্ট গ্যাস এবং গ্রহাণুসদৃশ বস্তু। এইসব বস্তু গ্রহদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এবং এ পর্যায়ে সর্বাধিক খাদ সৃষ্টি হয়। একে বলে cratering।

এসব পর্যায় শেষে সৌরজগতের চেহারা অনেকটা আজকের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। সদ্যোজাত সূর্যকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে গ্রহ ও গ্রহাণুপিণ্ড। তবে এ সময়ে অবশিষ্ট গ্যাস ও ধূলিকণা ছিল প্রচুর। এইসময়, বলা যায় একদম শৈশবকালে, সূর্যে এক ধরনের বিশেষ পর্যায় শুরু হয়। এ সময়ে সূর্য থেকে শক্তিশালী ঝড়ো গতিতে পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয়। এর ফলে অধিকাংশ অপ্রয়োজনীয় বস্তুকণা দূরীভূত হয় এবং রয়ে যায় শুধু বড় গ্রহপিণ্ড ও গ্রহাণুপুঞ্জ। এই পর্যায়টি নতুন সৃষ্ট তারাদের মধ্যে দেখা গেছে এবং একে বলে টি টরী (T Tauri) দশা। গ্রহাণুসদৃশ বস্তু ও গ্যাস টি টরী দশার মাধ্যমে উৎপন্ন সৌরবায়ুর সাহায্যে দূরীভূত হয় অথবা অন্যান্য গ্রহের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে মিলিত হয়ে সৌরজগৎ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। পরবর্তীতে বহিস্থ গ্রহগুলো যেমন সৃষ্টি হয়েছিল তেমনিই রয়ে যায় এবং অন্তস্থ গ্রহগুলোর ভৌগলিক বিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সম্পূর্ণ সৃষ্টি ক্রিয়ার এখানেই শুভসমাপ্তি। মধুরেণ সমাপয়েৎ!

সৌরজগৎ সৃষ্টির ধাপগুলো ঃ

১। একটি ভারি আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘের মহাকর্ষীয় পতন।

২। মহাকর্ষীয় পতনের ফলে কেন্দ্রে ভ্রূণসূর্যের সৃষ্টি এবং এর চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান গ্যাস চাকতির উদ্ভব। একে সৌর নীহারিকা (Solar nebula) বলে।

৩। সৌর নীহারিকার কেন্দ্রের কাছাকাছি অংশে কঠিন পদার্থের ঘনীভবন।

৪। কেন্দ্রের নিকটবর্তী অংশে ঘনীভূত কঠিন পদার্থ থেকে এবং বাইরের অংশে ঘূর্ণায়মান আবর্ত থেকে গ্রহের সৃষ্টি।

৫। ঘনীভূত কঠিন পদার্থ থেকে পাথুরে অন্তস্থ গ্রহ এবং প্রধানত আবর্তমান গ্যাস থেকে বহিস্থ গ্রহ, তাদের উপগ্রহ ও বলয় সৃষ্টি।

৬। বৃহস্পতির নিকটবর্তী অঞ্চলে তার শক্তিশালী আকর্ষণের প্রবল বিরোধিতার কারণে একটি সম্পূর্ণ গ্রহের পরিবর্তে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি।

৭। বৃহস্পতি থেকে দূরে যেসব পদার্থ ছিল সেগুলোকে বৃহস্পতি ও শনি সৌরজগতের বাইরে ছুঁড়ে দেয় এবং এরা উর্ট মেঘ গঠন করে। এখান থেকে ধূমকেতু আসে।

৮। গ্রহদের সাথে গ্রহাণুপিণ্ডের ব্যাপক সংঘাতের ফলে এদের পৃষ্ঠে খাদের সৃষ্টি।

৯। সূর্যের ঘূর্ণন ম্যাগনেটিক ব্রেকিঙের মাধ্যমে মন্দীভূত হয়।

১০। অবশিষ্ট বস্তু ও গ্যাস টি টরী বায়ু কিংবা অন্যান্য গ্রহের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে দূরীভূত হয়।

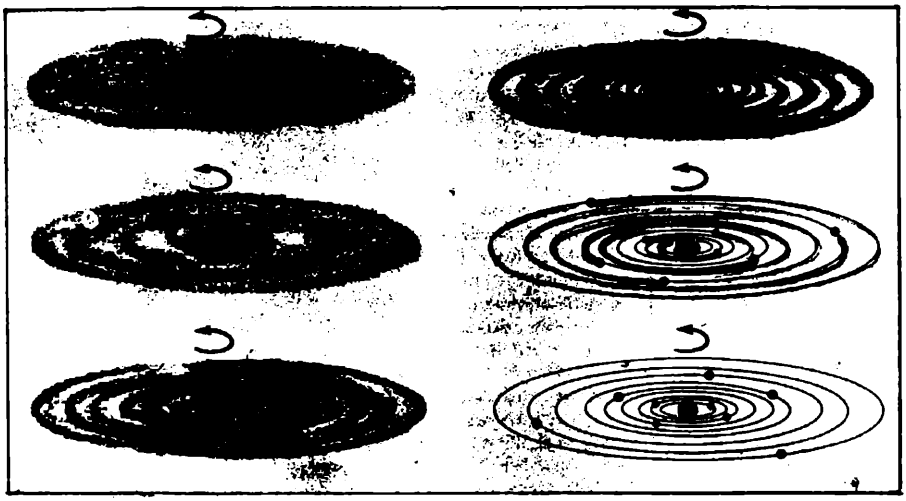

সৌরনীহারিকা থেকে সৌরজগৎ জন্ম নিচ্ছে।

চাঁদ মামার গল্প

চাঁদ নিয়ে কত কবির কত গাথা, কত কথা, কত ব্যথা, কত ব্যঞ্জনা! রূপকথার চাঁদে বাস করে "চাঁদের মা বুড়ি" যিনি চরকায় সুতো কাটেন। অনাদি কাল থেকে তিনি সূতো কাটছেন। এখন তিনি হয়ত সেখানে কোনো টেক্সটাইল মিল বসিয়ে থাকতে পারেন। যাহোক চাঁদ নিয়ে আমাদের ভাবনার রাজ্যে অসংখ্য ভাবনা ভাবিত হয়েছে। চাঁদহীন পৃথিবী আমাদের কল্পনায় আসে না। চাঁদ না থাকলে আমাদের সাহিত্যে অনেক বড় লেখাই হয়ত লেখা হয়ে উঠত না। চাঁদ প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে খুবই প্রিয়। আবার বিরহী প্রেমিককূল চাঁদকে সাক্ষী রেখে নানা কবিতা লেখেন। এককথায় আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক তথা আচারিক জীবনে চাঁদ মামার প্রভাব অনস্বীকার্য। এবার একটু বাস্তব দিকে নজর ফেরানো যাক। মানুষ চাঁদ ঘুরে এসেছে (খুশীর কথা, সেখানে কোনো বুড়ি মা'র সূতো কাটার টেক্সটাইল মিল পাওয়া যায়নি)। ১৯৯৪ এর জুলাই মাসে চাঁদ অবতরণের ২৫ বছর (রজত জয়ন্তি) পুরো হয়ে গিয়েছে। চাঁদে বসতি স্থাপনের কথা উঠছে আজকাল। এ প্রবন্ধে আমরা চাঁদমামার কিছু কথা আলোচনা করব। কবিগুরুর কথা দিয়ে শুরু করছি ঃ

চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী—
আপন নিঃশব্দ গানে আপনারি শূন্য দিল ঢাকি।
.... যে (জ্যোৎস্না) রাগিণী অসীমের উৎস হতে আনে
অনাদি বিরহরস তাই দিয়ে ভরিয়া আঁধার
কোন বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার। (-একাকী)

এক নজরে চাঁদ মামা ঃ

পৃথিবী থেকে গড় দূরত্ব	ঃ ৩,৮৪,৪০১ কি. মি.
সর্বনিম্ন দূরত্ব	ঃ ৩,৬৩,২৯৭ কি. মি.
সর্বোচ্চ দূরত্ব	ঃ ৪,০৫,৫০৫ কি. মি.
কক্ষীয় পর্যায়	ঃ ২৭ দিন ৭ ঘন্টা ৪৩ মিনিট ১২ সেকেন্ড
চান্দ্র মাস	ঃ ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেন্ড
ঘূর্ণন কাল	ঃ ২৭.৩২ দিন
অক্ষকোণ	ঃ ৬° ৪১ (কক্ষতলের সাপেক্ষে)
ব্যাস	ঃ ৩৪৭৬ কি. মি. (পৃথিবীর ০.২৭৩ গুণ)
ভর	ঃ ৭.৩৫× $১০^{২৫}$ গ্রাম (পৃথিবীর ০.০১২৩ গুণ)
ঘনত্ব	ঃ ৩.৩৪ গ্রাম / সি. সি.
অভিকর্ষ	ঃ ০.১৬৫ g
মুক্তিবেগ	ঃ ২.৪ কি. মি. / সে.
পৃষ্ঠ তাপমাত্রা	ঃ দিবাভাগে ৪০০ কে.
	রাত্রিভাগে ১০০ কে.
প্রতিফলন অনুপাত	ঃ ০.০৭

চাঁদ মামার চলা পথ ঃ চাঁদ পৃথিবীকে প্রায় বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে। তবে প্রকৃতপক্ষে এটি উপবৃত্তাকার যার একটি উপকেন্দ্রে পৃথিবী অবস্থিত। (উৎকেন্দ্রতা ০.০৫৪৯)। তবে সূর্যের সাপেক্ষে চাঁদের গতিপথ সর্পিলাকার হয়।

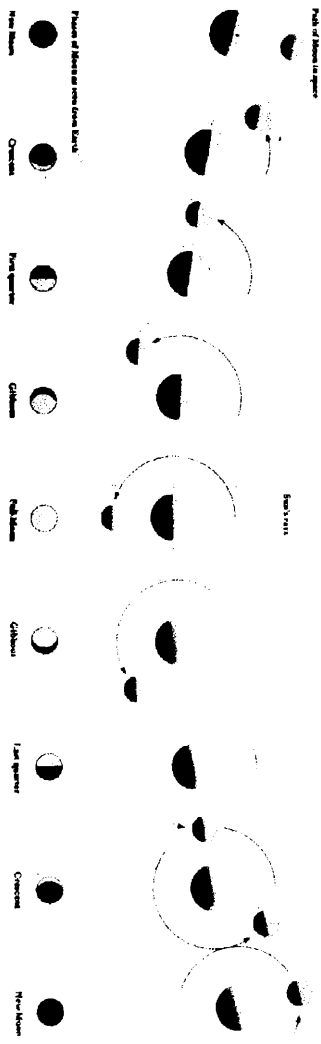

চাঁদের চলার পথ।

পেছনের আকাশের স্থির তারার সাপেক্ষে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ২৭.৩২ দিনে ঘোরে। একে নাক্ষত্রিক মাস বলে। যে সময়ে স্থিরতারার সাপেক্ষে চাঁদ পৃথিবীর চারদিক ঘোরে সে সময়ে পৃথিবী-চাঁদ ব্যবস্থা সূর্যের চারদিকে কক্ষের ৭.৫ শতাংশ এগিয়ে যায়। সেজন্য পরপর দুটি অমাবস্যা বা দুটি পূর্ণিমার মধ্যের সময় নাক্ষত্রিক সময়ের চেয়ে বেশি। চাঁদের কক্ষ ভূ-কক্ষের সাথে ৫°.১৫ কোণে হেলে থাকে। সেজন্য কদাচিৎ চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে। চাঁদ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকে সেই অবস্থাকে বলে অনুভূ (perigee) এবং সবচেয়ে দূরে থাকলে তাকে অপভূ (apogee) বলে। চাঁদের ভূ-কেন্দ্রীক কক্ষীয় গতি, চাঁদ-পৃথিবী ব্যবস্থার সূর্যকেন্দ্রিক গতি এবং চাঁদ ও পৃথিবীর অক্ষীয় আবর্তন— সবই ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে। গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন যে চাঁদ সবসময়ে তার একপিঠ পৃথিবীর দিকে প্রদর্শন করে। তার মানে চাঁদের নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনকাল এবং পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণনকাল একই। চাঁদের গড় দ্রুতি ১.০২ কি. মি. / সে. এবং অনুভূতে এটি দ্রুত ছোটে কিন্তু অপভূতে অপেক্ষাকৃত ধীরে ছোটে। পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের প্রকৃত গতি নিয়ে গাণিতিক তত্ত্ব আছে। এখানে আমরা সেটি আলোচনা করছি না।

চাঁদ মামার চেহারা ঃ চাঁদের উপরিভাগ ভীষণভাবে খানাখন্দে ভরা। বড় বড় খাত, ইম্প্যাক্ট ক্র্যাটার ভর্তি। এখানে সেগুলো একটু আলোচনা করব ঃ

মারিয়া (Maria) ঃ একবচনে Mare । এই ল্যাটিন শব্দের অর্থ সমুদ্র। চাঁদের কালো, আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত সমতল অঞ্চলকে মারিয়া বলে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা এখানে সমুদ্র আছে ভেবেছিলেন। খালি চোখে বড় বড় কালো-অন্ধকার এলাকা বলে মনে হয় একে।

ক্র্যাটার (Crater) ঃ বৃত্তাকার ; শূন্যগর্ভ গর্ত যার চারদিক উঁচু দেয়াল ঘেরা। এবং মাঝেমাঝে কেন্দ্রে একটা-দুটো চুঁড়া থাকে। ক্র্যাটার তৈরি হয়েছে চাঁদের তরুণ বয়সে প্রচুর উল্কাপাতের ফলে। কোনো কোনো ক্র্যাটার চাঁদের অভ্যন্তরের থেকে বেরিয়ে আসা লাভার ফলে সমতল মারিয়ায় পরিণত হয়। ক্র্যাটারের চতুষ্পার্শ্বের দেয়ালকে বলে রিম। ক্র্যাটার রিমকে বৃত্তাকার বলে মনে হলেও আসলে এরা উপবৃত্তাকার বা বহুভুজের মতো। চান্দ্র ক্র্যাটারদের অধিকাংশই ২০ কি. মি. ব্যাসের কম এবং ভেতরের অংশ অন্ধকার। এদের নিচের মেঝের (floor) গভীরতা ৩ কি. মি.। অগভীর ক্র্যাটারদের বলে সসার ক্র্যাটার। যেসব ক্র্যাটারের চারদিকে রিম নেই তাদের বলে ক্র্যাটার পিট বা গর্ত। এছাড়াও ক্র্যাটারদের শ্রেণীবিভাগ করা যায় এদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিশেষ ভৌগোলিক গুণ দ্বারা। যেমন যেসব ক্র্যাটারের থেকে দীর্ঘ ray নির্গত হয়েছে। ray হচ্ছে অসংখ্য ছোট ছোট ক্র্যাটার ও পাথর সমৃদ্ধ। এদের বলে ray crater। যেমন Tycho, Copernicus ইত্যাদি। অন্ধকার (dark-halo) ক্র্যাটারদের চারদিকে আগ্নেয়পদার্থ সঞ্জাত অন্ধকার বলয় থাকে। মারিয়ার শৈলশিরায় (ridge) অসংখ্য ক্র্যাটার পাওয়া যায়। এদের বলে প্যারাসাইটিক বা রিং-ওয়াল ক্র্যাটার। এ ধরনের অসংখ্য ক্র্যাটার আছে চন্দ্রপৃষ্ঠে। ray বা রে হচ্ছে বড় ক্র্যাটার থেকে নির্গত শিরা যা আলোকিত থাকে। কিন্তু rille হচ্ছে গভীর, দীর্ঘ উপত্যকা যা পৃথিবীর গিরিখাতের মতো। বড় ও গভীরতর ক্র্যাটারগুলো চাঁদের এপিঠের দক্ষিণার্ধের মধ্যরেখা বরাবর বেশি ঘন। গভীর ক্র্যাটারগুলো মারিয়ার কাছাকাছি থাকে। চন্দ্রের উচ্চভূমিতে প্রচুর সংঘাতের চিহ্ন (ক্র্যাটার) দেখা যায়। প্রমিত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা যায় যে চন্দ্রপৃষ্ঠে ক্র্যাটারের সংখ্যা বিক্ষিপ্ত নয়। অথচ উল্কাপাতের ফলে এরকম হবার কথা নয়।

চাঁদের পাহাড় ঃ সাধারণত বড় মারিয়ার ধার ঘেঁষে পর্বত দেখা যায়। কোনো চান্দ্র পর্বতের উচ্চতা যদি h হয় এবং এই পর্বতের ছায়ার দৈর্ঘ্য l হয় তবে $h = l \tan\theta$, θ হলো পর্বতের উপর সূর্যের সমুন্নতি (elevation) । চাঁদের এ পিঠটির জরিপ কার্য অনেক সূক্ষ্মভাবে করা গেছে। কিন্তু যে পিঠটি সর্বদা আমাদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে তাকে চেনা বড় মুশকিল। এর জরিপকার্য যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি জটিল। স্থানাল্পতার কারণে চন্দ্রপৃষ্ঠের বর্ণনার এখানেই আমরা ইতি টানছি।

চাঁদের পাথর ঃ অ্যাপোলো অভিযাত্রীরা চাঁদের পৃষ্ঠে অনেক পাথর কুঁড়িয়ে পেয়েছেন। পৃষ্ঠে আছে নুড়ি পাথর থেকে বোল্ডার পর্যন্ত। এসব পাথরের গায়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধার দেখা যায়। পৃথিবীতে যেমন পাথরের ধার ক্ষয়ে যায় চাঁদে তা ঘটে না, কারণ ওখানে ক্ষয়সাধনের কোনো প্রক্রিয়া নেই। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে চাঁদের পাথর রক্ষিত আছে এবং ক্রমাগত সেখানে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। চাঁদের মাটিকে বলা হয় Regolith। এই মাটি গঠিত হয়েছে বিভিন্ন ছোটছোট পাথর ও স্বচ্ছ খনিজের সমন্বয়ে। এই আলগা মাটির তিনটি নমুনা আছে। সবচেয়ে যেটি বেশি পাওয়া যায় তা হলো Breccias। এছাড়া অপর দুটি উল্লেখযোগ্য নমুনা হলো ব্যাসল্ট। সব পাথরের যে দিকটি আকাশের দিকে থাকে তা ছোট ছিদ্র সম্বলিত। এগুলোকে বলে মাইক্রোমিটিওরাইট ক্র্যাটার। অতিক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডের আঘাতে এগুলো তৈরি হয়। এসব পাথর থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। প্রথমত, কিছু কিছু পারমাণবিক

আইসোটোপ বিশেষ করে অক্সিজেন আইসোটোপের প্রাচুর্য এসব পাথরে পাওয়া গেছে—যা পার্থিব পাথরেও আছে। এর অর্থ পৃথিবী ও চাঁদ একই গ্যাসপিণ্ড থেকে জন্মপ্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর মতোই চাঁদের পাথরগুলোতেও উদ্বায়ী পদার্থের অনুপাত কম। তেজস্ক্রিয় প্রণালীতে এসব পাথরের জন্মতারিখ নির্ণয় করা গেছে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চারশ' কোটি বছর। এসব তথ্য চাঁদের উৎপত্তি নির্ধারণে ও পৃষ্ঠভাগের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে প্রয়োজন।

চাঁদের অভ্যন্তরভাগ ঃ ভূ-কম্পীয় (seismic) তরঙ্গ দ্বারা চাঁদের ভূ-পৃষ্ঠে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে চাঁদের পৃষ্ঠে চন্দ্রকম্প (moon-quake) প্রায়শই ঘটে থাকে। তবে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরিমাপের সাহায্যে দেখা গেছে যে পৃষ্ঠের মাটি বা রেগোলিথ মোটামুটি ১০ মিটার পুরু। এর নিচে চন্দ্রত্বকের (crust) পুরুত্ব প্রায় ৫০ থেকে ১০০ কি. মি.। চন্দ্রত্বকের নিচে আছে ম্যান্টল। এতে আছে লিথোস্ফেয়ার যা দৃঢ়। লিথোস্ফেয়ারের নিচে আছে asthenosphere যা অর্ধতরল। সবচেয়ে ভেতরের ৫০০ কি. মি. অঞ্চল তৈরি হয়েছে ঘন পদার্থ দিয়ে —তা অবশ্য পৃথিবীর মতো ঘন নয়। ভূ-গাঠনিক অনুসন্ধানে চন্দ্রের ভেতর কোনো গলিত অংশ নেই। কিন্তু কেন্দ্র হতে পৃষ্ঠের দিকে সবসময় তাপমাত্রার প্রবাহ পাওয়া যায়—যা হয়ত ত্বকের নিচস্থ তেজস্ক্রিয় পদার্থের জন্য হয়ে থাকে। তাছাড়া কোনো চৌম্বকক্ষেত্রেও পাওয়া যায়নি।

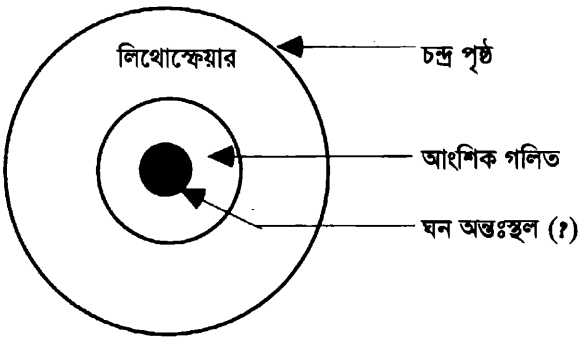

চাঁদের অভ্যন্তরভাগ

বর্তমানে কোনো ভূ-গাঠনিক সক্রিয়তা চাঁদে দেখা যায়নি। চন্দ্রপৃষ্ঠের বর্তমান চেহারার জন্য দায়ী তরুণ বয়সের লাভা উদ্গীরণ এবং উল্কাপাত। এছাড়া চাঁদকে মৃতই বলা যায়। চাঁদে কয়েক বিলিয়ন টন ভূগর্ভস্থ পানির অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রবার্ট হুক চন্দ্রপৃষ্ঠের ক্র্যাটার তৈরির একটি তত্ত্ব দেন (১৬৫৫) যে এগুলো একান্তই চাঁদের ভেতরকার কারণে তৈরি হয়েছে। একে বলে গ্যাস বুদ্বুদ তত্ত্ব। তিনি বলেন যে ভেতরকার আগ্নেয় পদ্ধতিতে গ্যাস বুদ্বুদ তৈরি হয় যা পৃষ্ঠে এসে ফেটে যায়—এভাবে ক্র্যাটারের জন্ম। পৃথিবীতেও এরকম গ্যাস বুদ্বুদ জন্ম নেয়। আরেক তত্ত্বে বলা হয় এসব ক্র্যাটারের জন্ম হয়েছে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে একটা

সিমেট্রিক ঝর্ণার মতো পদার্থ চারদিক ছিটকে পড়েছিল। একে বলে আগ্নেয়-ঝর্ণা তত্ত্ব। ১৮৯৩ সালের পর থেকে নতুন চিন্তাভাবনা শুরু হয়। রাল্‌ফ বল্ডউইন বললেন যে এসব ক্র্যাটার অধিকাংশই উল্কাপাতের ফলে সংঘটিত হয়। আগে ভাবা হতো যে লম্বভাবে না পড়লে বৃত্তাকার ক্র্যাটার সম্ভব না। কিন্তু এখন আর তা ভাবা সমীচীন বলে মনে হয় না। এখন বলা হচ্ছে, চন্দ্রপৃষ্ঠে ক্র্যাটার তৈরি হয়েছে উল্কাপাত ও আগ্নেয় দুই কারণেই। অবশ্য এখনো অনেক অসমাহিত সমস্যা আছে।

চাঁদ এলো কোথা থেকে ঃ চাঁদ সৃষ্টি হবার যেসব সূত্র আমাদের হাতে আছে তা দিয়ে মোটামুটি একটা চিত্র দাঁড় করান যায়। চাঁদ সৃষ্টি সম্পর্কে তিনটি অনুকল্প আছে। প্রথমত, ১৮৮০ সালে স্যার জর্জ ডারউইন কল্পনা করেন যে দূর অতীতে পৃথিবীর এক অংশ থেকে চাঁদের জন্ম হয়। তখন পৃথিবী ছিল বর্তুলাকার এক ঘূর্ণায়মান গলিত বস্তু যা সূর্যের আকর্ষণে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৩০ সালে হ্যারল্ড জেফ্রিস দেখান যে এ ঘটনাটি খুব একটা অসম্ভব নয়। যেহেতু চাঁদের ঘনত্ব পৃথিবীর উপরিভাগের ঘনত্বের প্রায় সমান সেহেতু ১৯৬০ সালে বলা হয় যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয়ে চাঁদের সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ জায়গায় বর্তমানে প্রশান্ত মহাসাগর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোন কারণে এ ঘটনাটি ঘটেছিল তা অজ্ঞাত। এবং চন্দ্রকক্ষের আনতি এটি ব্যাখ্যা করতে পারে না। একে বলে পার্থিব ফিশন তত্ত্ব।

দ্বিতীয়ত, ১৯৫৫ সালে হর্স্ট গেস্টেরকর্ন বলেন যে চাঁদ সৌরজগতের অন্যত্র তৈরি হয়েছিল। কোনো এক সময়ে এটি পৃথিবীর আওতার মধ্যে চলে আসে এবং সেই থেকে আজো রয়ে গেছে। কিন্তু চাঁদের মতো একটি বস্তুর গতি কমিয়ে তাকে পৃথিবীর বাধ্য উপগ্রহ বানাতে কোন বিশেষ বল ক্রিয়া করেছে তা জানা যায়নি। তাছাড়া পৃথিবী ও চাঁদের পাথরে আইসোটোপের যে মিল দেখা গেছে তা-ও এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়নি।

তৃতীয়ত এবং সম্ভবত শেষত বলা হয় পৃথিবী ও চাঁদ একত্রে উৎপন্ন হয়েছিল। যে কুণ্ডলিত, ঘূর্ণায়মান ধূলি ও গ্যাসপিণ্ড থেকে সূর্যের জন্ম সেই সৌর নীহারিকার অসংখ্য পাথর কণার সমন্বয়ে পৃথিবী গড়ে উঠেছিল। পঞ্চাশের দশকে সোভিয়েত তাত্ত্বিক ভিক্টর সাফ্রোনোভ তাঁর গবেষণাপত্রে দেখান যে গ্রহাণুপুঞ্জ মিলিত হয়ে গ্রহ তৈরি করতে পারে। এভাবে প্রায় ৪৫৫ থেকে ৪৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবী গ্রহের জন্ম হয়েছিল। পৃথিবীর চারপাশে ছিল শনির মতো একটি বলয়। এই বলয়ের বড় পিণ্ডগুলো ধীরে জড়ো হয়ে উপগ্রহে পরিণত হলো। তবে সাফ্রোনোভের তত্ত্বে একটি সমস্যা ছিল যে যখন গ্রহাণুপুঞ্জ জমে পৃথিবী তৈরি হলো তখন পাশাপাশি কিছু মাঝারি আকৃতির পিণ্ডও তৈরি হবে। মূল গ্রহের সাথে অন্যান্য গ্রহাণুর সংঘর্ষের ফলে গ্রহের আবর্তন, অক্ষের আনতি ইত্যাদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মাঝারি আকৃতির ঐ সমস্ত পিণ্ডের সাথে সংঘর্ষ হলে পরিস্থিতি অন্যরকম হবে।

এ ব্যাপারে একটি বিকল্প ভাবনা আছে। এতে বলা হয় যে কোনো বেশ বড় বস্তু পৃথিবীর লৌহকেন্দ্র তৈরি হওয়ার পরপরই এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এর ফলে পৃথিবীর থেকে প্রচুর ম্যান্টল শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়। তা থেকে পরে চাঁদের জন্ম হয়। এ ঘটনাটি

ঘটেছিল ৪৪৫ থেকে ৪৪০ কোটি বছরের মাঝে ৫ কোটি বছরের ব্যবধানে। গ্রহের চারদিকে উপগ্রহের সৃষ্টি সূর্যের চারদিকে গ্রহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত। এর প্রমাণ এসেছে ১৯৮৮ সালে লব্ধ চান্দ্রত্বকের প্রাচীনতম নমুনা থেকে।

চাঁদ তৈরি হবার পর অসংখ্য উল্কার সাথে সংঘর্ষের তাপে এর ত্বক থাকে গলিত। কিছু সময় পর উপরিভাগ কঠিন হয়ে গেলে ভেতরভাগে তেজস্ক্রিয়তার জন্য গলিত ম্যান্টল থাকে। পরবর্তীতে চাঁদে শুরু হয় আগ্নেয়-ক্রিয়া। নির্গত লাভা বিশেষ করে নিম্নাঞ্চলগুলি প্লাবিত করে দেয়, ফলে মারিয়া সৃষ্টি হয়। নিম্নাঞ্চলে যেসব ক্র্যাটার ছিল সেগুলো লাভা দ্বারা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। মারিয়া দেখা যায় শুধু চাঁদের এপিঠে যেটি বেশি ঘন। এই অপ্রতিসাম্যের দরুন পৃথিবীর জোয়ার বলের ক্রিয়ায় চাঁদের শুধু একপিঠই পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে। তাছাড়া চাঁদের আকর্ষণে ঘটিত জোয়ারের ফলে যে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় তা পৃথিবীর ঘূর্ণন কমিয়ে দেয়। জোয়ার-ভাঁটার পানি ভূ-পৃষ্ঠের চারপাশে এসে ঘষা খায় (বিশেষ করে বেরিং সাগরের অগভীর তলে)। ফলে পৃথিবী শক্তি হারায়। এই শক্তির পরিমাণ প্রায় ২ বিলিয়ন হর্সপাওয়ার। পৃথিবীর ঘূর্ণন কমে গেলে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব বেড়ে যাবে। কারণ পৃথিবী চাঁদ ব্যবস্থার কৌণিক ভরবেগ সবসময় অপরিবর্তনীয় থাকে। এর ফলে প্রতি শতাব্দীতে ২×১০^{-৩} সেকেন্ড সময় বাড়ছে। যাহোক চাঁদ ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকবে এবং পৃথিবীর ঘূর্ণন কমে এমন এক পর্যায়ে আসবে যে জোয়ার-ভাঁটার বল আবার এর ঘূর্ণন বাড়াবে। ফলে চাঁদ আবার কাছে আসবে। একসময় জন্ম মুহূর্তের দূরত্বে চলে এলে পৃথিবী একে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে। অবশ্য এসময়ের আগেই সূর্যের মৃত্যু সূচিত হবে। এভাবে দেখা যায় চাঁদ পূর্বে পৃথিবীর আরো কাছে ছিল এবং আরো দ্রুত ঘুরত।

আমাদের নিত্যসঙ্গী চাঁদমামার এই বিরাট জটিল ইতিকথা আমরা কি কখনো পূর্ণিমা রাতে বসে ভেবেছি? এই যে অতিমুগ্ধকর, মনোলোভা জ্যোৎস্নার আলো আমাদের এত আনন্দ দিচ্ছে, হৃদয়ে একটা স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে তার উৎস চাঁদমামা। ভাবুন তো দেখি আমাদের চাঁদমামা একটি নয় দুটি বা তার বেশি। অথবা কোনো চাঁদমামাই নেই। ভাবনা কুলোয় না। চাঁদ ছাড়া পৃথিবী আমাদের কল্পনার বাইরে। ওমর খাইয়ামের মতো বলা যায়ঃ

আকাশের বুকে আমার খুশীর চাঁদটির নেই ক্ষয়
অবারিত নীলে সে যে অফুরান আনন্দ সঞ্চয়,
এমনি আকাশে না জানি সে আরও কতবার ফিরে এসে
খুঁজবে আমাকে এ-উদ্যানের আঁধারে সুনিশ্চয়।।

ধূমকেতু সমাচার

কোনো এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে আমাদের পৃথিবী যদি সর্বদা মেঘে ঢাকা থাকত, আর নক্ষত্রখচিত আকাশের সবটাই দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতো, তাহলে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রহীন পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য কোনো কিছুরই উন্মেষ হতো না— মানুষ থেকে যেতো সেই গুহাবাসীর স্তরে। আকাশের যে অপার রহস্য তা অজানাই থেকে যেতো। বহুযুগ ধরে মানুষ আকাশকে দেখছে, কিন্তু বুঝতে শিখেছে এই মাত্র কদিন হলো। আকাশের অনেক বস্তুর মধ্যে ধূমকেতু জিনিসটির সাথে আমাদের কম-বেশি পরিচয় আছে। সম্প্রতি ঢাকার আকাশেও বেশ কটি ধূমকেতু দেখা দিয়েছে। ফলে এ সম্পর্কে ঔৎসুক্য সকলের। ধূমকেতু কী, কেমন করে এলো, কেমন তার গঠন—এই নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। ধূমকেতু শুধুই 'নোংরা পাথরের গোলা' নয়, এই ধূমকেতুই হয়ত পৃথিবীতে বহন করে এনেছে জীবনের মূল উৎস—প্রাণের বারতা। এরই নোংরা অন্দরে হয়ত ছিল প্রাণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় জৈব গৌগ। রবীন্দ্রনাথ এই ধূমকেতুদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন *"সৌর-বিদূষক"*। দেখা যাক এরা কতখানি "বিদূষক" ; নাকি শুধুই দূষক!

ধূমকেতু কী? ধূমকেতু আসলে কী জিনিস? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগে। তাছাড়া ধূমকেতু নিয়ে কুসংস্কার তো আর কম প্রচলিত নয়! ঝাঁকড়া-চুলো, অদ্ভুত এই জ্যোতিষ্কটি মানুষের মনে সাংঘাতিক কৌতূহলের সৃষ্টি করে। ধূমকেতুর ইংরেজি হলো কমেট (Comet)—যা গ্রীক শব্দ *kometes* থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হলো ঝাঁকড়া-চুলো। ধূমকেতুর লেজ ঝাঁকড়া চুলের মতো দেখতে বলেই হয়ত এই নামকরণ। ধূমকেতুর ঝাঁটার মতো লম্বা লেজ থাকায় অনেককাল আগে থেকেই এর নাম হয়েছে *ঝাঁটা-তারা*। ধূমকেতুরা হলো এক ধরনের ছোট জ্যোতিষ্ক যারা সূর্যকে ঘিরে ঘুরপাক খায় এবং যখন এরা সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে তখন লম্বা, ক্ষীণ গ্যাসীয় লেজ তৈরি হয়। এদের আশেপাশে এক ধরনের গ্যাসীয় আবরণ দেখা যায় —অবশ্য যখন এরা সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকে তখন এই গ্যাসীয় আবরণ দেখা যায় না। তখন শক্তিশালী দুরবিন ছাড়া এদের দেখাই যায় না। শক্তিশালী দুরবিনে এদের নিউক্লিয়াসটিই শুধু দৃষ্টিগোচর হয়। তাই এদেরকে সাধারণ গ্রহাণু থেকে আলাদা করে বোঝা মুশকিল। কেবলমাত্র সুদীর্ঘ কক্ষপথ এবং রাসায়নিক গঠন থেকেই এ পার্থক্য ধরা পড়ে। ধূমকেতু গঠনকারী পদার্থ সাধারণত উদ্বায়ী হয়ে থাকে। তাই সূর্যের কাছাকাছি আসলে এই পদার্থ প্রখর তাপে বাষ্পীভূত হতে থাকে। কিন্তু যখন এরা সূর্য থেকে দূরে থাকে তখন কোনো পদার্থ ক্ষয় হয় না। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা এই ধূমকেতু গঠনকারী পদার্থ সৌরজগতের সবচেয়ে আদিম পদার্থ যা ধূমকেতুর গর্ভে এখনো সংরক্ষিত আছে পরম সমাদরে। আর এ জন্যেই ধূমকেতু বিজ্ঞানীদের কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ। তাই তার কদর এতো বেশি। এরা যখন সূর্যের কাছে চলে আসে তখন এদের নিউক্লিয়াসের পানি ও অন্যান্য উদ্বায়ী পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং এর ফলে এদের কেন্দ্রের চারপাশে গ্যাসীয় আবরণের সৃষ্টি হয়। একে কোমা

বলে। সূর্যের খুব বেশি কাছে চলে আসলে সৌর বিকিরণের প্রভাবে ধূমকেতু থেকে ধূলি ও অন্যান্য পদার্থকণা বেরিয়ে গিয়ে সুদীর্ঘ, ঈষৎ হলদেটে লেজ তৈরি করে। অন্যদিকে সৌরবায়ুর প্রভাবে আয়নিত গ্যাস একটি প্লাজমা-লেজ তৈরি করে। অনেক সময়ে কোনো ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষ পৃথিবীর চলার পথে পড়লে তা পৃথিবীতে উল্কাপাতের সৃষ্টি করে। ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষের সাথে উল্কাপাতের সম্পর্কের কথা প্রথম কল্পনা করেছিলেন গিয়োভান্নি শিয়াপারেল্লি। প্রতি বছর ৯ ও ১৪ই আগস্টে পারসিয়াস মণ্ডলে যে উল্কাপাত হয় তা আসলে ১৮৬২ সালে দৃষ্ট সুইফ্‌ট-টাট্‌ল ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষ—এ কথা তিনিই প্রথম বলেছিলেন।

ধূমকেতু সন্ধান ঃ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কেবল প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করেই ধূমকেতু আবিষ্কৃত হতো। এখনো অনেক সৌখিন জ্যোতির্বিদ টেলিস্কোপের সাহায্যে ধূমকেতু খোঁজার চেষ্টা করেন। সাধারণত সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্ত এবং সূর্যোদয়ের আগে পূর্ব দিগন্ত ধূমকেতু খোঁজার সবচেয়ে সুবিধেজনক অবস্থান—যদিও আকাশের সর্বত্রই ধূমকেতুর অবাধ বিচরণ। অধিকাংশ ধূমকেতুই এতো ক্ষীণ (২২ থেকে ২৩ আপাত উজ্জ্বলতার ধূমকেতু খালি চোখে দেখা যায় এমন জ্যোতিষ্কের চেয়ে $১০^{৬}$ —$১০^{৭}$ গুণ ক্ষীণ) যে আজকাল আর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করা হয় না। আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী আকাশের বিভিন্ন অংশের আলোকচিত্র টেলিস্কোপের সাহায্যে তোলা হয় এবং তারপর সেই ফটোগ্রাফিক প্লেটকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয় যে সেখানে নতুন কোনো অজানা জ্যোতিষ্ক আছে কিনা। নতুন কোনো ধূমকেতু আবিষ্কৃত হলে সেটা সেন্ট্রাল ব্যুরো অব অ্যাস্ট্রনমিকাল টেলিগ্রামসে জানাতে হয়। তবেই নতুন ধূমকেতু আবিষ্কারের কৃতিত্ব নথিভুক্ত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী ধূমকেতু-শিকারী চার্লস মেসিয়ের ২১টি ধূমকেতু আবিষ্কার করেছিলেন। এসবই তিনি তাঁর বিখ্যাত মেসিয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁরও আগে চীনারাই প্রথম ধূমকেতুর তালিকা প্রণয়ন করেছিল। ১৯৮৯ সালে ব্রিয়ান মার্সডেন ১,২৯২ সংখ্যক ধূমকেতু নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এটিই এখন পর্যন্ত ধূমকেতুদের প্রামাণ্য তালিকা হয়ে রয়েছে। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ২৩৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সকল আবিষ্কৃত ধূমকেতু।

ধূমকেতুর চলার পথ ঃ ১৬৮৭ সালে নিউটন তাঁর 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থে এ কথা প্রমাণ করেন যে, কোনো জ্যোতিষ্ক যদি সূর্যের কেন্দ্রীয় বলের অধীনে চলে তবে তার চলার পথ হবে একটি কোনিক। কোনিক আসলে কয়েকটি জ্যামিতিক আকৃতির এক সাধারণ নাম। যেমন—উপবৃত্ত (ellipse),অধিবৃত্ত (parabola), পরাবৃত্ত (hyperbola) এবং বৃত্ত। উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ধূমকেতু সূর্যকে এক কোণায় বা নাভিতে (focus) রেখে পরিভ্রমণ করে। ধূমকেতু যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে তখনকার অবস্থানকে অনুসূর (perihelion) অবস্থান বলে। ধূমকেতুর ওপর যদি অন্য কোনো বাহ্যিক প্রভাব থেকে থাকে তাহলে অবশ্য গতিপথ ভিন্ন হবে। বাহ্যিক প্রভাবের মধ্যে রয়েছে গ্রহের আকর্ষণ, কিংবা সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার দরুন নিউক্লিয়াসের গ্যাসের দ্রুতবেগে নিঃসরণের ফলে সৃষ্ট জেট-গতি। যাহোক ধূমকেতুর গতিপথ কেমন হবে তা এর মোট শক্তি নির্ধারণ করে। এই শক্তি ঋণাত্মক হলে গতিপথ পরাবৃত্তীয় হবে ; আর শূন্য হলে হবে আবদ্ধ।

এই শক্তি হলো ধূমকেতুর গতিশক্তি এবং মহাকর্ষীয় বিভবশক্তির সমষ্টি। নিউটনের এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে তাঁরই বন্ধু এডমান্ড হ্যালি একটি পর্যাবৃত্ত ধূমকেতু আবিষ্কার করেন যা এখন তাঁর নামে পরিচিত। এরই নাম **হ্যালির ধূমকেতু** যার পর্যায়কাল ৭৫/৭৬ বছর। যেসব ধূমকেতুর পথ অধিবৃত্তাকার তাদের প্রকৃত গতিপথ আসলে উপবৃত্তাকার অথচ উৎকেন্দ্রিকতা খুব বেশি, তাই এদের পর্যায়কাল খুব বেশি। সূর্যের চারপাশে এক কি দুইবার ঘুরতে পারে কিন্তু তারপর আর ফিরে আসে না। আর পরাবৃত্তাকার ধূমকেতু কখনো ফিরে আসে না ; সূর্যের সাথে তাদের দেখা হয় একবারই।

ধূমকেতুর চলার পথ।

ধূমকেতুর রকমফের ঃ কক্ষপথের প্রকৃতির উপর ধূমকেতুর পর্যায়কাল নির্ভর করে। উপবৃত্তাকার ধূমকেতু সাধারণত পর্যাবৃত্ত (periodic) হয়। অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার হলে তারা পর্যাবৃত্ত হয় না। ধূমকেতুদের সাধারণভাবে এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। পর্যাবৃত্ত ধূমকেতুদের আবার প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায় : ১. *দীর্ঘমেয়াদী* এবং ২. *স্বল্পমেয়াদী* ধূমকেতু। যেসব ধূমকেতুর পর্যায়কাল ২০০ বছরের বেশি তারা দীর্ঘমেয়াদী এবং যাদের পর্যায়কাল ২০০ বছরের কম তারা স্বল্পমেয়াদী ধূমকেতু। অবশ্য অনেকেই আজকাল স্বল্পমেয়াদী ধূমকেতুদের পর্যায়কাল ২০ বছর ধরে নেন এবং ২০ থেকে ২০০ বছর পর্যায়কালের ধূমকেতুকে *মধ্যমেয়াদী* পর্যায়ভুক্ত করেছেন। অধিকাংশ স্বল্পমেয়াদী ধূমকেতুই সূর্যের চারদিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে। এঙ্কের ধূমকেতুর পর্যায়কাল সবচেয়ে কম—মোটে ৩.৩ বছর। মধ্যমেয়াদী কয়েকটি ধূমকেতু আবার উল্টোদিকে ঘোরে। হ্যালির ধূমকেতুও অনুরূপ একটি ধূমকেতু। এ সমস্ত ধূমকেতু পৃথিবীর কক্ষতলের সাথে অল্প কোণে হেলে থাকে। দীর্ঘমেয়াদীরা অধিকাংশই উল্টোদিকে ঘোরে। এদের কক্ষপথও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরা পৃথিবীর কক্ষতলের সাথে বেশি কোণে হেলে থাকে। অনেক ধূমকেতুর আবার একইরকমের কক্ষপথ দেখা

যায়। ধারণা করা হয় যে মূলে এরা একটি ধূমকেতু ছিল, পরে কোনো কারণে (বিশেষ করে বৃহস্পতির খবরদারির কারণে) ভেঙে আলাদা হয়ে গিয়েছে। এরকম একটি দল হলো ক্রেউৎজ (Kreutz) দল যাদের রয়েছে ১২টি সদস্য। এদের পর্যায়কাল ৪০০ থেকে ২০০০ বছর। এবার আসা যাক সেসব ধূমকেতুর কথায় যারা কখনো ফিরে আসে না। ১৯৭৩ সালে আবিষ্কৃত কোহুতেক ধূমকেতুটির পর্যায়কাল হলো ৭৫০০০ বছর; আবার ডেলাভান নামের আরেকটি ধূমকেতুর পর্যায়কাল প্রায় দুই কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ বছর। এমনও দেখা গেছে অনেক ধূমকেতুর কক্ষপথ সাধারণত বৃহস্পতির টানাপোড়েনে পাল্টে গেছে। ১৮৪৫ সালে দেখা যায় বিয়েলা নামের ধূমকেতুটি দুভাগ হয়ে গিয়েছে। ১৮৫২ সালে এই দুটি খণ্ডকে আলাদাভাবে দেখা যায়, তারপর আর দেখা যায়নি। ১৮৭২ সালে এরাই উল্কা হয়ে ঝড়ে পড়ে।

ধূমকেতুর দেহগঠন ঃ এবার আমরা ধূমকেতুর দৈহিক গঠন নিয়ে আলোচনা করব। এদের রয়েছে তিনটি প্রধান অংশ ঃ নিউক্লিয়াস, কোমা এবং সুদীর্ঘ লেজ। অবশ্য সূর্য থেকে দূরে থাকলে এদের লেজটি দেখা যায় না। তখন শুধু নিউক্লিয়াসই দেখা যায়। *নিউক্লিয়াস* ধূমকেতুর প্রধান অংশ যার আকৃতি ১০ কিলোমিটারের মতো। কোমা এবং লেজে যে গ্যাস এবং ধূলো দেখা যায় তার উৎস এই নিউক্লিয়াস। ১৯৫০ সালের দিকে মার্কিন বিজ্ঞানী ফ্রেড হুইপ্‌ল ধারণা করেছিলেন যে ধূমকেতুর কেন্দ্র নানান পদার্থের এবং পানির বরফ এবং কার্বন ছাই দিয়ে গঠিত। আর তাই ধূমকেতুকে বলা হতো *"নোংরা বরফের গোলা"*। এই বরফ ও ছাই একসাথে এমনভাবে মিশে থাকে যে নিউক্লিয়াসকে কালো, অন্ধকার দেখায়, আর তাই নিউক্লিয়াসের প্রতিফলন অনুপাত (albedo) খুব কম। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে যখন হ্যালির ধূমকেতু সূর্যের খুব কাছে চলে আসে তখন এর কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল। গিয়োত্তো (Giotto) নামের ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির একটি নভোযান এর খুব কাছে যেতে সক্ষম হয়। দেখা যায় যে এর নিউক্লিয়াসটি বেশ কালো (প্রতিফলন অনুপাত মোটে ২-৪ শতাংশ)। এর আকৃতি ১৫ বাই ৮ কিলোমিটার (আয়তন ৫০০ বর্গ কি .মি.) এবং দেখতে অনেকটা আলুর মতো। এর ঘনত্ব ছিল ০.১ থেকে ০.৮ গ্রাম / সি. সি. এবং পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হলো ৩০০ থেকে ৪০০ কেলভিন। নিউক্লিয়াস থেকে নিঃসৃত গ্যাসের ৮০% পানি; এছাড়া আছে প্রায় ১০% কার্বন মনোক্সাইড, ৪% কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন এবং অ্যামোনিয়া; ০.৫-১% কার্বন-ডাই-সালফাইডও (CS_2) থাকতে পারে। এছাড়া অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং অ্যামিনো যৌগও পাওয়া যায়। প্রাপ্ত ধূলিকণার অধিকাংশই সিলিকেট ; এছাড়াও আছে ২০-৩০% কার্বন। আর তাই এরা কালো। নিউক্লিয়াসের ব্যাসের ২০/৩০ গুণ এলাকা জুড়ে থাকে এই ধূলিকণার স্তর। নিউক্লিয়াসের ভর হতে পারে প্রায় ১০০০ বিলিয়ন টন।

ধূমকেতুর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো *কোমা* । এটি ক্ষণস্থায়ী, সূক্ষ্ম এবং ধূলিসমৃদ্ধ। এর সৃষ্টি হয় ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস থেকে। নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে প্রায় ২ - ৫ × ১০^5 কিলোমিটার ব্যাপি কোমা বিস্তৃত থাকে। কোমার গ্যাসের প্রসারণ বেগ প্রায় ০.৬ কি. মি. / সেকেন্ড। কোমায় যেসব মূলক ও আয়ন দেখা যায় সেগুলোর একটি তালিকা নিচে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পানি, হাইড্রোজেন সায়ানাইড এবং মিথাইল সায়ানাইডের (CH_3CN) অণু পাওয়া গিয়েছে। ধূমকেতুর সুদীর্ঘ *লেজ* এর সবচেয়ে

বিস্ময়কর বস্তু। এদের বিস্তৃতি মোটামুটি ১৫ থেকে ২ জ্যোতির্বিদ্যার একক (AU: সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দুরত্ব, ১৫,০০,০০,০০০ কি. মি.) হয়ে থাকে। এই লেজের প্রধান উৎস হলো নিউক্লিয়াস থেকে নিঃসৃত ধূলোবালি। নিউক্লিয়াসের মধ্যেই অনেক সময়ে ধূলি নির্গমনের ছিদ্র দেখা যায়। প্রথমে সূর্যের দিকে লেজ নির্গত হতে দেখা যায়, পরে সৌর-বিকিরণের চাপে এই লেজ কিছুটা বাঁকা হয়ে পেছনে সূর্যের বিপরীত দিকে চলে যায়। এই লেজ ও কোমার মোট ওজন হবে প্রায় তিন লক্ষ টন। ধূমকেতুর লেজের প্রকৃতিকে বিজ্ঞানীরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ঃ ১ম শ্রেণীর লেজের ওপর ক্রিয়াশীল বিকর্ষণী বলের মান সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ১০০ গুণ, এছাড়া ২য় ও ৩য় শ্রেণীর লেজের ওপর এই মান সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের চেয়ে কম। পরবর্তী দুই শ্রেণীর লেজ আসলে ধূলিকণা সমৃদ্ধ। কিন্তু ১ম শ্রেণীর লেজটি আসলে প্লাজমা-লেজ। এই লেজের খুব সূক্ষ্ম ধূলিকণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও অদগ্ধ অবস্থায় ঢুকে পড়তে পারে। এদের ব্রাউনলী কণা বলে।

সারণি : ধূমকেতুতে দৃশ্যমান রাসায়নিক উপাদান

জৈব :	C, C_2, C_3, CO, CN, CH, CS, HCN, HCO, CH_3CN, H_2CO
অজৈব :	H, NH, NH_2, O, OH, H_2O, S, S_2, NH_3, NH_4
ধাতু :	Na, K, Ca, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu
আয়ন	C^+, CH^+, CO^+, CO_2^+, N_2^+, NH^+, O^+, OH^+, H_2O^+, H_3O^+, S^+, S_2^+, H_2S^+, CS_2^+, Ca^+
ধূলো :	সিলিকেট, অন্যান্য জৈব যৌগ

ধূমকেতু এলো কোথা থেকে ঃ এখন আমাদের প্রশ্ন হলো এই ধূমকেতুগুলো আসে কোথা থেকে? বেশ কিছু ধূমকেতু সৌরজগতের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে গ্রহদের প্রভাবে সৌরজগতের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়; আবার অনেকে স্বল্পমেয়াদী ধূমকেতুতে পরিণত হয়। কিন্তু কোনো ধূমকেতুরই আয়ু ১ মিলিয়ন বছরের বেশি নয়। তবে সব সময়েই নিত্যনতুন ধূমকেতু দেখা যায়—ধূমকেতুর যেন কোনো শেষ নেই। ধূমকেতুর তাই একটি চমৎকার উৎস আছে বলে মনে হয়। সৌরজগতের বাইরে এরকম একটি অঞ্চল আছে বলে মনে হয় যার নাম *উর্টের মেঘ* (Oort's cloud) —এটাই ধূমকেতুর সূতিকাগার। ১৯৫০য়ের দশকে ডাচ বিজ্ঞানী ইয়ান হেন্ড্রিক উর্ট পর্যবেক্ষণের পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে এই মেঘের অস্তিত্বের ধারণা করেছিলেন। পরবর্তীতে ব্রিয়ান মার্সডেন ও তাঁর সহকর্মীরা এ তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এখন আমরা জানি যে সৌরজগতের বহির্প্রান্তে সূর্য থেকে প্রায় ৪০,০০০-৫০,০০০ জ্যোতির্বিদ্যার একক দূরত্বে এই উর্টের মেঘ অবস্থিত। এই সুবিশাল দূরত্ব থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে এই মেঘের ওপর সৌরজগতের গ্রহদের তেমন কোনো প্রভাব নেই। তাই এই মেঘ থেকে ধূমকেতুর আবির্ভাব হতে বেশ কয়েকটি অন্তর্বর্তী ধাপ পেরোতে হয়। অন্ধকার আণবিক মেঘ কিংবা আমাদের ছায়াপথের ডিস্ক বরাবর অবস্থিত ধূসর বামন তারাদের (black

dwarf) টানাপোড়নে এই মেঘের থেকে টুকরো-টাকরা খণ্ড ধূমকেতু হয়ে ছুটে আসে। এখন এই উর্টের মেঘই বা এলো কী করে? ১৯৭২ সালে ভিক্টর সাফ্রোনভের দেওয়া এক তত্ত্ব অনুযায়ী এই মেঘের জন্ম সৌরজগতের দানবাকৃতির গ্রহদের (যেমন বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন) জন্মের সাথে সম্পর্কিত। সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান অসংখ্য ছোট ছোট গ্রহকণা (planetesimal) জমে তৈরি হয়েছে গ্রহের। সব গ্রহকণাই অবশ্য জমাট বেঁধে গ্রহ তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। উদ্বৃত্ত গ্রহকণারা সৌরবায়ু দ্বারা এবং গ্রহদের বিক্ষোভজনিত (perterbation) কারণে বিতাড়িত হয়ে সৌরজগতের বাইরে নিজেদের জায়গা করে নেয়। এরাই উর্টের মেঘের জন্ম দিয়েছে। ধারণা করা হয়, এই উর্টের মেঘস্থিত মোট পদার্থ থেকে প্রায় এক হাজার বিলিয়ন ধূমকেতু তৈরি হতে পারে, যাদের মিলিত ভর প্রায় পৃথিবীর ভরের সমান। এভাবে প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন (৪৬০ কোটি) বছর আগে তৈরি হয়েছে ধূমকেতুর সূতিকাগার এই উর্ট মেঘের। উর্টের মেঘের থেকে বেরিয়ে ধূমকেতুগুলো প্রধানত বৃহস্পতির আকর্ষণে চলে আসে সৌরজগতের ভেতরে। এখানে নেপচুনের কক্ষপথের বাইরে *কুইপার বেল্ট* নামের একটি অঞ্চলে এরা ভিড় জমায়। এখানেও বসে ধূমকেতুদের আড্ডা। উপরোক্ত সারণিতে দেওয়া রাসায়নিক উপাদানগুলো থেকে বিজ্ঞানীরা আজকাল ধারণা করছেন যে এই ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষই হয়ত পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল জীবনের বীজ। হয়ত এর মধ্যেই ছিল প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির নির্দিষ্ট শৃংখল। জীবন সৃষ্টিতে কেবল পার্থিব উৎসই যে একমাত্র ভূমিকা রেখেছিল তা অনেকেই আর মানছেন না। প্রয়োজনীয় অপার্থিব উপাদান হয়ত যোগান দিয়েছে 'নোংরা পাথরের গোলা' ধূমকেতু।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধূমকেতু ঃ এবার আমরা কয়েকটি বহুল পরিচিত ধূমকেতুর কথা আলোচনা করব। সবচেয়ে পরিচিত ধূমকেতু *হ্যালির ধূমকেতু*। বহুযুগ ধরে এটি নির্দিষ্ট সময় পরপর পৃথিবীর আকাশে দেখা দিয়েছে। ১৭৯৫ সালে আবিষ্কৃত (যদিও আবিষ্কার শব্দটি এখানে প্রযোজ্য নয়, আসলে এর অর্থ এই যে ঐ সময়ে এই ধূমকেতুটির কক্ষপথ এবং প্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছিল) হওয়ার পর এটি তিনবার আবির্ভূত হয়েছে— ১৮৩৫, ১৯১০ এবং ১৯৮৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি। অবশ্য প্রায় ২২ শতাব্দী ধরে প্রায় ৩০ বারের মতো এটি পৃথিবীর কাছাকাছি এসেছিল। এই ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে আজ বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ। ধূমকেতুটির পর্যায়কাল ৭৪.৪ থেকে ৭৯.৬ বছর। এই পরিবর্তনের কারণ বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহের কক্ষপথের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিক্ষোভ। শেষবার যখন এটি এসেছিল তখন একে কয়েকটি মহাকাশযান দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যেমন ভেগা-১, ২; সাকিগাকে (জাপান); গিয়োত্তো ইত্যাদি। এর ফলে ধূমকেতু সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রভূত তথ্য জানা গিয়েছে। এরপর যে ধূমকেতুর কথা আমরা আলোচনা করব সেটি *বেনেটের ধূমকেতু*। ১৯৭০ সালে দক্ষিণ গোলার্ধে প্রিটোরিয়া শহরে একে দেখা গিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে দেখা গিয়েছিল *অ্যারেন্ড-রোল্যান্ড ধূমকেতু*। এর সবচেয়ে মজার বৈশিষ্ট্য ছিল এর অ্যান্টি-টেইল, অর্থাৎ সূর্যের দিকাভিমুখী একটি লেজ। বেলজিয়ামের উক্‌লে শহরে একে দেখা গিয়েছিল। ১৬ই জুলাই, ১৯৯৭তে বৃহস্পতি গ্রহে যে ধূমকেতুটি ২১ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে আছড়ে পড়ল তার নাম *শুমেকার-লেভি ৯*। এই ঘটনাটি সে সময়ে খুব প্রচার পেয়েছিল আর সে কারণে এই

ধূমকেতুটি অত্যন্ত সুপরিচিত। ১৯৯৩ সালের ২৩শে মার্চ ইউজিন শুমেকার, তার স্ত্রী ক্যারোলিন এবং ডেভিড লেভি এই ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেন। এটি যখন বৃহস্পতি গ্রহে ভেঙে পড়ে তখন পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দির, গ্যালিলিও মহাকাশযান, হাব্‌ল মহাশূন্য টেলিস্কোপ ইত্যাদিকে পর্যবেক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। গত শতাব্দীর সবচেয়ে উজ্জ্বল ধূমকেতু যেটি ঢাকাতেও খুব ভালোভাবে দেখা গিয়েছিল তার নাম *হেল-বপ ধূমকেতু*। অ্যালান হেল এবং টমাস বপ নামের দুই সৌখিন জ্যোতির্বিদ একে আবিষ্কার করেছিলেন। এর কোমাটি অপ্রতিসম এবং এর পর্যায়কাল প্রায় ২৩৮০বছর। এটি এ দেশে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রনমিকাল অ্যাসোসিয়েশন দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই ধূমকেতুটি পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিল। এছাড়াও আরো অসংখ্য ধূমকেতু আছে; যেমন হায়াকুতাকে (যাকে ঢাকায় দেখা গিয়েছিল), এঙ্কের ধূমকেতু, বিয়েলার ধূমকেতু উল্লেখযোগ্য। সব তো আর এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়, আগ্রহীজন অন্যত্র বা গ্রন্থসূত্রে উল্লিখিত বইগুলো থেকে দেখে নিতে পারেন। কার্ল স্যাগান ও অ্যান ড্রুয়ান রচিত 'কমেট' বইটি এক্ষেত্রে দেখে যেতে পারে।

ধূমকেতু নিয়ে প্রচলিত রয়েছে বিচিত্র ধরনের কুসংস্কার। যেমন ধূমকেতুর আবির্ভাবে পৃথিবীতে দেখা দেয় নানান বিপদ-আপদ; ধূমকেতু মানুষের জন্যে অমঙ্গলজনক ইত্যাদি ইত্যাদি। এই আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয় পরিষ্কার যে ধূমকেতু মানুষের জন্য অমঙ্গলকর তো নয়ই বরঞ্চ আমাদের বহুবর্ণিল জীবনের জন্যে এরাই বোধহয় দায়ী। অবশ্য যদি কখনো কোনো ধূমকেতুর সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষ ঘটে তাহলে সেটা সমগ্র মানবসমাজ এবং জীবজগতের জন্য ভয়াবহ ফলাফল বয়ে আনবে। রবীন্দ্রনাথের *"সৌরবিদূষক"* ধূমকেতু যে শুধুমাত্র বিদূষকের কাজ করে না, তা বোধহয় এতোক্ষণে বেশ বোঝা গেছে। আমাদের এই যান্ত্রিক জীবনে ধূমকেতু নিয়ে আসুক আনন্দের বারতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো বলা যায় ঃ

ধূমকেতু মাঝে মাঝে হাসির ঝাঁটায়
দ্যুলোক ঝেটিয়ে নিয়ে কৌতুক পাঠায়
বিস্মিত সূর্যের সভা ত্বরিতে পারায়ে,
সৌর বিদূষক পায় ছুটি ।।

তুঙ্গাসকার অমীমাংসিত রহস্য

১৯০৮ সাল। ৩০শে জুন, সকাল প্রায় ৭টা। একটি নীলাভ-সাদা চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যের অগ্নিগোলক দেখা গেল ভারত মহাসাগরের বেশ ওপরে। এটার যাত্রাপথের দিকটি ছিল উত্তরে। পশ্চিম চীনের গোবী মরুভূমির একদল মরুযাত্রীর চোখের সামনে ওটা পলকে হারিয়ে যায় মঙ্গোলিয়ার দিকে। এটার বেগ ছিল সেকেন্ডে প্রায় কয়েকশত কিলোমিটার। মধ্য সাইবেরিয়ায় উজ্জ্বল সূর্যালোকে সদ্য সমাপ্ত ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের একদল রেলযাত্রীও এইটে দেখতে পেলেন। তখন ওটা অনেক নিচু দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এবং ধোঁয়ার লেজও আকাশে দেখা গিয়েছিল। বায়ুর বাধা এর অকল্পনীয় বেগের খুব সামান্যই কমাতে পেরেছিল। অর্ধ-সহস্র কিলোমিটারের যাত্রাপথের শেষে এটি পৌঁছল সাইবেরিয়ার এক প্রত্যন্ত দূরবর্তী জলাভূমিতে—যা নিকটস্থ রেলপথ থেকেও কয়েকশ' কিলোমিটার দূরে। জায়গাটি ছিল পোদ্‌কামেন্নায়া তুঙ্গাসকা নদীর উপনদী খুশ্‌মা নদীর নিকটবর্তী পাইন বনে।

অতঃপর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আর হাজারটা বাজ পড়ার শব্দ। প্রায় ৪৫০ কি. মি. দূরে থেকে এক ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখা গিয়েছিল। এতদূর থেকে দেখতে হলে কমপক্ষে ধোঁয়ার স্তম্ভকে ২০ কি. মি. উপরে উঠতে হবে। এ থেকে সহজেই বোধগম্য বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা কতখানি ছিল। আর সেই ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথে চলমান ট্রেনটি এত দুলতে লাগল যে ট্রেনটিকে থামাতে হয়েছিল। ঘটনাস্থল থেকে ৬০ কি. মি. দূরে (সবচেয়ে নিকটবর্তী জনবসতি) এক ছোট বসতিতে এই বিস্ফোরণের তাণ্ডবলীলা লক্ষ করা যায়। মনে হচ্ছিল যেন মুহূর্তের জন্য আকাশের অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে লেলিহান শিখা। তুঙ্গাসকা ও এমনকি লেনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এবং কয়েকশ' কি. মি. দূরের স্বর্ণখনিগুলোতেও দিনের বেলাতেই এই আলো দেখা গিয়েছিল। অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে বিস্ফোরণের পর সাইবেরিয়া ও উত্তর ইউরোপে, ভিয়েনা, কোপেনহেগেন, লন্ডনেও রূপালী মেঘ দেখা গিয়েছিল। শকওয়েভ বা অভিঘাত তরঙ্গ সবসময়েই শব্দ তরঙ্গের জন্ম দেয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। উপরোক্ত জনবসতিগুলোতে বাড়িঘরের জানালার কাঁচ ভেঙে যায়, টেবিলের উপর রাখা কাঁচের প্লেটগুলো পড়ে ভেঙে যায়। এমনকি ৭০০ কি. মি. দূরেও দুর্বল শব্দ শোনা যায়। আরো দূরে সেন্ট পিটার্সবুর্গে, কোপেনহেগেন, পট্‌স্‌ডাম এবং ওয়াশিংটন শহরগুলোর ব্যারোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে এর প্রতিক্রিয়া। এসমস্ত যন্ত্র থেকে বায়ুতরঙ্গসমূহের উপস্থিতির সময় নির্ধারণ করা হয়। যন্ত্রে ধরা পড়া তরঙ্গসমূহের উপস্থিতি হিসাব করে দেখা যায় যে ওগুলো পোদ্‌কামেন্নায়া তুঙ্গাসকা নদীর থেকে পূর্বে ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছিল। মজার ব্যাপার হলো বিস্ফোরণে সৃষ্ট বায়ুতরঙ্গ পুরো পৃথিবী দু'বার চক্কর দেয়। কারণ, পট্‌স্‌ডামে ৩০ ঘন্টা পর একই বায়ুতরঙ্গ আবার ধরা পড়ে। পতনজনিত কারণে সৃষ্ট ভূমিকম্প (সিজমিক তরঙ্গ) বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে ভূ-পৃষ্ঠের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হতে থাকে এবং দূরত্বের সাথে কমতে থাকে। এই সমস্ত ভূ-কম্পীয় তরঙ্গ ধরা পড়ে ইর্‌কুট্‌স্ক, তাস্‌খন্দ, তিবলিসি,

এমনকি জার্মানির ভূ-কম্পমান যন্ত্রে (সিজমোগ্রাফ)। অবশ্য জার্মানিতে এক মিলিমিটারের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পরিমাণ ভূমির সরণ ঘটেছে। এসব দেখে মনে হয় যেন বস্তুটি সবচেয়ে ভারি বোমার চেয়েও কয়েকশ' গুণ ভারি ছিল এবং এর বেগ ছিল প্লেন থেকে ফেলা যেকোনো বোমার বেগের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

কিন্তু এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী কী? কোনো আণবিক বোমা নাকি হঠাৎ করে পৃথিবীর কাছে এসে পড়া কোনো খ-বস্তু (উল্কা, গ্রহাণু বা ধূমকেতু)? আবার কেউ কেউ বলছেন ভিনগ্রহর অতি বুদ্ধিমান প্রাণীর কোনো নভোযানের হঠাৎ দুর্ঘটনা। তবে এ কথা বলা যায় যে যা-ই ঘটুক না কেন তার সাথে 'হঠাৎ' শব্দটির যোগ থাকতে হবে। কারণ এ ধরনের ঘটনা বিরল এবং তা প্রত্যাশিতও বটে। কারণ কোনো নিয়মিত ঘটনা হলে পৃথিবী মৃতগ্রহে পরিণত হতো। আর তাই পৃথিবীর পুরু বায়ুমণ্ডলকে হাজারো ধন্যবাদ। এবার কার্য-কারণ সম্পর্ক বিচার করে বিশ্লেষণ করা যাক কোন মহাজাগতিক প্রতিভাস এই বিরল (কিন্তু মারাত্মক) ঘটনার জন্য দায়ী। বেশি গভীরে আমরা যাব না। সংক্ষেপে প্রতিটি সম্ভাবনা বিচার করতে হবে। আরেকটি তথ্য, তুঙ্গাসকার এই বিস্ফোরণে সৃষ্ট ভূ-কম্পীয় অভিঘাত তরঙ্গের সাথে ১৮৮৩ সালে ক্রাকাতোয়া দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাতে সৃষ্ট ভূ-কম্পীয় তরঙ্গের মিল পাওয়া যায়। এই অগ্ন্যুৎপাতে দ্বীপটির অর্ধাংশ উড়ে যায়।

তুঙ্গাসকার এই রহস্যপূর্ণ বিস্ফোরণ সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু হয় ১৯২১ সালে। বিজ্ঞান আকাদমীর সহযোগী লিওনিদ আলেক্সেয়েভিচ কুলিক—একজন খনিজ বিশেষজ্ঞ—ছিলেন এই অভিযানের নায়ক। দুর্গম তাইগা, ঘন বনাঞ্চল, জলাভূমি—এসবই কুলিকের অভিযানকে বিঘ্নিত করেছে। ১৯২৭ এর ফেব্রুয়ারিতে কুলিক তাঁর দ্বিতীয় অভিযান শুরু করেন। এই দুর্গম অঞ্চলের অধিবাসী হচ্ছে 'এভেঙ্ক'রা—যাদের বলা হয় 'তুঙ্গা'। এদের প্রধান জীবিকা হল পশুপালন। কুলিক প্রায় কয়েকশ' বর্গ কিলোমিটার এলাকা খুঁজে দেখেন। বিস্ফোরণ এলাকার সমস্ত গাছ শিকড় শুদ্ধ উঠে আসে। মার্কিতা নদীর তীরে এসে কুলিক দেখলেন দিগন্ত বিস্তৃত উপড়ে পড়া পাইন আর বার্চের সারি। সবগুলো গাছের কাণ্ড একেবারে গোড়া পর্যন্ত পোড়া। তিনি লক্ষ করলেন সব গাছগুলো দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্বদিকে শুয়ে আছে অর্থাৎ মনে হয় বাতাসের ঝাপটা ও তাপতরঙ্গ যেন ঐ দিকে বয়ে গেছে। বহু খোজাখুঁজির পর কুলিক সন্ধান পেলেন এক জলাশয়ের—তুঙ্গারা যাকে বলে 'দক্ষিণের জলা'। সেখানে তিনি দেখলেন যে জলাশয়ের চারদিকে যত গাছ আছে তা জলাশয়কে ঘিরে শুয়ে আছে সূর্যমুখী ফুলের মত। এর কাছেই ছিল একটি বনাঞ্চল। প্রতিটি গাছ মৃত, ডালপালা শূন্য—কিন্তু খাড়া দণ্ডায়মান। কুলিক এর নাম দিলেন 'টেলিগ্রাফ পোস্ট বন'। ১৯৩৭-১৯৩৮ সালের আকাশ থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে বনাঞ্চলের ধ্বংসের দু'টি কেন্দ্র আছে। বিস্ফোরণে কেন্দ্রে যে বনাঞ্চল 'টেলিগ্রাফ পোস্ট বন' ছিল তারই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কথা অথচ সেটি দাঁড়িয়ে আছে। এর একমাত্র কারণ বিস্ফোরণটা হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কিছু ওপরে, ফলে "বিস্ফোরণের তরঙ্গ ছুটে গেছে সমস্ত দিকে, ... উল্কার ঠিক নিচে গাছগুলো যেখানে ছিল ঠিক সমকোণে খাড়া দাঁড়িয়ে, সেখানে বিস্ফোরণ তরঙ্গে গাছ উল্টে পড়েনি, কেবল ডালপালা খসে পড়েছে।

কিন্তু যেখানে এ তরঙ্গের ধাক্কা লেগেছে কোণাকুণি সেখানে তিরিশ থেকে ষাট কি. মি. ব্যাসার্ধ জুড়ে সমস্ত গাছ উল্টে পড়েছে।" বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন যে বিস্ফোরণটি ঘটেছে মাটি থেকে ৮ কি. মি. উপরে এবং তা ১০ থেকে ২০ মিলিয়ন টন টি, এন, টি'র সমতুল্য। অবশ্য এই উচ্চতা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলছেন দু'মাইল উপরে। অনেকে এই বিস্ফোরণের সাথে পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। এবার দেখা যাক পারমাণবিক বিস্ফোরণে কী ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ চেইন বা শৃংখল বিক্রিয়ার মত অর্থাৎ একের পর এক প্রক্রিয়া। প্রথমে আলোর বেগে ধাবমান তাপতরঙ্গ, তারপর একটি অভিঘাত তরঙ্গ—যার গতি হচ্ছে প্রথম মাইল তিন সেকেন্ডে, পরবর্তী মাইল পাঁচ সেকেন্ডে। মুখ্য অভিঘাত তরঙ্গ বিভিন্ন প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টি করে গৌণ অভিঘাত তরঙ্গ। বিস্ফোরণের ফলে অতি উত্তপ্ত বায়ু উপরে উঠে যায় হাল্কা হয়ে। ফলে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয় তা পূরণ করে ভূ-পৃষ্ঠস্থ আগাছা, ছাই, ধুলিকণা ইত্যাদি। এগুলো উপরে উঠে অগ্নিগোলকের সংস্পর্শে এসে জ্বলে উঠে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে বাতাসের যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয় তা পূরণ করে চারিপার্শ্বস্থ শীতল, ভারি বাতাস। এই দু'টো ঘটনা একই সাথে ঘটে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফেলার ফলে এই ধরনের প্রতিভাসশৃংখল গোচরীভূত হয় এবং তুঙ্গাসকার বিস্ফোরণের সাথে এর অনেকটা সাযুজ্য আছে। উপড়ে-যাওয়া পোড়া গাছ এবং বিস্ফোরণ কেন্দ্র অভিমুখে তাদের শুয়ে থাকা অতিতপ্ত তাপতরঙ্গ ও সেই সাথে এক প্রচণ্ড বাত্যাপ্রবাহের ইঙ্গিত দেয়। অস্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তাও নাকি পাওয়া গেছে তুঙ্গাসকায়। তবে যাই হোক আজ আর সুনিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না আণবিক বিস্ফোরণের অনুরূপ বিস্ফোরণ তুঙ্গাসকায় ঘটেছিল কিনা। তবে একথা বলা যায় যে আণবিক বিস্ফোরণ না হলেও অবস্থাদৃষ্টে আণবিক বিস্ফোরণের খুব কাছাকাছি একটা বিস্ফোরণ সেখানে হয়েছিল।

যদি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটেই থাকে তবে অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন জাগে ১৯০৮ সালে আণবিক বোমা কে বানাতে পারে? কারণ ঐ সময়ে অণু থেকে শক্তির নিষ্কর্ষণের ব্যাপারটি ছিল নেহায়েতই কাগজে-কলমে, তত্ত্বে ও তথ্যে। তাহলে? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে এক প্রকল্প খাড়া করেন। সেটি হল যে ভিনগ্রহের অতি বুদ্ধিমান প্রাণী আণবিক বা পারমাণবিক শক্তিচালিত নভোযানে পৃথিবীতে এসেছিল। কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে নভোযানটি ধ্বংস হয়ে যায়। আর রেখে যায় বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এধরনের প্রকল্পের পুরোভাগে ছিলেন আলেকজেন্ডার কাজানৎসেভ। তিনি বললেন যে মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীরা একটি আণবিক শক্তিচালিত যানে চড়ে শুক্রগ্রহে হানা দেয় এবং তারপরে পৃথিবী নামক গ্রহের জনবিরল (এবং অনেকটা নাকি তাদের মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ার অনুরূপ) অঞ্চল সাইবেরিয়ার তুঙ্গাসকায় বা মেরু অঞ্চলের কোথাও অবতরণের চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত (কিন্তু সৌভাগ্য পৃথিবীবাসীর!) যাত্রাপথের কোনো ত্রুটির জন্য দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি আরো বলেন যে তাদের এই আগমনের হেতু পানি। যেহেতু মঙ্গলে সেচের পানি

অপর্যাপ্ত সেইহেতু তারা চেয়েছিল পৃথিবীর অতিরিক্ত পানি নিয়ে যেতে। বেড়ে বলেছেন কমরেড কাজানৎসেভ! এই সামান্য পানি নেওয়ার জন্য এতো কিছু। পৃথিবীবাসীদের কাছে চাইলেই তো হতো। তা না করে মঙ্গলবাসী বুদ্ধিমান কমরেডরা যে কেন চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিলেন তা বোঝা মুশকিল। এধরনের চোরাচালান আমাদের গ্রহের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি রীতিমতো হুমকিস্বরূপ! কিংবা সুসভ্য (?) মঙ্গলবাসীরা মহাজাগতিক পানি বন্টন কেন্দ্রে একটা অভিযোগ জানাতে পারতেন!

আসলে এই বিস্ফোরণের জন্য মঙ্গল বা শুক্রগ্রহ থেকে আণবিক শক্তি বহনকারী কোনো স্পেসশীপের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। এই বিস্ফোরণের জন্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে হঠাৎ প্রবীষ্ট যেকোনো ধরনের খ-বস্তুই যথেষ্ট। সত্যকে লুকিয়ে অসাধু, মূর্খ গল্পকথকরা হর-হামেশাই কিচ্ছা বানিয়ে থাকেন। কিন্তু 'সত্যম্ সুন্দরম'। তাই আমাদের উচিত হবে যৌক্তিক দৃষ্টবাদী মন নিয়ে প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান করা।

অনেক বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করেন এই অদ্ভুত বস্তুটি উল্কা ছাড়া আর কিছুই নয়। দুজন বিজ্ঞানী কে. পি. স্তানিয়ুকোভিচ এবং ভি. ভি. ফেদিনস্কি হিসেব-নিকেষ করে এ সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য দিয়েছেন। এরিজোনা কিংবা তুঙ্গাসকায় পতিত এই সব বড় বড় উল্কা প্রায় ৪-৫ কি. মি./সে. বেগে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং এরা এদের বেগের খুব কম অংশই হারায়। এবং এই অত্যুচ্চ বেগে এরা অতি ঘনীভূত গ্যাসের মতই আচরণ করে। উল্কাপিণ্ডের স্ফটিকাকার ল্যাটিস (crystalline lattice) মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে গিয়ে (কিংবা খণ্ডে খণ্ডে পৃথক হয়ে) গ্যাসে পরিণত হয়। এই গ্যাস পরবর্তীতে প্রচণ্ডভাবে প্রসারিত হয়। এতে যে বিস্ফোরণ হয় তা কল্পনাতীত। উল্কাপিণ্ডটি নিজে ভস্মীভূত হয়ে সম্পূর্ণ উবে যায়। উল্কাপিণ্ডের কিছু ছোট ছোট টুকরো বিস্ফোরণের আগেই পৃথক হয়ে যায় এবং এতে তাদের বেগ মন্দীভূত হয় এবং এরা ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়।। ১৯৫৭ তে উল্কাপিণ্ডজাত লৌহের কিছু আণুবীক্ষণিক কণা পাওয়া যায়—অবশ্য পৃথিবীর অন্যত্রও এরা লভ্য। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উল্কাটি ভূমিতে পতনের পূর্বেই বিস্ফোরিত হয়ে ছোট ছোট কণা, ধূলি এমনকি গ্যাসে রূপান্তরিত হয়।

ফেসেনকভের মতে অবশ্য, বস্তুটি উল্কাপিণ্ড নয়, বরঞ্চ ধূমকেতুর কেন্দ্র। অবশ্য এতে ঘটনাক্রমের কোনো পরিবর্তন হয় না। সাধারণভাবে, যদি উল্কাপিণ্ডের ধাক্কা কম হয় তবে Crater বা খাদ এর সৃষ্টি হয় ; কিন্তু সংঘাত বা ধাক্কা (impact) যদি বেশি হয় তবে সেটা বাতাসে বিস্ফোরিত হবে। এবং এতে বিস্ফোরণ-খাদ সৃষ্টি হবে।

সম্প্রতি 'নেচার' পত্রিকায় বলা হয় যে তুঙ্গাসকার ১,৩৬০ বর্গকিলোমিটার ব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞের মূলহোতা হল ৫৮ মিটার ব্যাসের একটি গ্রহাণু। গ্রহাণুরা মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে থেকে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে যেহেতু বিস্ফোরণস্থানে উল্কাজাত পদার্থের খুব কম উপস্থিতি এবং একটি 'তুষারিত' ধূমকেতুর কেন্দ্র আরো উঁচুতে বিস্ফোরিত হবে, সেহেতু এটি গ্রহাণু হওয়াই অধিক সম্ভাব্য। নাসা'র ক্যালিফোর্নিয়াস্থ Ames Research Centre ও উইসকন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা

এই গবেষণায় অংশ নেন। মেরিল্যান্ডের গ্রীনবেল্টস্থ নাসা'র গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার এর বিজ্ঞানী ক্রিষ্টোফার চিবা বলেন যে সাম্প্রতিক কম্পিউটার সিমুলেশন দেখায় যে ধূমকেতুর পক্ষে বিস্ফোরণ আরো উঁচুতে হবে এবং গ্রহাণুর বেগ যদি কম হয় তবে তা ভূমিকে আঘাত করবে। তবে একটি পাথুরে গ্রহাণুর পক্ষে একেবারে সঠিক উচ্চতায় বিস্ফোরণ সম্ভব যদি সেটার বেগ সেকেন্ডে ১৪ কি. মি. হয়। এই বেগের ফলে গ্রহাণুর সম্মুখে বায়ুর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হবে কিন্তু পশ্চাতে একটি প্রায় শূন্যস্থান সৃষ্টি হবে ; গ্রহাণুর পার্শ্বেও চাপ খুব কম হবে। লব্ধি বিকৃতি যখন দৃঢ়তার গুণাংককে অতিক্রম করে যায় তখনই, সেকেন্ডের দশভাগের এক ভাগ সময়ে, এটি বিস্ফোরিত হবে। ১৯৯২ সালে পৃথিবীর খুব কাছ থেকে অতিক্রম করে একটি গ্রহাণু Toutatis। ক্যালিফোর্নিয়ার মোজাভ মরুভূমির ৬৯ মিটার ব্যাসের অ্যান্টেনা দিয়ে একে অনুসরণ করা হয়। এই গ্রহাণুটি দু'টি বড় বড় পাথরের টুকরার মহাকর্ষের দ্বারা একীভূত হয়ে গঠিত হয়েছে। একটি টুকরা ৪ কি. মি. ও অন্যটি ২.৫ কি. মি. চওড়া। এই সমস্ত গ্রহাণু—যারা পৃথিবীর খুব নিকট দিয়ে যায়—হঠাৎ পৃথিবীকে ধাক্কা দিতে পারে। এথেকে বিজ্ঞানীরা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিজ্ঞান নির্ভর তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানলাম সত্যিকারভাবে কী ঘটেছিল। কিন্তু তবু কল্পনা, গল্প, গুজব থেমে থাকেনি। কেউ বলছেন বস্তুটি একটি প্রতিবস্তু (antimatter)। প্রতিবস্তু হলে ধ্বংস-পরবর্তী দৃশ্য এরকম তুঙ্গাসকার মতো হবে না। এবং বড় কথা হল প্রতিকণিকা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলেও প্রতিবস্তু এখনো পাওয়া যায়নি। তাছাড়া মহাবিশ্বের অসংখ্য বস্তুর সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে পৃথিবীতে আসার সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ। এবার ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণবিবরের ক্ষেত্রে কী ঘটে দেখা যাক। ভূ-পৃষ্ঠে যদি কোনো কৃষ্ণবিবর রাখা যায় তাহলে এটা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে 'পড়ে' যাবে অর্থাৎ বুলেটের মতো কেন্দ্রের দিকে ছুটে যাবে। এটা পৃথিবীর মধ্য দিয়ে সামনে পিছনে দুলতে থাকবে, যতক্ষণ না এটি কেন্দ্রে স্থিত হচ্ছে, কাজেই সে সম্ভাবনাও বাদ। এবার ভিনগ্রহবাসীদের কথা। মহাবিশ্বের অন্যত্র প্রাণের বিকাশ বিচিত্র নয়। হয়ত কম বুদ্ধিমান বা সমান বুদ্ধির পর্যায়ের কিংবা অতি বুদ্ধিমান প্রাণী মহাবিশ্বে থাকতে পারে। তবে আমাদের সৌরজগতে বুদ্ধিমান প্রাণী পৃথিবী ব্যতীত অন্য কোনো গ্রহে সম্ভবত নেই। তবে অন্য কোনো তারকায় (যেমন- বার্নার্ডের তারায়) বা তারকামণ্ডলীতে প্রাণধারী গ্রহ থাকার সম্ভাবনা প্রচুর। মহাবিশ্বের লক্ষ-কোটি তারার মেলায় প্রাণের বিকাশ খুবই সম্ভব—যদিও এটি একটি খুবই বিরল এবং প্রান্তিক সম্ভাবনার ঘটনা। আমাদের ছায়াপথেই আছে দশহাজার কোটি তারা এবং এরকম গ্যালাক্সির সংখ্যাও কোটির ওপরে। তাহলে তারার সংখ্যাই প্রায় গোগোল ($১০^{১০০}$) বা গোগোলপ্লেক্স $১০^{১০^{১০০}}$ ছাড়িয়ে যায়। এই কল্পনাতীত তারার মেলায় সমস্ত সম্ভাবনা (নক্ষত্র থেকে দূরত্ব, নক্ষত্রের স্থায়িত্ব, ক্যাটেনেশন ধর্মযুক্ত মৌল, প্রচুর সংখ্যক যৌগ, পানি, গ্রহের দ্রুত আবর্তন ইত্যাদি) বিচার করলেও উন্নত সভ্যতার সংখ্যা আমাদের ছায়াপথেই ন্যূনতম ১০০। কাজেই বুদ্ধিমান প্রাণীর ধারণা অমূলক নয়। তবে

তুঙ্গাসকার ক্ষেত্রে একটি মহাজাগতিক দুর্ঘটনাকে অমূলকভাবে ভিন্ন গ্রহবাসীদের কীর্তি বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ যারা স্পেসশিপ নিয়ে গ্রহান্তরে আসবে তারা অন্ততঃপক্ষে যোগাযোগের চেষ্টা করবে। কারণ আন্তঃনক্ষত্র পরিভ্রমণের জন্য এরকম বুদ্ধিমত্তা আবশ্যক।

প্রায় প্রতিটি ঘটনার পেছনে আছে কার্যকারণ সম্বন্ধ। আমাদের সেটা খুঁজে নিতে হবে। অসত্যের আবর্জনা থেকে সত্যকে মুক্তির আলোতে নিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞানের ছদ্মাবরণে অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের যাত্রা রুদ্ধ করতে হবে। প্রকৃতি রহস্যপ্রিয়। কিন্তু সাথে সাথে রহস্য উদ্‌ঘাটনের পন্থাও প্রকৃতিই উন্মোচন করে দেয়। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে মনগড়া কাল্পনিক ঘটনা গড়ে তুলে বিজ্ঞানের নামে চালানোর অপচেষ্টা রোধ করতে হবে। তুঙ্গাসকার এই বিস্ফোরণটি দীর্ঘদিন ছিল বিতর্কিত। আজ আর বিতর্কের কোনো স্থান নেই। এটি নেহায়েতই একটি মহাজাগতিক দুর্ঘটনা।

[এই প্রবন্ধে অন্যান্য বইয়ের সাথে 'রহস্য পত্রিকা' জুন ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।]

ধূমকেতু-বৃহস্পতি সংঘর্ষ

প্রায় আট বছর হতে চললো বৃহস্পতির সাথে ধূমকেতুর সংঘর্ষ ঘটে গেছে। এই সংঘর্ষটি পৃথিবীতে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কোনো গ্রহের সাথে ধূমকেতুর (বা গ্রহাণুর) সংঘর্ষ এই প্রথম প্রত্যক্ষ করা গেল। আমাদের দেশেও এ নিয়ে বেশ হইচই হয়েছিল। সে যাহোক, এই সংঘর্ষের পর গ্রহরাজের মতিগতি কেমন আছে সেটা জানা বেশ জরুরি। এই সংঘর্ষ কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ফেলেছে তা জানতে হবে। কারণ অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সাথে এরকম যেকোনো সংঘর্ষ ঘটে যেতে পারে। বিশেষ করে সুইফ্‌ট-টাট্‌ল নামের একটি ধূমকেতুর সাথে পৃথিবীর অনিবার্য সংঘর্ষের কথা ক'দিন আগে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ২১২৬ সালের ১১ জুলাই এটি পৃথিবীর বিপজ্জনকভাবে কাছে চলে আসতে পারে। পরে অবশ্য দেখা যায় যে সংঘর্ষ বাধার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে (৩০৪৪ সালে) এটি পৃথিবীর আরো কাছে এসে পড়বে। তখন যদি সংঘর্ষ হয়? আসলে প্রকৃত উত্তর কেউ জানে না, কারণ ধূমকেতুদের আচরণ কোনো দীর্ঘমেয়াদী গাণিতিক সূত্র মেনে চলে না। এদের আকৃতি খুবই ছোট হলেও কখন, কার প্রভাবে এটি কী অবস্থায় থাকবে সেটা আগাম বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এরা ছোট হলেও পৃথিবীর সাথে এদের সংঘর্ষ যথেষ্ট মারাত্মক। যেমন সুইফ্‌ট-টাট্‌ল এর ব্যাস মাত্র ১৫ কি. মি. হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সাথে এর সংঘর্ষে "২০০ কি. মি. চওড়া খাদ তৈরি হবে, ওজোন স্তর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, বিশাল ধূলোর মেঘ মাসের পর মাস ঢেকে রাখবে সূর্যের আলো। এর ফলে প্রাণীজগতের বেশির ভাগ প্রজাতিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে"। বোঝাই যাচ্ছে, ধূমকেতুর সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষ কতোটা মারাত্মক। আর তাই বৃহস্পতিতে আছড়ে পড়া শুমেকার-লেভি ৯ ধূমকেতুটি নিয়ে হয়েছে প্রচুর গবেষণা। আমরা এখানে সেটাই আলোচনা করছি।

আবিষ্কার

১৯৯৩ সালের ২৩শে মার্চ। ইউজিন শুমেকার, তাঁর স্ত্রী ক্যারোলিন শুমেকার এবং ডেভিড লেভি একত্রে আবিষ্কার করলেন একটি ধূমকেতু। পালোমার মানমন্দিরে বসে ওরা রাতের আকাশের কিছু ছবি তুলছিলেন। মাত্র কয়েকটি ছবি তোলার পরই কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল, কারণ ঝড়ো মেঘ পুরো আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল। তাঁদের তোলা ছবির মধ্যে তিনটি ছিল বৃহস্পতি গ্রহ এবং তার নিকটবর্তী আকাশের দুটি চিত্র। ধূমকেতুর ছবি তোলার পদ্ধতি হলো এই যে, আকাশের বিভিন্ন অঞ্চলের আলোকচিত্র তুলে তারপর সেই প্লেটে যদি কোনো অজ্ঞাত বস্তুর ছবি থাকে তবে পুনরায় তা পর্যবেক্ষণ করা। এভাবেই অধিকাংশ ধূমকেতু আবিষ্কৃত হয়েছে। যাহোক দুদিন পর ক্যারোলিন ঐ মেঘলা রাতের তোলা এক্সপোজারগুলি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনিই লক্ষ করলেন যে, এমন একটি বস্তুর ছবি উঠেছে যাকে ভেঙে যাওয়া ধূমকেতু বলে মনে হয়। একটি ধূমকেতুর সাধারণত একটি সুসংজ্ঞায়িত কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস থাকে যা গঠিত হয় ধূলো, পানির বরফ ও নানা জৈব যৌগ দিয়ে। সূর্যের কাছাকাছি এলে এদের বরফ বাষ্পীভূত হয়ে বিরাট গ্যাসীয় পদার্থের লেজ (tail) গঠন করে। কিন্তু এই নতুন ধূমকেতুটির ১টি কোমার বদলে ছিল অনেকগুলো কোমার এক দণ্ডাকৃতির সংগ্রহ এবং একটি জটিল দক্ষিণমুখী

লেজ। পরে আরেকটি উন্নতমানের টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা যায় যে এর ৫টি দৃশ্যমান আলাদা আলাদা কেন্দ্র আছে। কিন্তু এটি নতুন কোনো ধূমকেতু কিনা তা জানার জন্য ওঁরা সেন্ট্রাল ব্যুরো অব অ্যাস্ট্রনমিকাল টেলিগ্রাম্সের পরিচালক ব্রিয়ান মার্সডেনকে রিপোর্ট করেন। মার্সডেন তাঁদের আবিষ্কারকে নিশ্চিত করে ঘোষণা দেন এবং ধূমকেতুটির নাম দেওয়া হয় "পিরিয়ডিক কমেট শুমেকার-লেভি নাইন।" সংক্ষেপে এর নাম এস-এল ৯। এর অর্থ এই যে এটি শুমেকার-লেভি কর্তৃক আবিষ্কৃত নবম পর্যাবৃত্ত ধূমকেতু।

পর্যবেক্ষণ

১৯৯৩-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি মার্সডেন, জেট প্রপালসন ল্যাবরেটরির ইওমান্স, জাপানের সুইচি নাকানো ধূমকেতুটিকে বিশদ পর্যবেক্ষণ করেন। ওঁরা দেখালেন যে আবিষ্কৃত ধূমকেতুটি আসলে বৃহস্পতির চারদিকে কক্ষপথে ঘুরছে। ১৯৯২ সালের ৭ই জুলাই এস-এল ৯ বৃহস্পতির মেঘস্তরের ২০০০০ কি. মি. এর মধ্যে পৌঁছে। বৃহস্পতির চারদিকে এর কক্ষপথের আকৃতি ছিল খুব বেশি পরিমাণে উপবৃত্তীয় (highly elliptic) যার ফলে অসম পীড়নের সৃষ্টি হয় এবং ধূমকেতুটি বিখণ্ডিত হয়ে যায়। যদিও প্রযুক্ত পীড়নের পরিমাণ সামান্য ছিল, কিন্তু তথাপি ধূমকেতুর বস্তু তা সহ্য করতে পারেনি। এর অর্থ হলো প্রথম থেকেই এর গঠনোপাদানগুলো যথেষ্ট জোরালোভাবে আটকে ছিল না। অনেক গাণিতিক হিসাবের পর মার্সডেন ঘোষণা করেন যে ধূমকেতুর ২১টি খণ্ড বৃহস্পতির উপরে আছড়ে পড়বে বলে মনে হয়।

এই ঘোষণার পরপরই সৌখিন ও পেশাদার জ্যোতির্বিদদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদরা সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে নানা ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকেন। কারো মতে ভেঙে যাওয়া খণ্ডগুলো বৃহস্পতির ঘন মেঘমণ্ডলের মধ্যে হারিয়ে যাবে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই। অনেকের মতে প্রতিটি খণ্ডই বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে বিশাল অগ্নিস্তম্ভের সৃষ্টি করবে।

১৯৯৪ সালে ঘটা করে পর্যবেক্ষণ শুরু হয়। কারণ ঐ বছরই জুলাই মাসে এ সংঘর্ষটি ঘটবে বলে আশা করা যায়। এই সংঘর্ষ পর্যবেক্ষণের জন্য অনেক উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছিল। যেমন- হাব্‌ল মহাশূন্য টেলিস্কোপ, এছাড়া বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত নভোযান 'গ্যালিলিও' একাজে প্রভূত সহায়তা করেছে। 'গ্যালিলিও' নভোযানটি ঐ সময়ে এমন এক অবস্থানে ছিল যে এটি সরাসরি সংঘর্ষের স্থানটি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য টেলিস্কোপ একাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। স্পেন , চিলি, হাওয়াই এবং অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন মানমন্দির একাজ তত্ত্বাবধান করে। এছাড়া সংঘর্ষের বর্ণালি বিশ্লেষণের জন্য নাসার কুইপার এয়ারবোর্ন অবজারভেটরিকে তৈরি রাখা হয়েছিল। হাওয়াই এর মনা কীআ মানমন্দিরে অবলোহিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে পর্যবেক্ষণের জন্য ওখানকার কেক মানমন্দিরে ১০ মিটার টেলিস্কোপটি তৈরি রাখা হয়েছিল। আর সৌখিন জ্যোতির্বিদরাতো নিজেদের মতো প্রস্তুত ছিলেনই।

অতঃপর সংঘর্ষ

প্রায় ১৪ মাসের অপেক্ষার পর এলো সেই বহু প্রতীক্ষিত ক্ষণ ঃ ১৬ই জুলাই, ১৯৯৪। অবশেষে ২১ খণ্ডে বিভক্ত ধূমকেতু আছড়ে পড়ল গ্রহরাজের বুকে। এই ২১টি খণ্ডের নামকরণ করা হয়েছে ইংরেজি বর্ণমালা অনুযায়ী (I এবং O বাদে) A, B, C, D,

E, F, G, H, K, L, N, P_1 ও P_2, Q_1 ও Q_2, R, S, T, U, V, W। P এবং Q কেন্দ্র পরে ভেঙে P_1, P_2 এবং Q_1, Q_2 তৈরি করেছিল। নিউক্লিয়াস A প্রথম বৃহস্পতিতে আছড়ে পড়ে এবং স্পেনের কালার আল্টো মানমন্দির থেকে এর ছবি তোলা হয়। প্রাচ্য সময় অনুযায়ী বিকেল ৪টার কিছু পরে এ সংঘর্ষ ঘটে। এই টুকরোটি প্রায় ৬০ কি. মি. / সে. বেগে "ছুটে চলল বৃহস্পতির দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ভেদ করে যাওয়ার সময়ে টুকরোটা উজ্জ্বলভাবে ঝলসে উঠল, ভেঙে গেল আরো অনেক টুকরোয়। তারপর আবহমণ্ডলের মেঘের অন্তরালে গিয়ে বিরাট বিস্ফারণে চূর্ণ হয়ে গেল। মেঘ ছাড়িয়ে আরো ৩০০০ কি. মি. উচ্চতা পর্যন্ত ছিটকে উঠল একটা প্রকাণ্ড আগুনের গোলা। সেটা স্থায়ী হলো প্রায় ১৫ মিনিট। তারপর বৃহস্পতি তার অক্ষের ওপরে খানিকটা ঘুরে যেতেই প্রত্যক্ষ করা গেল ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মাপের এক প্রকাণ্ড ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে বৃহস্পতির গায়ে।" এছাড়াও হাব্‌ল টেলিস্কোপ থেকেও সুন্দর প্রতিকৃতি দেখা গেছে।

কয়েক ঘণ্টা পর B-নিউক্লিয়াস আছড়ে পড়ে। B তুলনামূলকভাবে উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও এর অগ্নিস্তম্ভটি বেশি বড়ো হয়নি। C ও E কেন্দ্র A এর অনুরূপ ফলাফল প্রদর্শন করে। ২ দিন পর G খণ্ডটি খসে পড়ে। এর উজ্জ্বলতা ও ভর সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ছিল। এর আঘাতের ফলে সৃষ্ট অগ্নিগোলকটির উজ্জ্বলতা অবলোহিত মিথেন ব্যান্ডে সমগ্র গ্রহের চাইতে বেশি হয়ে ওঠে। এর ক্ষতচিহ্নটি A, C ও E এর চাইতে বড়ো ছিল। H, K এবং L খণ্ড তিনটির ক্ষেত্রে প্রতিটি নিউক্লিয়াস পতনের পূর্বে অসংখ্য ছোট ছোট কণা গিয়ে বৃহস্পতিকে আঘাত করেছিল। শেষের খণ্ড W এর পতনদৃশ্য ধারণ করে গ্যালিলিও নভোখেয়াযান। উত্তেজনাময় ৬ দিন পর ২২শে জুলাই এই সংঘর্ষের শুভ সমাপ্তি ঘটে।

এস-এল ৯ ধূমকেতুর কয়েকটি তথ্য

১. ধূমকেতুর ভেঙ্গে যাওয়া খণ্ডগুলো বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৬০ কি. মি. / সে. বেগে আঘাত করেছিল।
২. খসে পড়া খণ্ড কর্তৃক সৃষ্ট অগ্নিগোলকের চিত্র গ্যালিলিও নভোযান ধারণ করে।
৩. এই অগ্নিস্তম্ভগুলোর গঠনোপাদান হলো ধূমকেতু ও বৃহস্পতির পদার্থের মিশ্রণ।
৪. এই সমস্ত অগ্নিস্তম্ভগুলোর উচ্চতা মাপা হয়েছে হাব্‌ল মহাশূন্য টেলিস্কোপ দিয়ে এবং এই উচ্চতা হলো ৩,৩০০ কি. মি.।
৫. অগ্নিস্তম্ভের পুড়ে যাওয়া পদার্থ যখন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পড়ছিল তখন তা গ্যাসকে উত্তপ্ত করে তোলে। একে পৃথিবীর অবলোহিত টেলিস্কোপ থেকে উত্তপ্ত বিন্দু হিসেবে দেখা যায়।

সংঘর্ষের স্ন্যাপশট

১. t = ০ সেকেন্ড। ধূমকেতুর ভেঙে যাওয়া একটি খণ্ড একটি বড়ো গ্রহাণুর মতো বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে আছড়ে পড়ে এবং বাষ্পীভূত হতে শুরু করে।
২. t = ৫ সেকেন্ড। ঐ খণ্ডটি বিস্ফোরিত হয়, ফলে উত্তপ্ত পদার্থের একটি অগ্নিস্তম্ভের সৃষ্টি হয়।
৩. t = ৬০ সেকেন্ড। এই অগ্নিস্তম্ভের উচ্চতা (মেঘমণ্ডলের উপরে) প্রায় ৩৩০০ কি. মি. হয়। উপরে ওঠার সাথে সাথে এটি প্রসারিত ও শীতল হতে থাকে। চওড়ায় এটি ২৫০ কি. মি. হয় এবং শীতল হয়ে তাপমাত্রা ৫০০ কেলভিন হয়।

৪. t = ১০ মিনিট। অগ্নিস্তম্ভ থেকে পুড়ে যাওয়া পদার্থ পুনরায় ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে এসে পড়ে এবং পৃথিবীর সমান আকৃতির জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে গ্যাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং একে পৃথিবী থেকে জ্বলতে দেখা যায়।

৫. t = ১ ঘণ্টা। ধ্বংসাবশিষ্ট মেঘের সালফার এবং কার্বন যৌগ একটি বিশাল কালো চিহ্নের সৃষ্টি করে, একে 'জায়ান্ট ব্ল্যাক আই' বলে। কয়েক সপ্তাহ ধরে ছোট ছোট টেলিস্কোপেও এটি দেখা গিয়েছিল।

৬. t = ২ মাস। বৃহস্পতির ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুস্রোতের ফলে এই ধ্বংসাবশেষ সারা গ্রহ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আরো এক বছর হয়ত এই ধ্বংসাবশেষ ঘনীভূত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে। বৃহস্পতির বায়ুস্রোতের কারণে এই ধূলিমেঘ গ্রহকে ঘিরে একটি ব্যান্ডের বা ফিতার সৃষ্টি করে এবং তারপর হারিয়ে যাবে।

অজ্ঞাত সব প্রশ্ন

১. ধূমকেতু খণ্ডগুলোর সঠিক আকৃতি জানা যায়নি।

২. এই খণ্ডগুলি কি শুধু গ্রহের উপরের বায়ুমণ্ডলে বিস্ফোরিত হয়েছে নাকি আবহমণ্ডলের গভীরে প্রবেশ করেছিল?

৩. সংঘর্ষের স্থানে দৃষ্ট কালো পদার্থ কী দিয়ে তৈরি? এর উৎস বৃহস্পতি গ্রহ না ধূমকেতু তা জানা যায়নি।

৪. প্রত্যেক খণ্ডের ক্ষেত্রেই অগ্নিস্তম্ভের উচ্চতা একই ছিল কিন্তু আকৃতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেন?

কিছু মন্তব্য

এই ধূমকেতুটির প্রকৃতি সত্যিই বিস্ময়কর। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল নেপচুনের কক্ষপথের বাইরে কোথাও থেকে। সূর্যের চারদিকে কয়েক হাজার বছরে মাত্র একবার এটি ঘুরে আসত। কিন্তু বৃহস্পতির কাছ দিয়ে কয়েকবার যাওয়ার ফলে এর পর্যায়কাল কমে কয়েক দশকে ঠেকে। বোধহয় ১৯২৯ সালের দিকে বৃহস্পতির বন্ধনে ধূমকেতুটি চিরতরে বাঁধা পড়ে এবং এটি একটি উপগ্রহের মতো আচরণ করে। কিন্তু গ্রহটিকে ঘিরে এর ২ বছরের কক্ষপথটি ছিল নানা কারণে অস্থায়ী। অবশেষে ১৯৯২ সালে এর কক্ষপথ অধিক উপবৃত্তীয় থাকার কারণে বৃহস্পতির জোয়ার বলের (tidal torce) কারণে ধূমকেতুটি ভেঙে যায়। এ অবস্থায় বৃহস্পতির চারদিকে একবার পূর্ণ ঘূর্ণনের আগেই এরা সবেগে গ্রহের বুকে আছড়ে পড়ে। সংঘর্ষের শক্তি ছিল মোটামুটি কয়েকশ হাজার হাইড্রোজেন বোমার সমান। এই হচ্ছে শুমেকার-লেভি ৯ ধূমকেতুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এবার আসা যাক ধূমকেতুর সংঘর্ষ পরবর্তী অগ্নিগোলক সম্পর্কে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী ধারণা করেছিলেন যে যখন ধূমকেতু খণ্ড বৃহস্পতির বাতাবরণে আঘাত করে তখন তা বৃহদাকার উল্কার মতো জ্বলে উঠবে এবং আলোর একটি ঝলক দেখাবে। কিন্তু সমস্যা হলো এই যে, প্রায় ৬০ কি. মি. / সে. বেগে আছড়ে পড়লে এরা বায়ুমণ্ডলের অনেক গভীরে প্রবেশ করবে, কিন্তু তা হলে ঝলকগুলো (flash) এতোক্ষণ স্থায়ী হলো কী করে? তাই অনেকে মনে করেন এই ঝলকগুলো হলো সংঘর্ষের স্থান থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া, প্রসারমান, অতিতপ্ত গ্যাসের মেঘ। উত্তপ্ত এই অগ্নিগোলক প্রসারিত ও শীতল হওয়ায় এর উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে কমে যাবে। গ্যালিলিও খেয়াযানের সিসিডি (CCD) ক্যামেরা এই

অগ্নিঝলককে খুব নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অগ্নিঝলক সম্পর্কে দু'টি মতই সঠিক। প্রথম ৫ সেকেন্ডে ধূমকেতু খণ্ডের বাইরের অংশের দহন দেখা গিয়েছিল। এটি ৬০ কি. মি. / সে. বেগে বাতাবরণে আঘাত করে এবং এর ফলে পুড়তে শুরু করে। প্রাথমিক তাপমাত্রা প্রায় ৭৫০০ কেলভিন পর্যন্ত পৌঁছেছিল (সূর্যের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা ৫৮০০ কে.) এবং চওড়ায় অগ্নিগোলকটি ছিল ১০ কি. মি.। পরবর্তী ১ মিনিটে এই অতিতপ্ত অগ্নিগোলক বিস্ফোরিত হয়ে চওড়ায় ২৫০ কি. মি. ও শীতল হয়ে ৫০০ কেলভিনের একটি ম্রিয়মান গ্যাসীয় মেঘে পরিণত হয়। মজার ব্যাপার এই যে, সকল খণ্ডের ঝলকের উজ্জ্বলতা এবং অগ্নিস্তম্ভের উজ্জ্বলতা একই ছিল। এর কারণ জানা যায়নি।

এদিকে ধূমকেতু খণ্ডের আকৃতি নিয়েও বিতর্ক হচ্ছে। বৃহত্তম খণ্ডগুলির আকৃতি মোটামুটি ০.৫ থেকে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে হয়ে থাকে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে এই খণ্ডগুলির আকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না। এঁদের মতে খণ্ডগুলি অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফাইডের স্তর ভেদ করে পানিমেঘের স্তরে প্রবেশ করে। এই স্তরে উপরের স্তরগুলোর চাপে খণ্ডটি বৃহস্পতির গভীরে ডুবে যায় এবং সংঘর্ষের কিছুই প্রায় দেখা যায় না। অন্যদিকে ছোট খণ্ডের প্রবক্তাদের মতে এরা পানিমেঘের স্তরে প্রবেশ করতে পারে না বটে, কিন্তু সংঘর্ষের ফলে উত্তপ্ত গ্যাস অনেক উচুঁতে নিক্ষিপ্ত হয়। এর সপক্ষে ৩টি সাক্ষ্য আছে ঃ প্রথমত, হাব্‌ল টেলিস্কোপ ধ্বংসাবশিষ্ট গ্যাসমেঘে প্রচুর সালফার ও অ্যামোনিয়া পর্যবেক্ষণ করেছে। কেবল ধূমকেতু থেকে এই পরিমাণ সালফার ও অ্যামোনিয়া পাওয়ার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, খণ্ডগুলো বড়ো হলে সংঘর্ষ পরবর্তী পর্যাপ্ত ভূ-কম্পীয় তরঙ্গের অভাব। তৃতীয়ত, প্রতিটি সংঘর্ষের মোট শক্তি (অগ্নিঝলকের সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা থেকে প্রাপ্ত) পরিমাপ করে দেখা গেছে তা ছোট খণ্ডেরই সমর্থন দেয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে, এই ফলাফলগুলো মেঘের উপর দিয়ে গ্যালিলিও এর যন্ত্রপাতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল। যদি সংঘর্ষের শক্তির অধিকাংশই মেঘের গভীরে চাপা পড়ে যায় তাহলে তা আর যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়ে না। কাজেই বোঝা সম্ভব নয় ধূমকেতুর খণ্ডগুলো আসলে বড়ো না ছোট।

এস-এল ৯ বৃহস্পতির এই ঐতিহাসিক সংঘর্ষটি আমাদেরকে মহাজাগতিক সংঘর্ষ সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছে। এসব তথ্য খুবই দরকারী। কারণ পৃথিবীর সাথে কোনো ধূমকেতুর সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা দূরভবিষ্যতে যথেষ্ট আছে। যদিও এ ধরনের ঘটনা ১০০০০ বছরে ১ বার ঘটতে পারে। তথাপি দূর ভবিষ্যতে মানুষকে যেকোনো মহাজাগতিক দুর্ঘটনা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে (অবশ্য যদি না তার আগেই বুদ্ধিমান মানুষ নিজেদেরকে নিজেরাই ধ্বংস করে না ফেলে)। এই সংঘর্ষ যদি কয়েক দশক আগে হতো তাহলেও আমরা এতো তথ্য পেতাম না। তাই ধন্যবাদ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে, ধন্যবাদ তাঁদের টিমওয়ার্ককে। আমাদের ক্ষীণ আশাবাদ এই যে, বাংলাদেশও অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের আন্তর্জাতিক টিমওয়ার্কে অংশ নেবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

[এই প্রবন্ধ রচনায় 'সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান,' 'অ্যাস্ট্রনমি 'এবং 'আনন্দমেলা' (১০ এপ্রিল ১৯৯৬) পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।]

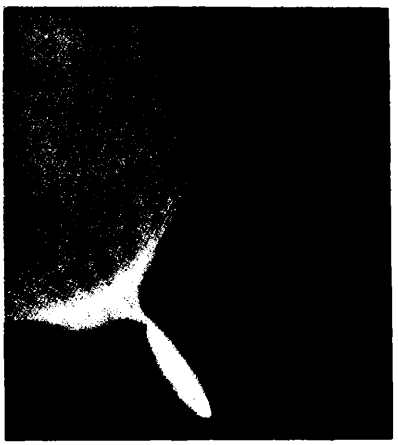

তারার জগতে হাতছানি

তারার দূরত্ব ও উজ্জ্বলতা

প্রাচীনকালে মানুষ তারাকে ভাবত দূরান্তের দীপ্তি যা দেবতারা অনুগ্রহ করে আকাশের গায়ে জ্বালিয়ে রেখেছেন। কিন্তু যখন জানা গেল ওগুলো শুধু মিটমিটি প্রদীপ নয় বরঞ্চ এক একটি জ্বলন্ত নক্ষত্র—কেউ বা সূর্যের তুলনায় ছোট, কেউ বা সহস্র গুণ বড়। তখনই মানুষ এদের দূরত্ব বের করার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করে। কারণ ওগুলো আর কোনো কাল্পনিক বস্তু নয় কিংবা মানুষের ভাগ্য নির্ধারক কোনো জ্যোতিষও নয়।

বর্তমানে তারার দূরত্ব নির্ণয় করতে ত্রিকোণমিতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। পদ্ধতিটি অবশ্য কাছাকাছি তারাদের জন্য ভালো কাজে দেয়। প্রথম দিকে তারার দূরত্ব নির্ণয়ে লম্বন (প্যারাল্যাক্স) পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হতো। লম্বন পদ্ধতি কী করে কাজ করে তা খুব সহজে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। চোখের সামনে একটি কলম ধরা যাক। এবার এক চোখ বন্ধ করে এর দিকে লক্ষ করতে হবে। এবার এই চোখ বন্ধ করে অন্য চোখ দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে পেছনের স্থির পটভূমির সাপেক্ষে কলমটির ডানে-বামে কিছু সরণ ঘটেছে। কলমটি যতো দূরে ধরা হবে এই সরণ ততো কম হবে। এই সরণকে বলে লম্বন কোণ। অনুরূপ পদ্ধতিতে তারার দূরত্ব নির্ণয়ে পেছনের তারাদেরকে স্থির পটভূমি ধরে নেওয়া হয়। পৃথিবীর ওপর দুই স্থান থেকে তারার লম্বন পরিমাপ করা যায়। তবে অনেকসময় এই দূরত্ব তারার দূরত্বের তুলনায় অত্যন্ত কম হয়, ফলে লম্বন কোণও খুবই কম হয়। এজন্য জার্মান জ্যোতির্বিদ বেসেল পৃথিবীর কক্ষপথের দুটি অবস্থানে তারার লম্বন পরীক্ষা করলেন। অবস্থান দুটি এমন যে এদের দূরত্ব ছয়মাস। অর্থাৎ বিন্দু দুটি পার্থিব কক্ষপথের দুটি বিপরীত বিন্দু যাদের দূরত্ব ৩০ কোটি কি. মি.। এভাবে একটি তারার জন্য তিনি লম্বন কোণ পেলেন মাত্র ০.৩ সেকেন্ড। ১ সেকেন্ড হলো ১ ডিগ্রীর ৩৬০০ ভাগ। ফলে তারাটির দূরত্ব দাঁড়াল ১০৩ মিলিয়ন মিলিয়ন কি. মি.। এভাবে কোনো তারার লম্বন যদি ১″ হয় তবে এর দূরত্বকে প্যারাল্যাক্স-সেকেন্ড সংক্ষেপে পারসেক বলে। কোনো তারার লম্বন ০.১″ হলে এর দূরত্ব ১০ পারসেক। খুব বেশি দূরত্বের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি কার্যকরী নয়। লম্বন কোণ যদি দশমিকের পর দু'ঘর পর্যন্ত যায় তবে এ পদ্ধতিতে ভুল হবে ০.০১″। দূরত্ব নির্ণয়ের আরেকটি সহজ পদ্ধতি আছে। তবে তার আগে তারার উজ্জ্বলতা সম্পর্কে জানা থাকা চাই।

তারার উজ্জ্বলতা খালি চোখে যতোটুকু দেখা যায় সেটাকে বলে তারার আপাত উজ্জ্বলতা বা প্রভা। বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উজ্জ্বলতার একটি মানদণ্ড আছে। যেকোনো শ্রেণীর উজ্জ্বলতা তার পূর্ববর্তী শ্রেণীর তুলনায় ২.৫ গুণ কম এবং পরবর্তী শ্রেণীর তুলনায় ২.৫ গুণ বেশি উজ্জ্বল। খালি চোখে সর্বনিম্ন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর তারা দেখা যায়। এ নিয়মে উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধকের উজ্জ্বলতা -১.৫। সূর্যের আপাত উজ্জ্বলতা -২৬.৯। এদের উজ্জ্বলতা নেগেটিভ। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই (কারণ,-১ শ্রেণীর তারা শূন্যতম শ্রেণীর তারার তুলনায় ২.৫ গুণ বেশি উজ্জ্বল)। কিন্তু যদি কোনো তারাকে ১০ পারসেক

দূরত্বে নিয়ে যাওয়া যায় তবে (খালি চোখে) এর যে আপাত উজ্জ্বলতা হবে তখন তাকে বলা হয় পরম উজ্জ্বলতা। ফলে সূর্যকে যদি ১০ পারসেক দূরত্বে নিয়ে যাওয়া যায় তবে এর প্রকৃত বা পরম প্রভা হবে ৪.৭। সবচেয়ে ক্ষীণ তারার পরম প্রভা +১৯, অর্থাৎ সূর্যের তুলনায় তা ১ মিলিয়ন ভাগ কম উজ্জ্বল। তারার আপাত ও পরম উজ্জ্বলতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যের সম্পর্ক হলো ঃ পরম উজ্জ্বলতা = আপাত উজ্জ্বলতা + ৫ - ৫ লগ (দূরত্ব, পারসেকে)।

এক ধরনের তারা আছে যাদের আপাত উজ্জ্বলতা বাড়ে বা কমে। নির্দিষ্ট সময় পর উজ্জ্বলতা আবার আগের মতো হয়। এধরনের পর্যায়ী বিষমতারাদের বলে শেফালী বিষমতারা (Cepheid variables)। হেনরিয়েটা লিভিট ১৯১২ সালে দেখালেন যে এই শেফালী বিষমতারাদের বিষমতার পর্যায়কাল তাদের পরম উজ্জ্বলতার সাথে রৈখিক সম্পর্কে আবদ্ধ। পর্যায় বেশি হলে পরম প্রভা বেশি। একে বলে পর্যায়-প্রভা সম্পর্ক (পিরিয়ড-লুমিনোসিটি রিলেশন)। এর ফলে দূরবর্তী যেসব গ্যালাক্সিতে শেফালী তারাদের বিষমতার পর্যায়কাল পরিমাপ করা যায়, ফলে জানা যায় পরম প্রভা ; আর আপাত প্রভাতো খালি চোখে দেখাই যাচ্ছে। ফলে পূর্বোক্ত সমীকরণ ব্যবহার করে এদের দূরত্ব সহজেই বের করা যায়।

তারার দূরত্ব নির্ণয়ে এরকম প্রায় ২৭টি পদ্ধতি আছে। যেমন সুপারনোভা, গুচ্ছস্তবক ইত্যাদি। তার কোনোটিই শতকরা ১০০ ভাগ ঠিক নয়। এজন্য অতিদূর নক্ষত্র, গ্যালাক্সিদের জন্য একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং মোটামুটি কাছাকাছি একটি মান গ্রহণ করা যায়।

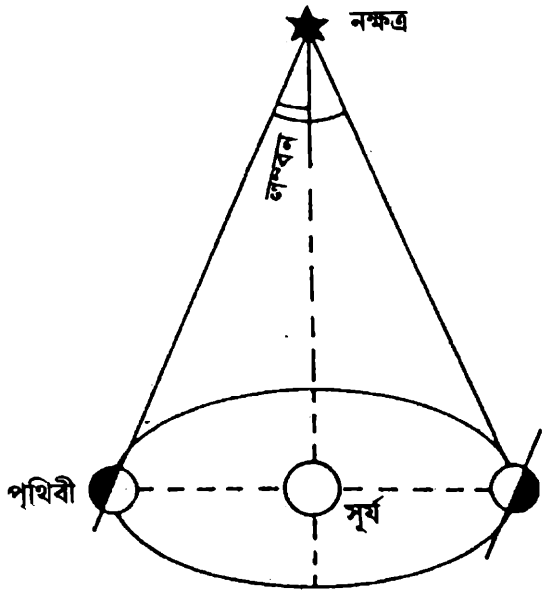

পারসেক পদ্ধতিতে তারার দূরত্ব পরিমাপ।

তারা বর্ণালি

তারার দূরত্ব নির্ণয় করার সাথে সাথে মানুষ ভাবতে শুরু করে তারার গঠন নিয়ে। এরা কী দিয়ে তৈরি, কীভাবে তারা বিন্যস্ত থাকে, সব তারার গঠন একই কিনা ইত্যাদি। কিন্তু কীভাবে তা জানা যাবে? আগের রচনাগুলোয় আমরা দেখেছি এক একটি তারা কীরকম দূরত্বে অবস্থিত, কল্পনাই সেখানে হার মেনে যায়। তাহলে উপায়? আমরা সৌভাগ্যবান, কারণ দেখা গেল তারা থেকে যে আলো আসে তাতেই পাওয়া যাবে তারার জীবনকথা, তার ইতিবৃত্ত, সুসমাচার। বিজ্ঞানলক্ষ্মীর জয়জয়কার শুরু হলো তারার আলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

১৮৫৯ সালে বুনসেন ও কার্শফ দেখলেন যদি বার্নারের উজ্জ্বল আলো সোডিয়ামের বাষ্পের মধ্য দিয়ে চালানো হয় এবং তারপর প্রিজমে প্রবেশ করানো হয় (নিউটনের পদ্ধতি) তখন বর্ণালিতে কালো কালো রেখা দেখা যায়। একই ধরনের কালো রেখা সূর্যের বর্ণালিতে প্রথম লক্ষ করেন ফ্রনহোফার। যখন বার্নারের অনুজ্জ্বল আলোয় সোডিয়াম লবণ দেওয়া হলো তখন বর্ণালির ঐ সমস্ত জায়গায় উজ্জ্বল রেখা দেখা গেল যেখানে ছিল কালো রেখা। এর সারমর্ম হচ্ছে প্রত্যেক মৌলের নিজস্ব বর্ণালি রেখা আছে (এরা দুরকম ঃ নিঃসরণ ও শোষণ রেখা) এবং কারো সাথে অন্য কারো রেখার মিল নেই।

কিন্তু তারাবর্ণালিতে ব্যাপারটি মিলছে না। কারণ এমন সব রেখা পাওয়া যাচ্ছে যারা জানা মৌলের রেখার সাথে মিলছে না। কেন? কারণ তারার অত্যধিক তাপে পদার্থ তাদের বাইরের ইলেকট্রন হারিয়ে আয়ন হয়ে যায়। এই আয়নিত, অত্যুত্তপ্ত গ্যাসকে প্লাজমা বলে। এটি পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। গ্যাসকে আয়নিত ধরে নিলে তারাবর্ণালির কোনো সমস্যা থাকে না। গর্বের বিষয়, এই ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন বাঙালি জ্যোতিঃপদার্থবিদ মেঘনাদ সাহা। ওঁর জন্মস্থান ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর এর কাছে শেওড়াতলী গ্রামে। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে বাঙালি'র এ অবদান বিজ্ঞান মনে রাখবে যতোদিন ভৌতজগত বিরাজ করবে।

বর্ণালি গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে সূর্যে আছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ইত্যাদি। সব তারাতেই হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম প্রচুর অনুপাতে দেখা যায়। (বর্ণালি রেখা কেন তৈরি হয় সেটা উচ্চতর পাঠ্য বিষয়)। আসলে যখন তারার গর্ভে বিকিরণ তৈরি হয় সেই বিকিরণ যখন তারার বাইরের স্তরের মধ্য দিয়ে আসে তখন উপস্থিত পদার্থ আলো শোষণ করে এবং বর্ণালিতে কালো দাগ দেখা যায়। এভাবে তারার গঠনোপাদান জানা যায়।

তারার উজ্জ্বলতা, বর্ণালি এসব জানার পর এদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ১৯১৮ সালে হেনরি-ড্রেপার ক্যাটালগে তাপমাত্রার অধঃক্রমে বর্ণালি শ্রেণীবিভাগ করা হয়। অবশ্য এর আগেও এধরনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। যাহোক শ্রেণীগুলো হলোঃ O, B, A, F, G, K, M, (R, N, S)। (পুরো সিকোয়েন্সটি মনে রাখার জন্য একটি খুব সুন্দর ফ্রেজ আছে ঃ Oh Be A Fine Girl Kiss Me Right Now Sweetheart—প্রত্যেক শব্দের আদ্যক্ষর বর্ণালি ধারা নির্দেশ করছে)। বন্ধনীভুক্ত R, N ও S-তারাদের রাসায়নিক গঠন একটু ভিন্ন এবং এরা দানব বা অতিদানব (supergiant) তারা। বর্ণালির মধ্যে আবার উপশ্রেণী আছে। যেমন G5 হলো GO থেকে KO এর মাঝামাঝি বর্ণালি। O এবং B তারা উত্তপ্ত ও নীলচে, কিন্তু M-R-N-S তারাদের তাপমাত্রা কম, তাই লালচে দেখায়। আমাদের সূর্য একটি G তারা, এর বর্ণালিতে লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম পাওয়া যায়।

এই হার্ভার্ড শ্রেণীবিভাগও পরে অপ্রতুল মনে হওয়ায় ১৯৪৩ সালে এম-কে শ্রেণীবিভাগ চালু হয়। মরগ্যান, কীনান ও কেনম্যানের এই শ্রেণীবিভাগই আধুনিক। এর ফলে যেমন বর্ণালি শ্রেণী জানা যায় তেমনি জানা যায় এর আকৃতি। যেমন একটি তারা (কুঠারপৃষ্ঠ) এর বর্ণালি লেখা হয় F5 Ia। এর অর্থ এর বর্ণালি FO এবং KO এর মাঝে এবং এটি একটি উজ্জ্বল অতিদানব তারা (Ia) আবার O9.5 IV-V—এই বর্ণালির অর্থ তারাটির বর্ণালি O9 এবং B এর মাঝে এবং দানব ও উপদানব তারার মাঝে। এছাড়াও অনেক তারার অদ্ভুত বর্ণালি দেখা যায়। তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো বর্ণালিতে যদি বিশেষ কোনো মৌলের অস্বাভাবিক প্রাধান্য থাকে তবে সেটিও বর্ণালির পাশে লিখে দেবার চল আছে ।

হের্ৎস্প্রুঙ-রাসেল চিত্র ঃ ১৯১১ সালে ডেনিশ এজনার হের্ৎস্প্রুঙ এবং ১৯১৩ সালে মার্কিন হেনরি রাসেল দুটি লেখচিত্র তৈরি করেন। প্রথমজন আপাত উজ্জ্বলতা ও দ্বিতীয়জন পরম উজ্জ্বলতার বিপরীতে তারার বর্ণালি স্থাপন করলেন। দেখা গেল, তারা গুলো সুশৃংখল ভাবে সজ্জিত। এই লেখচিত্রকে এইচ-আর লেখচিত্র বা হের্ৎস্প্রুঙ-রাসেল চিত্র বলে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এটি খুবই প্রয়োজনীয়। এই চিত্রে দেখা যায় অধিকাংশ তারা একটি রেখার উপর পড়েছে যা চিত্রের ডানকোণা থেকে উপরে বামকোণা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলে গেছে। একে বলে প্রধানধারা (main sequence)। এরা অধিকাংশই বামন তারা (সূর্যও এর অন্তর্ভুক্ত)। প্রধানধারায় তাপমাত্রা কমার সাথে সাথে উজ্জ্বলতা, ভর কমে যায়। কিছু তারা আছে যারা প্রধানধারায় পড়ে না। এদেরকে চিত্রের উপরে ডানকোণায় স্থান দেওয়া হয়েছে। এরা দানবতারা (রেহিণী, স্বাতী)। তীব্র উজ্জ্বলতার জন্যই এরা দৃশ্যমান হয়। আরেক ধরনের তারা—সাদা বামনতারা—এইচ-আর চিত্রের নিচে বামকোণায় অবস্থিত। এদের আকৃতি ছোট, ফলে ঘনত্ব অনেক বেশি। এইচ-আর চিত্রে

তারাদের তিন শ্রেণী প্রমাণ করে তারাদের জীবনে ৩টি পর্যায় আছে। সুবিশাল তারকামালায় বিরাজ করছে অভূতপূর্ব শৃংখলা। কোনো কিছুই মহাজাগতিক নিয়মতান্ত্রিকতার সুরের ছন্দপতন ঘটাচ্ছে না। বিজ্ঞানের বদৌলতে আমরা প্রকৃতির আইনসমূহ জানতে পারছি।

অথচ মানুষ কেন এতো অবাধ্য হয়?

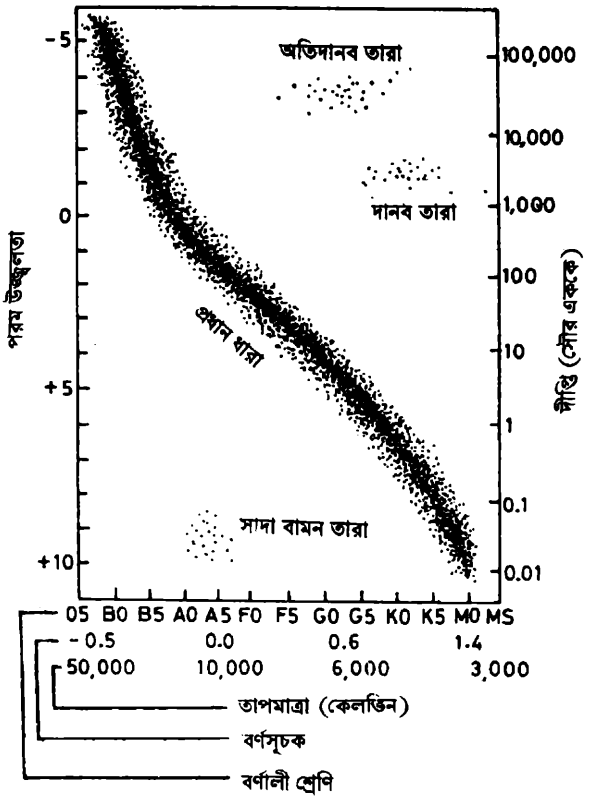

হার্ৎস্প্রুঙ-রাসেল চিত্র।

তারা জ্বলে মিটমিট

রাতের আকাশের ঐ অনন্ত নক্ষত্রবীথি যে অনাদিকাল ব্যাপী মিটমিট করে জ্বলছে তার শক্তির উৎস খোঁজার চেষ্টা মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ করে আসছে। কাছের সূর্যের কথাই যদি ধরা যায় তাও বিস্মিত হতে হবে। কারণ নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপ আমরা উপলব্ধি করি। কী এমন শক্তি যা এই বিপুল তেজের ভাণ্ডার সরবরাহ করছে? নানাভাবে এ সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করা হয়েছে। উনবিংশ শতকে ভাবা হয়েছিল বোধহয় এই জ্বালানি হলো কয়লা। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেছে পূরো সূর্য যদি কয়লা ভর্তি হতো তবে তা মাত্র ২,০০০ বছর জ্বলতো। আবার কেউ বলেছিলেন সূর্যের কেন্দ্রে পদার্থের নিয়মিত পতন অর্থাৎ মহাকর্ষীয় ঘনীভবন এই শক্তি যোগাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি খোলাসা হয় কেবল আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সমীকরণ ($E = mc^2$) আবিষ্কারের পরেই।

আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সমীকরণের মাধ্যমে ভর ও শক্তি এক হয়ে গেল। শক্তি হচ্ছে ভর ও আলোর বেগের বর্গের গুণফল। সমীকরণটির সঠিক তাৎপর্য কেন্দ্রীন পদার্থবিদরা ধরতে পেরেছিলেন। ফলে দেখা গেল বস্তুর পরমাণু এক বিপুল শক্তির উৎস। একে আমরা বলি নিউক্লিয় শক্তি। ফলে বস্তুকণা তথা পরমাণু কেন্দ্রীন শক্তির এক সম্ভাবনাময় উৎসে পরিণত হলো।

তারার জ্বালানি সমস্যায় এটি কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? পথ দেখালেন এডিংটন, ১৯২০ সালে। ওঁর মতে তারার কেন্দ্রে অহর্নিশ ঘটছে অসংখ্য নিউক্লিয় বিক্রিয়া —যার ফলশ্রুতি অসীম তেজ। ১৯৩৯ সালে হান্‌স বেটে এবং ভাইৎস্যাকার মূল কৌশলটি উদ্ভাবন করেন। তারার গর্ভে থাকে প্রচণ্ড চাপ এবং অত্যুচ্চ তাপমাত্রা। ফলে সেখানে বস্তুকণাদের গতিবেগ থাকে বেশি। দেখা যায় একটি প্রোটন কণা কোনো কেন্দ্রীনের এতো কাছে চলে আসে যে কেন্দ্রীন সেটা গ্রাস করে নেয়। ঘটনাটি প্রায়শই ঘটে এবং এর নাম ফিউশন বিক্রিয়া। এ বিক্রিয়ার জন্য ন্যূনতম ১ কোটি কেলভিন তাপমাত্রার দরকার। সমস্ত নক্ষত্রে এই বিক্রিয়াটিই শক্তির মূল জোগান দেয়। জানা আছে, তারার প্রধান গঠনোপাদান হলো হাইড্রোজেন ও কিছু হিলিয়াম।

যে সমস্ত তারার ভর তুলনামূলক কম, যেমন-সূর্য, তাদের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন হয় তার নাম প্রোটন-প্রোটন বা সংক্ষেপে পি-পি চক্র। এর ফলে চারটি প্রোটন (বা হাইড্রোজেন) মিলে একটি হিলিয়াম কণা তৈরি করে ঃ ৪ প্রোটন→হিলিয়াম। কিন্তু মূল নিউক্লিয় বিক্রিয়াটি এতো সহজে ঘটে না। প্রোটন অনেক মধ্যবর্তী ধাপ পেরিয়ে তবেই হিলিয়াম পরমাণু তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন ধাপে পর্যায়ক্রমে নিউট্রিনো কণা এবং উচ্চশক্তির বিকিরণ নির্গত হয়। মোটের উপর ৪টি প্রোটন মিলিত হয়ে একটি হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে। রসায়নের জটিলতা এখানে আমরা পরিহার করছি। এখানে একটি মজার ব্যাপার ঘটে। হাইড্রোজেনের ভর ১.০০৭৯৭ একক ; ফলে ৪টি হাইড্রোজেনের মোট ভর দাঁড়ায় ৪.০৩১৮৮ একক। অথচ একটি হিলিয়ামের ভর ৪.০০২৬ একক। তাহলে

বাকি ভর যায় কোথায়? এখানে আসন্নভর গ্রহণ না করে প্রকৃত ভর ধরা হয়েছে এবং গোলমালটা চোখে পড়েছে। অতিরিক্ত এই ০.০২৯২৮ একক ভর সম্পূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয় এবং শক্তির পরিমাণ $E = mc^2$ সমীকরণ দিয়ে নির্ণয় করা যায়। সূর্যের ক্ষেত্রে প্রতি সেকেন্ডে ৬৭ কোটি টন হাইড্রোজেন পুড়ে যায় এবং প্রতি সেকেন্ডে ৪০ লক্ষ টন বিশুদ্ধ পদার্থ বিশুদ্ধ শক্তিতে পরিণত হচ্ছে।

অধিকতর উত্তপ্ত ও ভারি তারাদের ক্ষেত্রে যে চক্রটি অনুসৃত হয় তার নাম কার্বন চক্র (বা সি. এন. ও. চক্র)। এই চক্রে কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ বিক্রিয়া চালানোর জন্য এরা অপরিহার্য, কিন্তু এরা নিজেরা বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় না। যেমন কার্বন চক্রে ১ম ধাপে বিক্রিয়া শুরু করবার জন্য কার্বনের কেন্দ্রীন প্রয়োজন। আবার শেষ ধাপে হিলিয়ামের সাথে এই কার্বন বেরিয়ে আসে। কাজেই মোটের উপর কার্বন পরমাণু বিক্রিয়ায় অংশ নিল কিন্তু নিজেকে বিলিয়ে দিল না।

কার্বন চক্র প্রোটন চক্রের তুলনায় জটিলতর কিন্তু মোটের ওপর ৪টি প্রোটন মিলে একটি হিলিয়াম গঠিত হয়।

কাজেই নক্ষত্রের শক্তির জন্য যে ফিউশন বিক্রিয়া প্রয়োজন তা দুটি চক্রের সাহায্যে ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা যায়। নিম্নভর তারাদের জন্য প্রোটন চক্র, কিন্তু ভারি তারাদের জন্য কার্বন চক্র। অথচ মূল বিক্রিয়ক ও উৎপাদ একই থাকে, শুধু পদ্ধতি ভিন্ন। নক্ষত্রে শক্তি উৎপাদনের এটিই মূলমন্ত্র।

ভাবতে অবাক লাগে যে অতিদূর ঐসব অসংখ্য নক্ষত্ররাজির মাঝে লুকিয়ে ছিল এতো রহস্য। সামান্য কয়টি বিক্রিয়া চলছে বিশ্বের তাবৎ তারকামালায়। আশার কথা মানুষ এসব আবিষ্কার করছে, উপলব্ধি করছে প্রকৃতির রহস্যময় লীলা।

তারার নিয়তি

তারার অন্তিম নিয়তি নির্ভর করে তারার ভরের উপর। নিম্নভর তারাদের নিয়তি একরকম, উচ্চভর তারাদের নিয়তি অন্যরকম। কোন তারার নিয়তি কী হবে তা হিসেব করে আজকাল বলে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু প্রাচীন মানুষ ভাবতেই পারেনি দেবসুলভ এইসব তারাও একদিন মৃত্যুবরণ করবে। এ ধরনের ভাবনাই ছিল সেকালে মহাপাপ।

আমাদের সূর্যের সমস্ত হাইড্রোজেন পুড়ে শেষ হতে সময় লাগবে ১,০০০ কোটি বছর। ৫০০ কোটি বছর ইতোমধ্যেই অতিবাহিত হয়ে গেছে। সাধারণত কম ভরের তারার আয়ুষ্কাল হয় বেশি। কিন্তু দানব সাইজের, প্রবল উজ্জ্বল তারাদের জীবনকাল অনেক কম (কারণ এদের শক্তির চাহিদা বেশি)—কয়েক মিলিয়ন বছর।

নিম্নভর তারার পরিণতি ঃ এ ধরনের তারার কেন্দ্রে হাইড্রোজেন প্রোটন-প্রোটন চক্র অনুসরণ করে পুড়তে থাকে এবং হিলিয়ামে পরিণত হয়। সময়ের সাথে সাথে কেন্দ্রে হিলিয়ামের 'ছাই' বাড়তে থাকে এবং কেন্দ্র সংকুচিত হয়। তারাকেন্দ্রে হিলিয়াম ভর্তি হয়ে গেলে আর কোনো বিক্রিয়া হয় না। তারায় মহাকর্ষ চাপ যা অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী বিকিরণ চাপ সবসময় সমতা বজায় রাখে। কিন্তু বিক্রিয়া তথা বিকিরণ বন্ধ হলে সুস্থিতি গড়বড় হয়ে যায়। ফলে তারার বাইরের গ্যাসীয় বাতাবরণ প্রসারিত হয় কিন্তু নিষ্ক্রিয় কেন্দ্রটি সংকুচিত হয়। হিলিয়ামকে পোড়াতে হলে চাই ১০ কোটি কেলভিন তাপ। এ অবস্থায় তারাকে বলে লাল দানব (red giant)। এর তাপমাত্রা কম, ঔজ্জ্বল্য কম কিন্তু আয়তন সুবিপুল (আমাদের সূর্য যখন লাল দানব হবে তখন তা শুক্র গ্রহ পর্যন্ত প্রসারিত হবে)। লালদানব পর্যায়ে হিলিয়াম অন্তঃস্থল বাইরের গ্যাস আবরণীর তাপে উত্তপ্ত হতে থাকে। তখনই হিলিয়াম পোড়ানি শুরু হয়। হিলিয়াম পুড়ে কার্বন তৈরি হয়। এর নাম ত্রি-আলফা পদ্ধটি—৩টি হিলিয়াম মিলে কার্বন হয়। এ সময়ে নিয়ন, ম্যাগনেসিয়ামের মতো ভারি মৌল তৈরি হতে পারে। কেন্দ্রে কার্বন জমা হতে থাকে এবং তার বাইরে হিলিয়াম শেলে হিলিয়াম জ্বলতে থাকে। প্রায় ১ মিলিয়ন বছর পর যখন কার্বন অন্তঃস্থল তৈরি হয় তখন কার্বন আর পুড়তে পারে না। কারণ এর জন্য চাই ৬০ কোটি কেলভিন তাপ যা কম ভরের তারার পক্ষে যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে তারার দুটি অংশ থাকে—অত্যন্ত ঘন কার্বন কেন্দ্র ও প্রসারিত বহিরাবরণ। বহির্ভাগের এই প্রসারিত গ্যাস ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়। এটি প্রায় সৌরজগতের সমান আয়তনে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরকে বলে গ্রহ নীহারিকা (planetary nebula)। আমাদের ছায়াপথে এরকম প্রায় ১,০০০ টি আছে। গ্রহ নীহারিকার পর অবশিষ্ট কার্বন কেন্দ্রীনের পরিণতি হয় একটি সাদা বামন (white dwarf) তারা।

ভারি তারার পরিণতি ঃ ভারি নক্ষত্রের আয়ুষ্কাল অনেক কম হয়। তাই এদের অনেক ব্যস্ত সময় কাটে। সূর্যের চেয়ে ৫ গুণ ভারি তারার কেন্দ্রে শক্তি উৎপাদন করে কার্বন (বা সি. এন. ও. চক্র)। পৃষ্ঠ তাপমাত্রা ১২ থেকে ২০ হাজার কেলভিন। প্রধানধারা থেকে যাত্রা শুরু করার পরে কয়েক কোটি বছরের মধ্যে কেন্দ্রের হাইড্রোজেন নিঃশেষ হয়ে যায়। কেন্দ্রে যথেষ্ট তাপমাত্রা থাকায় হিলিয়াম পোড়ানি শুরু হয়। ফলে তারাটি লাল দানবে পরিণত হয়। হিলিয়াম পুড়ে ত্রি-আলফা পদ্ধতিতে কার্বন, অক্সিজেন, নিয়ন, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি তৈরি করে। এ পর্যায়ে কেন্দ্রের তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৭০ কোটি কেলভিনে। তারার কেন্দ্রে যখনই কোনো নতুন পদার্থের পোড়ানি শেষ হয় তখনই বাইরের আবরণী প্রসারিত হয়। এভাবে কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১০০ কোটি কেলভিনে পৌঁছলে সিলিকনের মতো ভারি মৌল তৈরি হয়।

সূর্যের তুলনায় ২০ গুণ ভারি তারার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা থাকে ৩০,০০০ ডিগ্রী। এর দশাও উপরের মতো হবে। যেকোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্রে যখন লোহা তৈরি হয় তখন কেন্দ্রীন বিক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ লোহার পরবর্তী বিক্রিয়া সবই তাপ শোষণ করে নেয়। ফলত তারার কেন্দ্রে ঘটে বিরাট অন্তস্ফোরণ (implosion), ফলে তারাটি এর অধিকাংশ ভর নিয়ে কেন্দ্রে চুপসে যায়। অবশিষ্ট গ্যাসীয় বহিরাবরণ প্রবল বেগে নিষ্ক্রান্ত হয়। এটি হলো সুপারনোভা বিস্ফোরণ। এর ১,০০০ সেকেন্ডের মধ্যে কয়েক ধরনের নিউক্লিয় বিক্রিয়া ঘটতে পারে যার ফলশ্রুতি ভারিতর মৌল।

সুপারনোভার পরবর্তী দশা নিউট্রন তারা অথবা কৃষ্ণবিবর (black hole)। সুপারনোভা বিস্ফোরণ একটি বর্ণিল, মনোমুগ্ধকর মহাজাগতিক ঘটনা। ঘটনাটি অহর্নিশ ঘটে থাকে। ১৯৮৭ সালে দক্ষিণের আকাশে এরকম একটি সুপারনোভা খালি চোখেই দেখা গিয়েছিল। ১০৫০ সালে চীনারা একটি সুপারনোভা অবলোকন করে যা ১৫ দিন স্থায়ী হয়েছিল। বর্তমানে সেখানে কাঁকড়া নীহারিকা অবস্থিত।

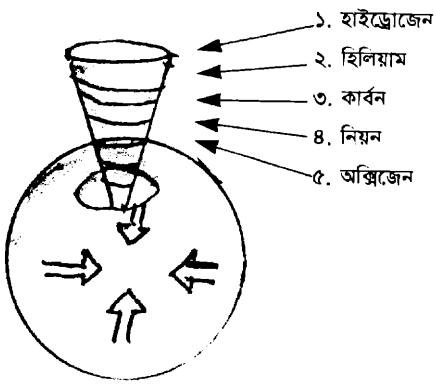

অন্তিম দশায় ভারি তারার অভ্যন্তরভাগে বিভিন্ন মৌলের বন্টন।

কোন তারা কীভাবে বিবর্তিত হবে তা জানার পর এর অন্তিম দশা কী হয় তা জানা প্রয়োজন। কম ভারি তারা অবশেষে সাদা বামনতারা ও বেশি ভরের তারা অবশেষে নিউট্রন তারা বা কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয়। এদের সম্বন্ধে এবার জানা যাক।

সাদা বামনতারা (White Dwarf) ঃ কম ভরের তারা মৃত্যুর পর পরিণত হয় সাদা বামনতারায়। এদের ঘনত্ব প্রচণ্ড। ভর সূর্যের মতো, অথচ আয়তন পৃথিবীর মতো। উজ্জলতা কম হওয়ায় এদের খালি চোখে দেখা যায় না। অকল্পনীয় ঘনত্বের কারণে এদের কেন্দ্রের গ্যাসের পরমাণু কক্ষস্থ সব ইলেকট্রন হারিয়ে ফেলে। ফলে মুক্ত ইলেকট্রনের গ্যাস পাওয়া যায়। এদেরকে অপজাত (degenerate) ইলেকট্রন বলে। একটি ন্যূনতম দূরত্বের নিচে এই ইলেকট্রনকে চাপ দিলে এরা বিপরীত চাপ দেয়। ফলে তারার মহাকর্ষকে ঐ পর্যায়ে ঠেকিয়ে রাখে অপজাত ইলেকট্রন চাপ। একটি সাদা বামনতারার সর্বোচ্চ ভর সূর্যভরের ১.৪ গুণ হতে পারে। এর বেশি হলে অপজাত ইলেকট্রন চাপ আর মহাকর্ষকে ঠেকাতে পারে না। একে বলে চন্দ্রশেখরের সীমা। ভারতীয় জ্যোতিঃপদার্থবিদ চন্দ্রশেখরের এই আবিষ্কার প্রথম দিকে খুব একটা নজর কাড়তে পারেনি সে সময়কার বিখ্যাত বিজ্ঞানী এডিংটনের বিরোধিতার কারণে। ব্যক্তিবিশ্বাসের চাইতে বৈজ্ঞানিক সত্য যে বড় তার প্রমাণ চন্দ্রশেখরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। এডিংটন ও চন্দ্রশেখরের এই বির্তক আগ্রহীরা অন্যত্র পড়ে নিতে পারেন। সাদা বামনতারা দীর্ঘ সময় ধরে তাপ বিকিরণ করে কালো তারায় পরিণত হতে পারে। এরপর এর আর কোনো হদিস থাকে না। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের একটি সাদা বামন সঙ্গীতারা আছে।

নিউট্রন তারা ঃ তারার ভর সূর্যের ১.৫ থেকে ৩ গুণের মধ্যে হলে তার পরিণতি হবে নিউট্রন তারা। এক্ষেত্রে চাপ ও ঘনত্ব এতো বেড়ে যায় যে ইলেকট্রন খুব জোরে ছোটাছুটি করতে থাকে এবং প্রোটনের সাথে মিলে নিউট্রন তৈরি করে। নিউট্রন তারা আসলে একটি বিরাট নিউট্রন গোলা। এর একচামচ পদার্থের ভর পৃথিবীতে হবে দশ কোটি টন। নিউট্রন তারায় মহাকর্ষকে ঠেকিয়ে রাখে অপজাত নিউট্রনের চাপ। ১৯৬৭ সালে একটি নিউট্রন তারা আবিষ্কৃত হয় যা দ্রুত ঘূর্ণায়মান এবং বেতার সংকেত প্রেরণ করে। এধরনের নিউট্রন তারাকে বলে পালসার। কাঁকড়া নীহারিকায় একটি পালসার আছে যা সুপারনোভা বিস্ফোরণের পরে তৈরি হয়েছে। এটি তত্ত্বের এক চমৎকার প্রমাণ। নিউট্রন তারার শক্তিশালী চৌম্বক অক্ষ আছে যা আহিত কণাকে প্রবল বেগে ত্বরিত করে। এভাবে বিকিরণ পাওয়া যায়। এখন ঘূর্ণন অক্ষ ও চৌম্বক অক্ষের মাঝে কৌণিক ব্যবধানের কারণে চৌম্বক অক্ষ ঘুরে ঘুরে বিকিরণ করে এবং আমাদের কাছে লাইট-হাউজের মতো বিকিরণ নির্দিষ্ট পর্যায় অন্তর এসে পৌঁছে। তবে এধরনের ব্যাখ্যার অনেক অসুবিধা আছে।

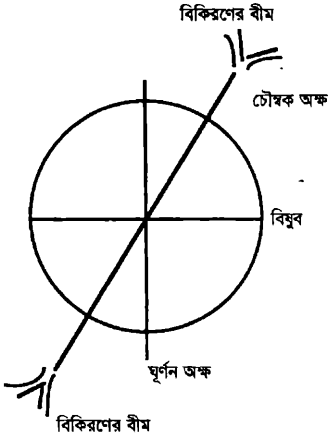

নিউট্রন তারা

পালসারের মেরু ও বিষুবীয় অঞ্চলের মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকে প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন মিলিয়ন ভোল্ট। পালসার অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে পর্যায় পুনরাবৃত্তি করে। ফলে মহাজাগতিক ঘড়ি হিসেবে এদের ব্যবহার করা যায়। যদি কোনো জোড়াতারা ব্যবস্থায় নিউট্রন তারা থাকে তবে অন্য তারা থেকে পদার্থ নিউট্রন তারায় গিয়ে পড়ে। ফলে এক্স-রে পাওয়া যায়। এভাবে নিউট্রন তারা সনাক্ত করা যেতে পারে।

কৃষ্ণবিবর ঃ তাত্ত্বিক ভাবে কোনো তারার ভর ৩ সূর্যভরের বেশি হলে জ্ঞাত কোনো বলই আর পরম মহাকর্ষকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ফলে তারাটি চুপসে একটি বিন্দুতে পরিণত হবে। এখানে মহাকর্ষ এতো শক্তিশালী যে আলোও এর থেকে বেরুতে পারে না। ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণবিবরকে কের-কৃষ্ণবিবর এবং অঘূর্ণায়মান হলে তার নাম শোয়ার্তশিল্ড কৃষ্ণবিবর। কৃষ্ণবিবরের ব্যাসার্ধ হলো $2GM/c^2$। একে শোয়ার্তশিল্ড ব্যাসার্ধ বলে। শোয়ার্তশিল্ড ব্যাসার্ধ ব্ল্যাক হোলের একটি পৃষ্ঠ নির্দিষ্ট করে দেয় যার নাম ঘটনা দিগন্ত (event horizon)। এর ভেতর থেকে কোনো কিছুই বাইরে বেরুতে পারে না। নরকের মতো এটি একটি একমুখী দরজা। গাণিতিকভাবে কৃষ্ণবিবরকে ব্যাখ্যা করতে ৩টি রাশি দরকার : ভর, ঘূর্ণন ও আধান। সর্বনিম্ন $১০^{-৮}$ কিলোগ্রাম ভরের পদার্থকে কৃষ্ণবিবরে পরিণত করা যায়। মনে করা হয় কৃষ্ণবিবরের কেন্দ্রে থাকে একটি গাণিতিক ব্যতিক্রমী বিন্দু (singularity)। এ বিন্দুতে ভর, ঘনত্ব, স্থান-কালের বক্রতা সব অসীম এবং সমস্ত ভৌত বিধি এই বিন্দুতে ভেঙে পড়ে। এই বিন্দুর তাই আছে অসীম ক্ষমতা! স্টিফেন হকিং দেখিয়েছেন কিছু গাণিতিক ও ভৌত কারণে কৃষ্ণবিবর বিকিরণ করবে। কৃষ্ণবিবর যতো বড়ো হবে বিকিরণ ততো কম হবে। এই বিকিরণ থেকে কৃষ্ণবিবরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। Cygnus X-1 নামের একটি তারা সম্ভাব্য কৃষ্ণবিবর। এছাড়া ৫ কোটি আঃবর্ষ দূরে একটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি

ব্ল্যাকহোল আছে বলে মনে হয়। কারণ দেখা গেছে চারপাশ থেকে পদার্থ এরমধ্যে ঘুরে ঘুরে পড়ছে (কৃষ্ণবিবরের ভর সূর্যের মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ এবং ব্যাস তদনুযায়ী বড় হতে পারে)। কৃষ্ণবিবরের অস্তিত্ব আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তারা যদি জোড়াতারা গঠন করে তবে সেক্ষেত্রে বিবর্তন হবে একটু অন্যপথে। যাইহোক দেখা যাচ্ছে প্রকৃতির সর্বত্রই নিয়মের ঝংকার। তারার জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকতার যে অদ্ভুত লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করি তাতে আমাদের বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। প্রাচীন নাভাজো রেড ইন্ডিয়ানদের মতো বলতে হয় ঃ *"With harmony may I walk, / With Harmony behind me, may I walk, / With Harmony above me, may I walk, / With Harmony below me, may I walk, / With Harmony all around me, May I walk, .../ It is finished in Harmony,/ It is finished in Harmony."*

একটি তুলনামূলক চিত্র: সবচেয়ে ছোট তারা সবচেয়ে বড় তারার চেয়ে দশ কোটি ভাগ ছোট। তারার ভর ১ সৌরভর হলে বিভিন্ন তারার ব্যাস হবে : লালদানব -১৪ কোটি কি. মি. ; সূর্য -১৪ লক্ষ কি. মি. ; সাদাবামন -১৩ হাজার কি. মি. ; নিউট্রন তারা -১৬ কি. মি. ; কৃষ্ণবিবর -২.৫ কি. মি।

তারার জন্মকথা

প্রাচীন মানুষেরা ভাবত দেবতারা তারা তৈরি করেছে রাতের আকাশ আলোকিত রাখতে। অনেক সভ্যতা আবার তারার উপরই দেবত্ব আরোপ করেছে এবং নিজেদের ভালোমন্দের পরম নির্ধারক হিসেবে কল্পনা করে নিয়েছে। তাই দেবতার সৃষ্টিকাজে আর তারা নাক গলাবার সাহস পায়নি। তারার জন্মরহস্য সম্পর্কে মানুষের ভাবনা-চিন্তা শুরু হয় খুবই সাম্প্রতিক কালে। এখন পর্যন্ত অনেক ঘটনাই অজানা রয়ে গেছে। তবু মোটামুটি একটি ছবি দাঁড় করানো যায় কীভাবে একটি তারার জন্ম হতে পারে।

তারার জন্ম হয় আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের মহাকর্ষীয় পতনের মাধ্যমে। তারার জন্ম সম্পর্কে একমাত্র এ কথাটিই বোধহয় পরম নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়। কোন ঘটনা এই প্রক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য দায়ী তা সুস্পষ্ট নয়। এ সম্পর্কে অবশ্য বেশ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তত্ত্ব আছে। গভীরে যাবার আগে আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘ সম্পর্কে জানা দরকার।

আমরা বলেছি, মহাবিশ্বে কল্পনাতীত দূরত্বে তারা বা তারামণ্ডলী অবস্থিত। এই বিশাল শূন্যস্থানে থাকে কিছু হাইড্রোজেন পরমাণু অথবা ধূলিকণা। পর্যাপ্ত দীর্ঘকাল পর দেখা যায় এই স্থানে বেশ কিছু পদার্থ জমা হয়েছে। বাতাসে ধূলিকণা আশ্রয় করে যেমন মেঘমালা তৈরি হয় তেমনি এসব ক্ষুদ্র কণা আশ্রয় করে জমতে থাকে গ্যাস ও ধূলিকণা। এভাবে গড়ে ওঠে আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসের সুবিপুল মেঘ। এটি তৈরি হতে কয়েক মিলিয়ন বছর লেগে যেতে পারে এবং চওড়ায় এটি কয়েক আলোকবর্ষ হতে পারে। আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘে হাইড্রোজেন বেশি থাকে এবং তা আণবিক, পারমাণবিক বা আয়নিত আকারে থাকতে পারে। তবে আন্তঃনাক্ষত্রিক আণবিক মেঘ থেকেই বেশিরভাগ তারা জন্ম নেয়। কারণ এদের ঘনত্ব থাকে বেশি এবং তাপমাত্রা থাকে ১০ কেলভিন। এরকম একটি মেঘ যখন আকারে আকৃতিতে ঘনত্বে বেশ বড় হয় তখনই শুরু হয় তারা তৈরির প্রক্রিয়া। এরকম একটি মেঘ (যতো বড়ই হোক না কেন) যদি মহাকর্ষের বাঁধনে বাঁধা থাকে তাহলে তা ঘনীভূত হয়ে আরো ঘন ও ছোট বস্তু (এক্ষেত্রে নক্ষত্র) তৈরি করবেই। এ ধ্রুব সত্য। ঘনীভবন শুরু হলে কেন্দ্রের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব বাড়তে থাকে। এই তাপমাত্রা বাইরে বেরিয়ে যায় যা অবলোহিত বিকিরণ রূপে ধরা পড়ে। এক সময় কেন্দ্রীয় অঞ্চল অনচ্ছ হয়ে ওঠে এবং তাপমাত্রা আর বেরুতে পারে না। কারণ বিকিরণ চাপ ও মহাকর্ষ চাপ প্রায় সমান হয়ে যায় এবং কেন্দ্রের সংকোচনও তখন থেমে যায়। এ পর্যায়ে তৈরি হয় প্রোটোস্টার বা ভ্রূণতারা। কমপক্ষে এধরনের ভ্রূণতারার ভর হবে বৃহস্পতি গ্রহের মতো। এর তাপমাত্রা থাকে প্রায় ১,০০০ কে.। অবশ্য চারদিক থেকে পদার্থ নিয়মিত কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পড়তেই থাকে। তবে এই পতনের পরিমাণ কমে যায়। এটি বন্ধ হয় কীভাবে তা সুনিশ্চিত নয় তবে দেখা গেছে ভ্রূণতারাদের খুব শক্তিশালী নক্ষত্রবায়ু থাকে যা বাইরের অপ্রয়োজনীয় পদার্থকে ঝেটিয়ে বিদায় করে। এই নক্ষত্রবায়ু কী করে আসে তাও জানা যায় না। এসময়ে ভ্রূণতারা দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করে এবং এ পর্যায়ে আসতে সময় নেয় লাখ দশেক বছর। ভ্রূণতারার কেন্দ্রে তাপমাত্রা যখন ১

কোটি কেলভিনে পৌঁছে তখন জ্বলে ওঠে হাইড্রোজেন। জ্বলে ওঠে নক্ষত্র। এটি তখন স্থান পায় এইচ-আর-চিত্রের প্রধানধারায়। অন্ধকার গ্যাসমেঘ থেকে নক্ষত্র হিসেবে জ্বলে উঠতে কয়েক কোটি বছর সময় লাগতে পারে। সদ্যজন্মপ্রাপ্ত নক্ষত্রের আশপাশের গ্যাস থেকে কী শর্তে গ্রহ তৈরি হয় এবং কী শর্তে হয় না সেটা বলা এখনই সম্ভব হচ্ছে না। তাত্ত্বিক ও পর্যবেক্ষণ কোনো সাক্ষ্যই এ ব্যাপারে বর্তমানে মেলেনি।

একটি গ্যাসমেঘ কেন ঘনীভবনের শিকার হয় সে সম্পর্কে ইংরেজ জ্যোতির্বিদ স্যার জেমস্ জীন্স্ একটি তত্ত্ব দিয়েছেন। এক সেট ভৌত শর্তাবলীর অধীনে একটি গ্যাসমেঘ থেকে তারার জন্ম হতে পারে। বলা হয়েছে, বড় গ্যাসমেঘ ঘনীভবনের ফলে কয়েকটি খণ্ডে ভাগ হয় এবং প্রত্যেক খণ্ড ঘনীভূত হয়ে তারা তৈরি করে। এভাবে নক্ষত্রস্তবকের সৃষ্টির ব্যাখ্যা মেলে। একটি মেঘখণ্ড তখনই খণ্ডিত হবে যখন এর দৈর্ঘ্য একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড় হবে। একে জীন্সের দৈর্ঘ্য বলে এবং এর মান = (শব্দের বেগ) ÷ (মহাকর্ষীয় ধ্রুবক × মাধ্যমের ঘনত্ব) $^{১}/_{২}$ । দেখা যাচ্ছে জীন্সের দৈর্ঘ্য গ্যাসমেঘের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। ফলে একেক মেঘখণ্ডের জন্য এটি বিভিন্ন মান নিতে পারে। যদি মাধ্যমের ঘনত্ব ৩ × ১০$^{-২২}$ গ্রাম / সি. সি. হয় তবে জীন্সের দৈর্ঘ্য হবে ২ × ১০^{২০} সে.মি. (শব্দের বেগ ঐ মাধ্যমে ৬ কি. মি. / সে.)। একটি খুব বড়ো মেঘখণ্ডের ঘনত্ব বেড়ে গেলে এর সংকট দৈর্ঘ্যের মান কমে যায়, ফলে এটি খণ্ডিত হয়। প্রত্যেক খণ্ড আবার বিশেষ শর্তে পরবর্তী খণ্ডীকরণের শিকার হবে যদি সেটি তার জন্য সংকট দৈর্ঘ্যের বেশি হয়। মেঘখণ্ড যতো ছোট হয় তাপমাত্রা ততো বাড়ে। তারা তৈরির জন্য ন্যূনতম ১০ কেলভিন দরকার। এর নিচে পরমাণু আয়নিত হয় না।

একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষণীয়, আমাদের সূর্য কোনো তারাস্তবকের সদস্য নয়। হয়ত সূর্য যে মেঘখণ্ড থেকে জন্ম নিয়েছে তার কাছাকাছি ঘটেছিল কোনো তারা বিস্ফোরণ (সুপারনোভা)। এর ধাক্কায় শুরু হয় মেঘখণ্ডের ঘনীভবন। সৃষ্টি হয় সূর্যের। এর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অন্ধকার, ধূলিময়, নক্ষত্রের সূতিকাগার এসব আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘখণ্ডের প্রচুর উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। তারামণ্ডলের চিত্রে ছোপ ছোপ কালো দাগ ঐসব জায়গা নির্দেশ করে। "অনন্ত সুন্দর" কালপুরুষ নীহারিকা এমনি একটি অঞ্চল। এর রেডিও বিকিরণে কার্বন মনোক্সাইড ও ফরমালডিহাইড পাওয়া যায়। প্রায় সৌরজগতের সমান আয়তনে পানিবাষ্প ও হাইড্রক্সিল মূলকও আছে।

অন্ধকার মেঘখণ্ড থেকে জন্ম নেয় আকাশদীপ। আলো নেই, তাপ নেই, অথচ সেখানেই জন্ম নিচ্ছে আলো আর তাপের উৎস— বিশালকায় তারা। প্রকৃতির এই হেঁয়ালী মনোমুগ্ধকর বটে।

নক্ষত্র ও আমরা

যদি বলা হয় মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য নক্ষত্রের কাছে ঋণী তবে সন্দেহের সুযোগ আছে বৈকি। আরো যদি বলা হয় যে আমরা যে সব বস্তুসামগ্রী দেখি—লোহা, তামা, সোনা, রূপা এসবই একসময়ে তারার তন্দুরে তৈরি হয়েছে তাহলেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে বৈকি। কিন্তু এ সবই সত্যি। পৃথিবীতে আমরা যেসব বিচিত্র মৌলের সমাহার দেখি তার জন্য আমরা সত্যিই মিটমিটি তারাদের কাছে অসীম ঋণে দায়বদ্ধ।

আমরা জানি বিশ্বের জন্ম ১২ বিলিয়ন বছর আগে। সে সময়ে বিশ্বে ছিল মাত্র কয়েক ধরনের কণা আর বিকিরণ। বিশ্বের প্রথম পরমাণু হাইড্রোজেন এবং তা তৈরি হতে লেগেছে ৭ মিলিয়ন বছর। হাইড্রোজেনের সাথে কিছু হিলিয়ামও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু যে সমস্ত ভারি মৌল দেখা যায় তাদের উৎপত্তি হলো কীভাবে? সোজা কথায়, তারার তন্দুরে। নিম্নভরের তারা তার জীবনের শেষ পর্যায়ে অধিকাংশ পদার্থ একটি বিস্ফোরণে পরিত্যাগ করে সাদা বামনতারায় পরিণত হয়। অন্যদিকে ভারি তারা তার অন্তিম দশায় সুপারনোভা বিস্ফোরণের শিকার হয়ে তৈরি করে পালসার কিংবা ব্ল্যাক হোল। তারা যখন বিস্ফোরিত হয়, বিশেষ করে সুপারনোভা বিস্ফোরণে, বিস্ফোরণের ধাক্কায় তৈরি হয় অনেক ভারি মৌল। আর ভারি তারাদের কেন্দ্রে যখন লোহা তৈরি হয় তখনই হয় বিস্ফোরণ। ব্যাপারটি ধারাবাহিক ঃ হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়াম, হিলিয়াম পুড়ে কার্বন, তারপর নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সিলিকন এবং এভাবে সবশেষে লোহা। লোহা তৈরি হলে নতুন কোনো বিক্রিয়া হয় না। ফলে তারা বিস্ফারিত হয়। অবশ্য কোন তারা কখন বিস্ফারিত হবে তা নির্ভর করে ভরের ওপর। যাইহোক তারার কেন্দ্রে উৎপন্ন বা বিস্ফোরণের ধাক্কায় তৈরি ভারি মৌল ছড়িয়ে পড়ে আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসে। সেই গ্যাস মহাকর্ষীয় ঘনীভবনের মাধ্যমে তৈরি করে নতুন তারা। সেটি যখন বিস্ফারিত হয় তখন আরো ভারি মৌল তৈরি হতে পারে। এভাবে ভারি মৌল সংশ্লেষিত হয় একমাত্র নক্ষত্র গর্ভে বা নক্ষত্রের বিস্ফোরণে।

আমাদের দাঁতে আছে ক্যালসিয়াম, রক্তে আছে লোহা, যে কালিতে লিখছি তাতে আছে কার্বন, আমাদের কোষের ডি. এন. এ'তে আছে নাইট্রোজেন। আর এসবই তৈরি হয় তারকার গর্ভে।

আমাদের সূর্যও সম্ভবত দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের তারা। তা না হলে ভারি মৌলের এতো সমাহার দেখা যেতো না। অর্থাৎ একটি আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস থেকে জন্ম হয়েছে কোনো নক্ষত্রের, সেটি বিস্ফারিত হয়েছে, সেই গ্যাস থেকে তৈরি হয়েছে আরেকটি নক্ষত্রের, সেটিও একসময় বিস্ফারিত হয়েছে। এর ফলে যে গ্যাস তৈরি হয়েছে তা দিয়েই হয়ত সূর্য তৈরি। এবং এর প্রত্যেক ধাপেই ভারি পদার্থ তৈরি হয়েছে এবং তা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

তাছাড়া পৃথিবীস্থ বিভিন্ন প্রাণীজ ক্রিয়াও সূর্যের ওপর নির্ভরশীল। সূর্যের শক্তি থেকে উদ্ভিদ খাবার তৈরি করছে, প্রাণী সে খাদ্য গ্রহণ করছে। এভাবে খাদ্যচক্রের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতি যেভাবে নতুন বিবর্তিত প্রাণী তৈরি করে সেই মিউটেশন সম্ভব হয় নভোরশ্মির জন্য। নভোরশ্মি তৈরি হয় সুপারনোভা বিস্ফোরণে।

সাধারণত নক্ষত্রে যেসব মৌল পাওয়া যায় সেগুলো হলো ঃ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ম্যাগনেসিয়াম, নিয়ন, সিলিকন, ক্যালসিয়াম, লৌহ, সালফার, পটাসিয়াম, ফ্লোরিন, ক্লোরিন, নিকেল ইত্যাদি। মৌল যতো ভারি হবে তার প্রাচুর্য ততো কম হবে, কারণ সেটা তৈরি করতে প্রকৃতির ততো বেশি সময় লাগে।

এই যে আমরা বাস-ট্রাক-লরী-গাড়ি চড়ছি—এসবই লোহা দিয়ে তৈরি। লোহা তৈরি হয় ভারি তারার বিবর্তনে। সভ্যতার উৎকর্ষের জন্য এই যে কতো শত উপাদান সবই তারায় তৈরি হয়। বিশ্বে নক্ষত্র ব্যতীত জানা আর কোনো তন্দুর নেই যা ভারি পদার্থ তৈরি করতে পারে। আর সেজন্যেই নক্ষত্র শুধু আমাদের রাতের সাথী নয় আমাদের পরম ঠিকানাও বটে। প্রতি ধমনীতে যেন তারই ঐকতান শুনতে পাই ঃ

আকাশ ভরা, সূর্য-তারা
বিশ্ব ভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।

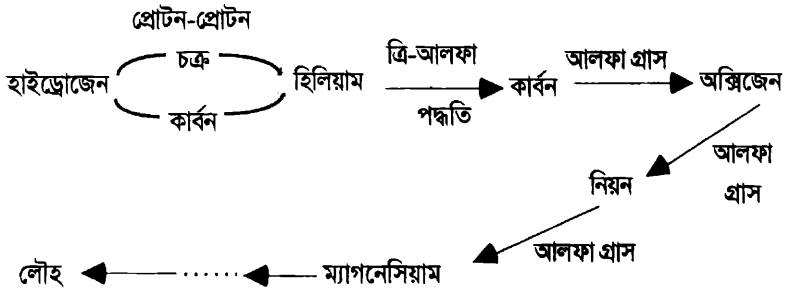

তারার কেন্দ্রে ভারী পদার্থ তৈরি

"ওই যে সুদূর নীহারিকা"

"ওই যে সুদূর নীহারিকা"

রাতের আকাশের দিকে চাইলে চোখে পড়ে অনন্ত নক্ষত্রবীথির এক মনোমুগ্ধকর সমারোহ। এইসব নক্ষত্রের আছে নিজস্ব ছন্দোবদ্ধ বিধিবিধান, আছে সুনির্ধারিত জীবন ধারা। আগের রচনাগুলোতে দূরের মিটিমিটি তারার অভ্যন্তরে ঘটে চলা নানান ভৌত ঘটনাবলীর কিছুটা আভাস পেয়েছি। আমরা দেখেছি কীভাবে গ্যাসের বিশাল মেঘখণ্ড থেকে মহাকর্ষ বলের দরুন ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্রের জন্ম হয়, তারপর কোটি কোটি বছর ধরে চলে নক্ষত্র জ্বালানির দহন। একসময়ে নক্ষত্রের জীবনে অন্তিম নিয়তি ঘনিয়ে আসে, সে পরিণত হয় কোনো কৃষ্ণবিবরে অথবা নিউট্রন তারায় অথবা গ্রহ নীহারিকায়। এবার আমরা প্রবেশ করব অনন্ত নক্ষত্রবীথি ছাড়িয়ে অনন্ত গ্যালাক্সিরাজিতে। আমরা যে ছায়াপথে বাস করি তার নাম আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সি বা মিল্কিওয়ে। এ ছায়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা আনুমানিক দশ হাজার কোটি ($১০^{১১}$)। এই বিপুল নক্ষত্ররাজির মাঝে আমাদের সূর্যের অবস্থান নিতান্তই মামুলি ধরনের। বিজ্ঞানীদের মতে সারা-বিশ্বে এরকম গ্যালাক্সির সংখ্যাই বোধহয় দশ হাজার কোটি! এ থেকে মহাবিশ্ব যে কী পরিমাণ বিশাল তা ভাবা যেতে পারে।

ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি হচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্র ও গ্যাসীয় নীহারিকার (নেবুলা) এক বিপুল সমারোহ। গ্যালাক্সি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ গ্যালাক্সিয়াস কাইক্লস বা 'দুধেল বৃত্ত' থেকে। যেকোনো অন্ধকার রাতে, মেঘমুক্ত আকাশের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দিকে একটি মৃদু আলোকীয় পথ চলে গিয়েছে। টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে একে তারায় বিশ্লিষ্ট করা যায়। এটাই আমাদের গ্যালাক্সি। এখানেই আমাদের বাস।

গ্যালিলিও তার টেলিস্কোপ দিয়ে প্রথম আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। তারপর অনেকেই এ সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধান করেছেন। আমাদের গ্যালাক্সি সম্পর্কে সর্বপ্রথম আংশিক সঠিক ধারণা করেন হার্শেল। তিনি বলেন আমাদের গ্যালাক্সি দেখতে অনেকটা লেন্সের মতো যার কেন্দ্রভাগে অধিক তারকা জড়ো হয়ে আছে। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ মানুষ সূর্যকে ছায়াপথের কেন্দ্রে অবস্থিত বলে মনে করতো। সূর্যকে ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করেন ১৯১৭ সালে হার্লো শেপলী। তিনি গবেষণা করে দেখতে পান সূর্য ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত। এ দূরত্বের আধুনিক মান হলো ৮.৫ কিলোপারসেক (১ পারসেক = ৩.২৬ আলোকবর্ষ)।

একই সাথে মানুষ এও মনে করত আমাদের ছায়াপথের বাইরে আর কোনো নক্ষত্রপুঞ্জ থাকতে পারে না। কিন্তু ১৯২০ এর দশকের শুরুর দিকে এমন কিছু আবছা, নীহারিকা-সদৃশ বস্তু আবিষ্কৃত হলো যাদের অনেকের আকৃতি প্যাঁচানো স্প্রিঙের মতো। এদের তখন কুণ্ডলিত নীহারিকা (স্পাইরাল নেবুলা) বলা হতো। ধারণা করা হতো এরা আমাদের ছায়াপথেরই অন্তর্ভুক্ত কিছু নীহারিকা। এদিকে শেপলীর বিস্তারিত গবেষণায় প্রমাণিত হলো যে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের আকৃতি আগে যেমন ভাবা হয়েছিল তার চাইতে অনেক বড়ো (প্রায় ১ লক্ষ আলোকবর্ষ চওড়া)। স্বাভাবিকভাবেই তিনি যুক্তি

দেখালেন যে যেহেতু আকাশগঙ্গা ছায়াপথের আকৃতি যথেষ্ট বড়ো, তাই দূরবর্তী কুণ্ডলিত নীহারিকাগুলিও এ ছায়াপথেরই অন্তর্ভুক্ত। এই মতেরই পাশাপাশি আরেকটি ক্ষীণ মতবাদ প্রচলিত ছিল। এই মতানুযায়ী, আমাদের ছায়াপথের আকৃতি যেমন ভাবা হচ্ছে ততোটা বড়ো নয় এবং কুণ্ডলিত নীহারিকাগুলি প্রকৃতপক্ষে দূরে অবস্থিত পৃথক তারকার সমাহার বা দ্বীপবিশ্ব। আমরা এখন জানি যে এ দুটি মতই আংশিক সত্য। ছায়াপথের আকৃতি সত্যিই অনেক বড়ো এবং কুণ্ডলিত নীহারিকাগুলি দূরবর্তী গ্যালাক্সিবিশেষ। এদেরকে এখন আর নীহারিকা বলা হয় না, বলা হয় গ্যালাক্সি।

আমাদের গ্যালাক্সি বহির্ভূত এসব দূরবর্তী গ্যালাক্সিকে বলা হয় বহিস্থ গ্যালাক্সি। আমাদের ছায়াপথের সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সিটি হচ্ছে অ্যান্ড্রোমিডা। এর দূরত্ব প্রায় বিশ লক্ষ আলোকবর্ষ। মহাবিশ্বে এরকম প্রচুর গ্যালাক্সি আছে। মজার বিষয় এই যে এসব গ্যালাক্সিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো স্তবকের অন্তর্ভুক্ত থাকতে দেখা যায়। এদের বলা হয় গ্যালাক্টিক ক্লাস্টার। আমাদের গ্যালাক্সি যে স্তবকের অন্তর্ভুক্ত তার নাম স্থানীয় গ্যালাক্সিগুচ্ছ। এর অন্যতম প্রধান সদস্য অ্যান্ড্রোমিডা। এছাড়াও আরো প্রায় ৩০টি ছোটো, বামনাকৃতির গ্যালাক্সি দেখা যায়। স্থানীয় গ্যালাক্সিগুচ্ছ আবার আরেকটি বড়ো স্তবকের অন্তর্ভুক্ত যার নাম কন্যা স্তবক বা ভার্গো ক্লাস্টার। একেকটি গ্যালাক্সিস্তবকে কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার গ্যালাক্সি থাকতে পারে। এরকম প্রচুর গ্যালাক্সিস্তবকের সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্যদিকে ৫/৬টি গ্যালাক্সিস্তবক মিলে গ্যালাক্সির মহাস্তবক বা সুপারক্লাস্টার গঠন করেছে। এ এক বিশাল ব্যাপার।

সৃষ্টিজগতের এসব অপার রহস্য মানুষ ইদানিং জানতে শুরু করেছে। কে জানত যে গ্যালাক্সিসমূহের থাকতে পারে এক পরম্পরা। জ্যোতির্বিদগণ বিশাল সব বেতার দুরবিন বা রেডিও টেলিস্কোপ নিয়ে কান পেতে রয়েছেন মহাবিশ্বের দিকে। তারই সাহায্যে গ্যালাক্সি-সঙ্গীতের ছিটেফোঁটা সুর ভেসে আসছে আমাদের কানে। তাই আমরাও গাইঃ

ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড় আকাশে নীড়
ওই যারা দিনরাত্রি আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারেরও যাত্রী
গ্রহ-তারা-রবি....

আকাশগঙ্গা ছায়াপথ

অনন্ত গ্যালাক্সিরাজির মনোমুগ্ধকর জগতে প্রবেশের আগে নিজেরা যে ছায়াপথে বাস করি সেই আকাশগঙ্গা ছায়াপথের সাথে আমাদের পরিচিতি সেরে ফেলা যাক।

আমরা আগেই বলেছি, অন্ধকার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত মৃদু আলোকীয় পথকেই আমরা গ্যালাক্সি বলে থাকি। দীর্ঘকাল থেকেই এই গ্যালাক্সি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নানান দার্শনিক ছায়াপথের উৎপত্তি নিয়ে বহু তর্কবির্তক করেছেন। অসংখ্য মিথ রচিত হয়েছে এই গ্যালাক্সিকে ঘিরে। এমনি কোনো এক গ্রীক মিথ অনুযায়ী একে 'মিল্কি ওয়ে' বলা হয়ে থাকে। বাংলায়ও এর আছে কয়েকটি অতিসুন্দর নাম—আকাশগঙ্গা, সুরগঙ্গা, স্বর্গগঙ্গা ইত্যাদি। কিন্তু টেলিস্কোপ দিয়ে এই গ্যালাক্সিকে খুব সম্ভব গ্যালিলিওই প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর অনেকেই এ কাজ করেছেন। কিন্তু ছায়াপথের প্রকৃত স্বরূপ কেউই নির্ণয় করতে পারেনি।

হার্লো শেপলী ১৯১৭ সালে গবেষণা করে দেখালেন যে আমাদের সূর্য ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০,০০০ আঃবর্ষ দূরে অবস্থিত এবং ছায়াপথের বেড় প্রায় ১ লক্ষ আঃবর্ষ। আসলে ১৯২০ এর দশক থেকেই শুরু হয় বিস্তারিত জরিপ কার্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ। এর ফলে জানা যায় যে আমাদের গ্যালাক্সি মামুলি কোনো ব্যাপার নয়, বরঞ্চ সুবিশাল তারকার সংগ্রহ। প্রথমদিকে ছায়াপথের বিশালত্ব নিয়েও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। প্রাচীনপন্থীদের মতে গ্যালাক্সি অতোটা বড়ো নয় যতোটা বলা হচ্ছিল তখন।

আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্র ধনুরাশির (ধনু রাশিচক্রের অন্তর্ভুক্ত একটি তারামণ্ডলী) দিকে অবস্থিত এবং সেখানে তারকার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। সূর্য থেকে এই কেন্দ্রের দূরত্ব ৮.৫ কিলোপারসেক। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের গ্যালাক্সি আসলে একটি কুণ্ডলিত গ্যালাক্সি (স্পাইরাল গ্যালাক্সি)। উপর থেকে দেখলে একে অনেকটা ঘড়ির স্প্রিঙের মতো প্যাঁচানো মনে হবে (অবশ্য স্প্রিঙঘড়ির চল আজকাল খুবই কম, তাই বুঝতে হয়ত কিছুটা অসুবিধা হতে পারে)। পাশ থেকে দেখলে মনে হবে মাঝখানটা মোটা এবং দু'পাশ সরু হয়ে পরস্পরের সাথে মিশে গিয়েছে—অনেকটা উত্তল লেন্সের মতো। দুঃখের বিষয় , যেহেতু সূর্য ছায়াপথের সাথে একই তলে (অর্থাৎ পাশ বরাবর) অবস্থিত সেহেতু এর প্যাঁচানো বা কুণ্ডলিত বাহু দেখা খুবই মুশকিল এবং গ্যালাক্সির তল বরাবর অত্যন্ত পুরু ধূলির স্তর আছে যার ফলে ছায়াপথের কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করা খুব দুরূহ।

ছায়াপথের ভর প্রায় ২০০০০ কোটি (২×১০^{১১}) সূর্যের সমান। এর প্রায় ৯৭% নক্ষত্র সমৃদ্ধ, বাকি ৩% আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস। ছায়াপথের মূল উপাদান ৮৭% হাইড্রোজেন, ১০% হিলিয়াম এবং আরো কিছু ভারি মৌল।

গ্যালাক্সির কাঠামোকে স্থূলভাবে ৩ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ নিউক্লিয়াস এবং একে ঘিরে থাকা স্ফীত অংশ, কুণ্ডলিত বাহু এবং ছায়াপথ তল বরাবর ডিস্ক বা চাকতি। আগেই বলেছি, পুরু ধূলিকণার জন্য ছায়াপথের কেন্দ্রটিকে দৃশ্যমান আলোয় দেখা যায় না। কিন্তু রেডিও এবং অবলোহিত তরঙ্গে পর্যবেক্ষণ করলে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। এভাবে পর্যবেক্ষণ করে

যেসমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় ছায়াপথের কেন্দ্রে রয়েছে ৪ মিলিয়ন সূর্যভরের একটি ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণবিবর যার চারদিকে ঘূর্ণায়মান পদার্থের একটি বিশাল সমাহার আছে। এই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রয়েছে গোলকাকার স্ফীত অংশ। এই অংশে প্রচুর লালচে তারা দেখতে পাওয়া যায়। এরা ছায়াপথের সবচাইতে বয়োবৃদ্ধ তারা এবং এদেরকে দ্বিতীয় তারাসমষ্টির তারা (পপুলেশন টু) বলে। এখানে অসংখ্য গুচ্ছস্তবকও দেখা যায়। মনে হয় ছায়াপথের এ অংশটুকু প্রথমে তৈরি হয়েছিল। ছায়াপথের তল বরাবর অবস্থিত গ্যালাক্সি ডিস্ক বা চাকতি। একে একটি এল. পি. বা লঙ-প্লে'র মতো কল্পনা করা যেতে পারে যার কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি একটি টেনিস বলের মতো স্ফীত। এই ডিস্কে আয়নিত হাইড্রোজেনের মেঘ দেখা যায়। একে এইচ-টু অঞ্চল বলে। ছায়াপথের চাকতি অঞ্চলের তারাদেরকে প্রথম তারাসমষ্টির তারা বলে এবং এরা নবীন বয়সের নীলচে তারা। আকাশগঙ্গা ছায়াপথের রয়েছে ৪টি অথবা ৫টি কুণ্ডলিত বাহু। আণবিক মেঘে অবস্থিত প্রশম হাইড্রোজেনের রেডিও বিকিরণ থেকে এই সব কুণ্ডলিত বাহুর সন্ধান মেলে। এ অঞ্চলে নতুন তারা তৈরির প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। কুণ্ডলিত বাহু নিয়ে বহু গবেষণা হচ্ছে, বিশেষ করে এর উদ্ভব নিয়ে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই কুণ্ডলিত বাহুর সৃষ্টি হয়েছে ঘনত্বের কুণ্ডলিত বন্টন থেকে। একে বলে ঘনত্ব তরঙ্গ তত্ত্ব। আরেকটি মতে ছায়াপথের বিভিন্ন অংশের বেগ যেহেতু বিভিন্ন, তাই এভাবেও কুণ্ডলিত কাঠামো তৈরি হতে পারে। এ ব্যাপারটি বেশ জটিল, তাই বর্তমান প্রবন্ধের আওতার বাইরে।

যদিও ছায়াপথের অধিকাংশ তারাই (সূর্যের মতো) হয় নিঃসঙ্গ নয়তো জোড়াতারা হিসেবে থাকে তথাপি অনেক তারাকেই স্তবকের সদস্য হিসেবে দেখা যায়। এদের সদস্যসংখ্যা কয়েক হাজার হতে পারে। নক্ষত্রদের এরকম ৩ ধরনের স্তবক দেখা যায়। প্রথমত, স্তবকদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও ভারি হলো গুচ্ছস্তবক। ছায়াপথে এদের সংখ্যা প্রায় ১৩০। এরা ছায়াপথের কেন্দ্রেই বেশি ঘনীভূত থাকে। এদের উজ্জ্বলতা অপেক্ষাকৃত বেশি। এদের ব্যাস ১০ থেকে ৩০০ আলোকবর্ষ হতে পারে। এরাই ছায়াপথের সর্বাপেক্ষা প্রবীনতম অংশ। টেলিস্কোপে গুচ্ছস্তবকদের খুব সুন্দর দেখায়। দ্বিতীয়ত, অপেক্ষাকৃত কম ভারি ও ছোট হলো মুক্তস্তবক। এখানে তারাদের মধ্যকার বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। এরা ছায়াপথের তল বরাবর থাকে বলে এদের পর্যবেক্ষণ করা বেশ দুরূহ। এদের সদস্য তারাদের বয়স অপেক্ষাকৃত নবীন। এদের ব্যাস ৩ থেকে ২০ আঃবর্ষ। এদের শিথিলতার কারণে এদের আয়ুষ্কাল কম, কারণ ছায়াপথের কেন্দ্রীয় প্রবল আকর্ষণে এরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তৃতীয়ত, এমন কিছু তারাদল (অ্যাসোসিয়েশন অব স্টারস্) আছে যারা একই স্থানে থাকে এবং মোটামুটি সমসাময়িক। এরাও বেশ শিথিল ধরনের হয়ে থাকে। আবার এমন কিছু তারাপুঞ্জ আছে যারা সুনির্দিষ্ট কোনো স্তবক গঠন না করলেও মহাশূন্যে একই সাধারণ গতি প্রদর্শন করে। যেমন—কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডল।

একই সাথে ছায়াপথে অসংখ্য নীহারিকাও দেখা যায়। নীহারিকা হচ্ছে বিশাল সব গ্যাসের মেঘ যারা পার্শ্ববর্তী তারার আলোয় আলোকিত থাকে। গ্যাসমেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়া নক্ষত্রের অতিবেগুনি বিকিরণে মেঘস্থিত হাইড্রোজেন আয়নিত হয়ে যায়—এরাই এইচ-টু অঞ্চল গঠন করে। এই উত্তপ্ত গ্যাস ও ধূলির ঘন সংগ্রহে নতুন তারা তৈরির প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলছে। এখানকার তাপমাত্রা ১০০০০ কেলভিন। কালপুরুষ মণ্ডলীর নীহারিকাটি একটি বিখ্যাত নীহারিকা।

আমাদের ছায়াপথের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস। এক নক্ষত্র থেকে আরেক নক্ষত্রের বিশাল দূরত্ব সত্ত্বেও এই স্থান কিন্তু একেবারে পরম শূন্য নয়। এখানে থাকতে পারে প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু ও ধূলিকণা। এর ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে মাত্র একটি H_2 অণু। এছাড়াও অন্যান্য ভারি মৌলও সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

আমাদের ছায়াপথের বয়স ১০ থেকে ১২ বিলিয়ন বছর। অন্ধকার আকাশে অগণিত তারার সমাহার আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সিকে খালি চোখে অসীম রহস্যের আধার মনে হলেও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর কোনোকিছুই কার্য-কারণ ছাড়া ঘটে না। বিশাল এই গ্যালাক্সি আমাদের সূর্য ও তার সৌরপরিবার এবং অসংখ্য তারা, নীহারিকা নিয়ে ছুটে চলেছে অসীম মহাশূন্যের পানে। অসীমকে জানার এ মানবীয় চেষ্টাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করেছে।

হরেক রকম গ্যালাক্সি

একশ' বছরও পুরো হয়নি আমরা জানতে পেরেছি যে মহাবিশ্বে আকাগঙ্গা গ্যালাক্সিই একমাত্র নয়। মহাশূন্যে রয়েছে অসংখ্য সব গ্যালাক্সি এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্বও কম নয়। শক্তিশালী টেলিস্কোপে দেখলে বহু দূরের গ্যালাক্সি দেখা যায় এবং তাদের আকৃতিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলোকচিত্রে এদের যে আকৃতি অর্থাৎ দুই মাত্রিক যে আকৃতি ফুঁটে ওঠে তার উপর ভিত্তি করেই গ্যালাক্সিদের আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

ই. পি. হাব্‌লই সর্বপ্রথম গ্যালাক্সিদের একটি সুষ্ঠু শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করেন। এ কাজে তিনি মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের টেলিস্কোপ ব্যবহার করেছিলেন। ১৯২৬ সালে প্রবর্তিত তাঁর এই শ্রেণীবিন্যাসই এখন পর্যন্ত প্রমিত (স্ট্যান্ডার্ড) হয়ে রয়েছে। গ্যালাক্সি সমূহকে আকৃতিগত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়—কুণ্ডলিত (স্পাইরাল), উপবৃত্তাকার (ইলিপ্টিকাল) এবং অনিয়মিত আকৃতির গ্যালাক্সি। হাব্‌লের এই কাজকে আরো সংহত করে অ্যালান স্যান্ডাজ ১৯৬১ সালে 'হাব্‌ল অ্যাটলাস অব গ্যালাক্সিজ' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। যদিও আজকাল এমন কিছু গ্যালাক্সি পাওয়া গেছে যারা মূল বিন্যাসে ঠিক খাপ খায় না। তথাপি এই বিন্যাসটিকেই প্রমিত ধরা হয়।

মহাবিশ্বে দৃশ্যমান অধিকাংশ গ্যালাক্সিই উপবৃত্তাকার। অর্থাৎ আমাদের কাছে এদের অবয়ব একটি উপবৃত্তের মতো মনে হয়। উপবৃত্ত হলো অনেকটা ডিমের মতো দেখতে। উপবৃত্তাকার ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে উজ্জ্বলতা সর্বাধিক। কেন্দ্র থেকে দুই প্রান্তের দিকে যতো সরে যাওয়া যায় উজ্জ্বলতা ততো কমতে থাকে। সূর্যের তুলনায় এ সমস্ত গ্যালাক্সি বেশ কিছুটা লালচে হয়ে থাকে। বয়োবৃদ্ধ লাল দানবতারার আধিক্যের কারণে খুব সম্ভবত এদের লালচে দেখায়। সবচেয়ে বড়ো উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সির ভর সূর্যের $১০^{১৩}$ গুণ হতে পারে। আড়াআড়িভাবে এটি $১০^{৫}$ পারসেক চওড়া হতে পারে। উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিদের মধ্যে আবার বামনাকৃতিদের সংখ্যাই বেশি। এদের রয়েছে চমৎকার ঘূর্ণন প্রতিসাম্য। উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিদের আবার উপবিভাগও রয়েছে। এটি করা হয়েছে এদের আপাত আকৃতির পার্থক্য থেকে। ছায়াপথের আকৃতি বৃত্তাকার, কম উপবৃত্তীয় অথবা বেশি উপবৃত্তাকার হতে পারে। তদনুযায়ী এই উপবিভাগ করা হয়েছে। উপবৃত্তাকার ছায়াপথে সাধারণত আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিকণা এবং O ও B শ্রেণীর তারার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

মাকড়সার মতো কুণ্ডলিত বা প্যাঁচানো বাহুবিশিষ্ট গ্যালাক্সিদের কুণ্ডলিত গ্যালাক্সি বলা হয়। তবে দেখতে এরা মাকড়সার মতো কুৎসিত নয়। অবশ্য এদের সামগ্রিক সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। সাধারণত গ্যালাক্সিতে দুই বা ততোধিক বাহু থাকে যারা কেন্দ্রের চারপাশে প্রতিসমভাবে বিন্যস্ত। এদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি বেশ প্রকট। আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সি একটি কুণ্ডলিত গ্যালাক্সি। কাজেই কুণ্ডলিত ছায়াপথে বাস করতে কেমন লাগে তা আমাদের ভালোভাবেই জানা আছে। কুণ্ডলিত ছায়াপথের তিনটি প্রকট অংশ থাকে—কেন্দ্রীয় স্ফীত অংশ, কুণ্ডলিত বাহু এবং ছায়াপথের ডিস্ক বা চাকতি। বাহু এবং ডিস্কে নীলচে বর্ণের তারাদের আধিক্য দেখা গেলেও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে লালচে তারার সংখ্যাই

বেশি। কুণ্ডলিত গ্যালাক্সি আবার দু'ধরনের দেখা যায়—সাধারণ ও দণ্ডাকৃতির। দণ্ডাকৃতির কুণ্ডলিত গ্যালাক্সির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে এদের কেন্দ্রীয় অঞ্চল দণ্ডচুম্বকের মতো দণ্ডাকৃতির হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কুণ্ডলিত বাহুদুটি দণ্ডের দুই বিপরীত প্রান্ত থেকে নির্গত হয়। কুণ্ডলিত গ্যালাক্সি চিহ্নিত করতে S এবং দণ্ডাকৃতির গ্যালাক্সি বোঝাতে SB লেখা হয়। এরা আবার প্রত্যেকে ৩টি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। এই উপবিভাগ করা হয়েছে কেন্দ্রের গঠন এবং কুণ্ডলিত বাহুর প্যাঁচের প্রকৃতির উপর। এই উপবিভাগত্রয়কে a, b এবং c দিয়ে S বা SB এর পর লেখা হয়। যেমন আকাশগঙ্গার শ্রেণী হলো Sb। আকাশে দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য কুণ্ডলিত গ্যালাক্সি হলো অ্যান্ড্রোমিডা, হুইর্লপুল গ্যালাক্সি ইত্যাদি।

গ্যালাক্সিসমূহের উপরোক্ত দু'টি প্রধান শ্রেণী ছাড়াও আছে অনিয়মিত আকৃতির গ্যালাক্সি যাদের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই। এদের সুসংজ্ঞায়িত কোনো কেন্দ্রীয় অঞ্চল নেই। কোনো রকম প্রতিসাম্যই এদের দেখা যায় না। কুণ্ডলিত গ্যালাক্সির তুলনায় এদের বর্ণ নীলচে। অনেক অনিয়মিত গ্যালাক্সির দণ্ডাকৃতির কেন্দ্রীয় অঞ্চল দেখা যায় (কিন্তু কোনো বাহু দেখা যায় না)। দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে দৃশ্যমান বড়ো ম্যাজেলানীয় মেঘপুঞ্জ একটি অনিয়মিত ক্ষুদ্র উপগ্যালাক্সি (স্যাটেলাইট গ্যালাক্সি)।

হাব্‌লের প্রমিত বিন্যাস ছাড়াও আরো অনেক বিস্তারিত গ্যালাক্সি শ্রেণীবিন্যাস আছে। জেরার্ড ডি ভোকোলোর প্রণীত বিন্যাসটি এ ব্যাপারে বেশ উল্লেখযোগ্য। রেডিও গ্যালাক্সির (যারা শক্তিশালি রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করে) আবিষ্কার হাব্‌ল শ্রেণীবিভাগে নতুন উপবিভাগের সূচনা করেছে। এছাড়া আছে সক্রিয় গ্যালাক্সি কেন্দ্রীন (অ্যাকটিভ গ্যালাকটিক নিউক্লেই) যাদের কেন্দ্রে চলছে তাণ্ডবক্রিয়া। ফলে এদের বিকিরিত শক্তির পরিমাণও অধিক। তাই আজকাল দৃশ্যমান শ্রেণীবিভাগের চাইতে রেডিও ও এক্স-রে-তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শ্রেণীবিভাগের এবং ঐসব তরঙ্গে পর্যবেক্ষণেরও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবেশী কয়েকটি গ্যালাক্সি

মহাবিশ্বে দেখা গেছে যে, গ্যালাক্সিসমূহ সর্বদাই কোনো না কোনো স্তবকের অন্তর্ভুক্ত থাকে। দলবেঁধে চলাই এদের রীতি। অনেকটা আড্ডাবাজ বাঙালিদের মতো। দলছুট গ্যালাক্সি বড়ো একটা দেখা যায় না। একইভাবে আমাদের গ্যালাক্সিও ব্যতিক্রম নয়। এরও একটি নিজস্ব দল আছে। একে স্থানীয় গ্যালাক্সিগুচ্ছ (লোকাল গ্রুপ অব গ্যালাক্সিজ) বলে। এই গুচ্ছের প্রধান দুটো সদস্য হলো আমাদের গ্যালাক্সি ও অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি। এছাড়া আরো প্রায় ৩৫টি বামনাকৃতির গ্যালাক্সি আছে। অবশ্য এদের অনেকেই সন্দেহজনক সদস্য। স্থানীয় গ্যালাক্সিগুচ্ছের বিস্তৃতি প্রায় ১ মিলিয়ন পারসেক।

আকাশগঙ্গা ছায়াপথের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্যালাক্সি হলো অ্যান্ড্রোমিডা। এর ভর প্রায় ৩০০০০ কোটি সূর্যের সমান। ব্যাস ৫০ কিলোপারসেক। আমাদের কাছ থেকে এর দূরত্ব ৬৭০ কিলোপারসেক বা প্রায় ২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। মজার ব্যাপার এই যে, এটিও একটি কুণ্ডলিত গ্যালাক্সি। এর কেন্দ্রটি বেশ উজ্জ্বল। কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ভারি মৌলের পরিমাণ বাইরের থেকে প্রায় ৩ গুণ বেশি। এখানেও এইচ-টু অঞ্চল এবং গুচ্ছস্তবক দেখা যায়। আমাদের ছায়াপথের তুলনায় এখানে তারা তৈরির প্রক্রিয়া যে বেশ কিছুটা দ্রুত তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। অ্যান্ড্রোমিডার প্রায় ৪টি উপগ্যালাক্সি আছে। এরা বামনাকৃতির উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সি। এদের মধ্যে একটি অ্যান্ড্রোমিডার বিপজ্জনকভাবে কাছে অবস্থিত এবং এর সাথে মিথস্ক্রিয়া প্রদর্শন করে। উপগ্যালাক্সিটির বহির্প্রান্ত থেকে তারাসমূহ অ্যান্ড্রোমিডার আকর্ষণে তার ভেতরে চলে যায়।

গ্রহের যেমন উপগ্রহ থাকে, ঠিক তেমনি গ্যালাক্সিরও উপগ্যালাক্সি আছে। আকাশগঙ্গা ছায়াপথেরও দুটো উপগ্যালাক্সি আছে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের আকাশ থেকে এদেরকে দেখা যায় না। কারণ পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে এরা অবস্থিত। দক্ষিণাকাশ থেকে এ দু'টোকে পরিষ্কার দেখা যায়। এদের বলে ম্যাজেলানীয় মেঘপুঞ্জ। ফার্দিনান্দ ম্যাজেলান বিশ্বভ্রমণে বের হলে এ দুটো লক্ষ করেন এবং এদের কথা লিপিবদ্ধ করেন। এদের মধ্যে নিকটতমটিকে বড়ো ম্যাজেলানীয় মেঘ এবং দূরেরটিকে ছোট ম্যাজেলানীয় মেঘ বলে। এদের দূরত্ব যথাক্রমে ৫০ ও ৬৫ কিলোপারসেক। বড় ম্যাজেলানীয় মেঘটির রয়েছে একটি উজ্জ্বল ও প্রশস্ত দণ্ডাকৃতির কাঠামো। কিন্তু এর আশেপাশে বিশৃংখল এবং অনুজ্জ্বল তারার সমাহার দেখা যায়। এর উজ্জ্বল কেন্দ্রটিতে একটি বিখ্যাত নীহারিকা, যার নাম টারানটুলা, অবস্থিত। এই নীহারিকার সবচেয়ে উজ্জ্বল কেন্দ্রীয় বস্তুটির সঠিক প্রকৃতি এখনো জানা যায়নি। এখানে আয়নিত গ্যাস ও নবীন তারাও লক্ষ করা যায়। বড়ো ম্যাজেলানীয় মেঘের দুটি অস্পষ্ট বাহু আছে বলে মনে করা হয়।

ছোট ম্যাজেলানীয় মেঘটির কাঠামো অপেক্ষাকৃত জটিল ও বিশৃংখল। কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো এর নেই। এখানেও একটি অস্পষ্ট দণ্ড রয়েছে বলে মনে হয়। অনেকেই মনে করেন এর প্রকৃত কাঠামোটি আকাশগঙ্গা ছায়াপথের মহাকর্ষীয় টানাপোড়নে বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

বড়ো ম্যাজেলানীয় মেঘের ভর প্রায় $১০^{১০}$ সূর্যভর এবং ছোটটির প্রায় ২×১০^{৯} সূর্যভর। দূর ভবিষ্যতে মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে এ দুটি উপগ্যালাক্সি আমাদের মূল ছায়াপথের সাথে মিলে যাবে।

গ্যালাক্সির ধর্ম

অনন্ত নক্ষত্রবীথির মতো অনন্ত গ্যালাক্সিরাজির মধ্যেও নিয়মতান্ত্রিকতার সুর ধ্বনিত হয়। গ্যালাক্সিরাজিও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ভর, দূরত্ব, আকৃতি ও গঠনের দিক দিয়ে সব গ্যালাক্সির মাঝেই কমবেশি মিল দেখা যায়। অবশ্য একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মাঝে এই বৈশিষ্ট্যগুলো গ্যালাক্সিভেদে পরিবর্তিত হয়। আমরা এখানে গ্যালাক্সির দৃশ্যমান সাধারণ ভৌত ধর্মগুলো আলোচনা করব।

গ্যালাক্সিসমূহ প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য তারার সমাহার বিধায় এরা প্রচুর ভরবিশিষ্ট হয়ে থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রচলিত বিধি হলো খুব বড়ো কোনো কাঠামোর ভর সূর্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। গ্যালাক্সির ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে এদের ভর সূর্যভরের গুণকাকারে লেখা হয়। গ্যালাক্সিসমূহের দৃশ্যমান ভর ১ লক্ষ থেকে দশ হাজার কোটি সূর্যভরের মধ্যে হয়ে থাকে। গ্যালাক্সির ভর নির্ণয়ে আছে এক বিরাট সমস্যা। ছায়াপথের ভর নির্ণয় করা যায় দুটি পৃথক পদ্ধতিতে। গ্যালাক্সিস্থিত নক্ষত্রদের গতি পর্যালোচনা করে গ্যালাক্সির ভর নির্ণয় করা যায়। আবার স্তবকের মধ্যে গ্যালাক্সির গতি থেকেও এর ভর নির্ণয় করা যেতে পারে। অবাক ব্যাপার এই যে এই দুই পদ্ধতিতে নির্ণীত ভরের মধ্যে বিশাল পার্থক্য দেখা যায়। যেমন প্রথম ক্ষেত্রে ভর ২×১০^{১১} সূর্যভর হলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নির্ণীত হয় ৩×১০^{১২} সূর্যভর। এ সমস্যা বিজ্ঞানীদের ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে। একেই বলে 'লুকনো ভর' সমস্যা। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে গ্যালাক্সির এমন কিছু ভারি উপাদান আছে যা আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না—না দৃশ্যমান আলোয়, না রেডিও তরঙ্গে। এদেরকে বিজ্ঞানীরা 'অদৃশ্য বস্তু' (ডার্ক ম্যাটার) বলে অভিহিত করেছেন। এদের ভর গ্যালাক্সির দৃশ্যমান ভরের ৩ থেকে ৫ গুণ হতে পারে। অর্থাৎ এই ভাবে বলা যায় যে বিশ্বের গঠনোপাদানের সবচেয়ে বড়ো অংশই অদৃশ্য বস্তু দিয়ে তৈরি, যার প্রকৃতি আমাদের জানা নেই। এর সম্ভাব্য সমাধান হচ্ছে নিউট্রিনো নামের একটি আপাত ভরহীন কণিকার ভরযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ আগে যেমন ভাবা হতো যে এরা ভরশূন্য, তা আর ভাবা যাচ্ছে না। এছাড়া দ্বিতীয় সমাধান হলো কিছু ভারি, মিথস্ক্রিয়াহীন কণিকার উপস্থিতি কল্পনা করা। এদেরকে অতিভারি কণিকা বলে। সম্পূর্ণ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং এর কোনো সমাধানও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। লুকনো ভরের সমস্যা গ্যালাক্সি গবেষণায় এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্যালাক্সিদের দূরত্ব কল্পনাও ছাড়িয়ে যায়। আমাদের সবচেয়ে কাছের অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি থেকে আলো এসে আমাদের কাছে পৌঁছতেই লেগে যায় প্রায় বিশ লক্ষ বছর। এ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে দূরতম গ্যালাক্সির দূরত্ব হলো $১০^{১০}$ আঃবর্ষ যার রক্তিমসরণ প্রায় ৬.৬৮। এটাই বিশ্বের বর্তমান সীমানা। গ্যালাক্সির দূরত্ব নির্ণয়ে আছে বেশ কিছু সমস্যা। যার ফলে এদের দূরত্ব বেশ খানিকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কাছাকাছি গ্যালাক্সিদের শেফালী বিষমতারার পর্যায়কাল ও উজ্জ্বলতা থেকে এদের আসন্ন দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। দূরের গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ততোটা কার্যকর নয়। এ ক্ষেত্রে অনেকগুলো পরোক্ষ উপায়ে দূরত্ব নির্ণয় করে মিলিয়ে দেখতে হয় এবং আসন্ন মান গ্রহণ

করতে হয়। অপর দিকে অত্যন্ত দূরবর্তী গ্যালাক্সির দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বের প্রসারণের কথা বিবেচনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে বর্ণালি রেখার রক্তিমসরণ ও হাব্‌লের ধ্রুবক থেকে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এখানেও হাব্‌ল ধ্রুবকের সঠিক মান অজানা রয়েছে। এভাবে গ্যালাক্সির দূরত্ব নির্ণয়ের বিষয়টি বেশ জটিল ও সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

এবার গ্যালাক্সির বয়সের বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হয়। মোটামুটি এ কথা বলা যায় যে সকল গ্যালাক্সির বয়স প্রায় একই। আমাদের ছায়াপথের বয়স ১০ থেকে ১২ বিলিয়ন বছর। দূরবর্তী গ্যালাক্সিদের বয়োবৃদ্ধ তারা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে এদের বয়সও ১২ বিলিয়ন বছরের বেশি নয়। মনে হয়, গ্যালাক্সি তৈরির প্রক্রিয়া একই সময়ে বিশ্বের সর্বত্র শুরু হয়েছিল। বিশ্ব শীতল হতে শুরু করার সময় থেকেই পদার্থ ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সি তৈরি হতে থাকে। গ্যালাক্সির ভেতরে আকৃতিগত যে পার্থক্য দেখা যায় তা বয়সের কারণে নয়, বরঞ্চ নক্ষত্র সৃষ্টি করতে পদার্থ কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার উপর। উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে তারা তৈরির প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে প্রথম কয়েক বিলিয়ন বছরের মধ্যেই ; অথচ কুণ্ডলিত এবং অনিয়মিত আকৃতির গ্যালাক্সিদের মধ্যে তারা তৈরির প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

গ্যালাক্সির প্রধান গঠনোপাদান নক্ষত্র। দূরের গ্যালাক্সির নক্ষত্র নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। তাই নিকটবর্তী গ্যালাক্সিদের পর্যবেক্ষণ করেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। গ্যালাক্সিতে বেশ কয়েক রকমের নক্ষত্র চোখে পড়ে ঃ ১, নবীন বয়সের প্রধানধারার তারা যা হাইড্রোজেন দহন করে চলেছে, এরা নীলচে তারা ; ২. বয়োবৃদ্ধ দানব তারা যারা হিলিয়াম দহন করছে, এরা লালচে তারা ; ৩. বিভিন্ন রকমের বিষমতারা (শেফালী বিষমতারা, আর. আর. লাইরী বিষমতারা ইত্যাদি) ; ৪. বিস্ফোরণশীল নবতারা (নোভা) বা সুপারনোভা ইত্যাদি। গ্যালাক্সিতে দৃষ্ট গ্যাস প্রধানত প্রশম H_2 সমৃদ্ধ। ধূলিকণার পরিমাণ মোট গ্যাসীয় পদার্থের ১% মাত্র।

সংক্ষেপে এই হলো গিয়ে বিভিন্ন গ্যালাক্সির মধ্যে দৃশ্যমান সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ।

দূরাকাশের দূরতম বস্তু কোয়েসার

মহাকাশের বিস্ময়কর বস্তুদের অন্যতম হলো কোয়েসার। মহাকাশের এটি এক অভিনব সদস্য। দেখতে এটি ঠিক একটি নক্ষত্রের মতো, কিন্তু এর থেকে প্রাপ্ত বিকিরণের পরিমাণ একশ গ্যালাক্সির সমান। এটি দূরাকাশের অন্যতম দূরতম বস্তুও বটে। এদের রক্তিমসরণ অনেক বেশি হয়ে থাকে। এর কারণ বিশ্বের প্রসারণ। অর্থাৎ স্থানকাল বিস্তৃতি প্রতিনিয়ত প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে ; আর সেইসাথে কোয়েসারসমূহও পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কোয়েসার সম্পর্কে সব রহস্যের সমাধান এখনো পাওয়া যায়নি। আজকাল পৃথিবীর কক্ষপথে বেশ কিছু স্যাটেলাইট সংস্থাপন করা হয়েছে যারা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ গ্রহণ করতে সক্ষম। এরা প্রতিনিয়ত দূরাকাশের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য দিচ্ছে। এইসব তথ্য দিয়ে নতুন তত্ত্ব প্রস্তাব করাও সম্ভব হচ্ছে।

কোয়েসার শব্দটি Quasi Stellar Radio Sources শব্দগুচ্ছের সংক্ষিপ্ত রূপ। মূলত এরা হলো নক্ষত্রের মতো বিন্দুবৎ রেডিও উৎস। কিন্তু পরে এমন অনেক কোয়েসার পাওয়া গেছে যাদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য রেডিও বিকিরণ নেই। তাই সাধারণভাবে এদেরকে Quasi Stellar Objects বা সংক্ষেপে QSO বলে। কোয়েসারদের কৌণিক ব্যাস ১´´ এর কম। তাই পৃথিবী থেকে তোলা আলোকচিত্রে এদেরকে নক্ষত্রের মতোই অবিশ্লেষিত অবস্থায় দেখা যায়। কোয়েসারের সবচেয়ে অবাক করা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, আকাশের খুব ছোট একটি অঞ্চল থেকে একটা গ্যালাক্সির একশ গুণের বেশি বিকিরণ পাওয়া যায়। ১৯৬৩ সালে কোয়েসার আবিষ্কৃত হয়। প্রথম আবিষ্কৃত কোয়েসারটির নাম 3C273। উক্ত কোয়েসারটি সূর্যের $১০^{১২}$ গুণ বেশি উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু এর ব্যাস ছিল মাত্র $১০^{৯}$ কিলোমিটার (অর্থাৎ আমাদের সৌরজগতের প্রায় সমান) কোয়েসারদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এদের অত্যধিক রক্তিমসরণ। এই অত্যুচ্চ রক্তিমসরণের কারণ হলো এদের অকল্পনীয় দূরত্ব। যেমন উক্ত কোয়েসারটির দূরত্ব হলো ২ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। আসলে কোয়েসাররাই বিশ্বের অন্যতম দূরবর্তী বস্তু। এখন পর্যন্ত জানা সবচেয়ে বেশি রক্তিমসরণবিশিষ্ট কোয়েসারটির রক্তিমসরণের মান হলো ৫.৫ এবং এর অবস্থান তিমিমণ্ডলে। এর অর্থ এই কোয়েসারটির আলো আমাদের কাছে পৌঁছতে ১৩ বিলিয়ন বছর সময় নিয়েছে। অর্থাৎ এটি এমন এক সময়ের প্রতিভূ যখন বিশ্বের বয়স ছিল বর্তমান বয়সের মাত্র ৮ শতাংশ। আদিতে বিশ্বের সব পদার্থ আয়নিত ছিল। অর্থাৎ সে সময়ে ইলেকট্রন প্রোটনের আকর্ষণে পরমাণুর ভেতরে বন্দী ছিল না। কিন্তু বিশ্ব শীতল হয়ে এলে ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলে প্রশম পরমাণু গঠন করে। এরপর প্রথম প্রজন্মের নক্ষত্র ও গ্যালাক্সির উৎপত্তি হয়। এরাই তখন গ্যালাক্সিদের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে আয়নিত করে তোলে। প্রশ্ন হলো দ্বিতীয়বারের মতো আয়নায়নের এই সময়টি কখন। এ কাজে উচ্চ রক্তিমসরণবিশিষ্ট কোয়েসার সাহায্য করতে পারে। কারণ এই কোয়েসারদের আলো বিশ্বের সেসময়কার পদার্থের মধ্যে দিয়ে গমন করে তবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তাই এদের বর্ণালি বিশ্লেষণ করে সেসময়কার পদার্থ আয়নিত কিনা তা জানা যায়।

অনেকের মতে আদি বিশ্বে প্রায় এক মিলিয়নের মতো কোয়েসার ছিল। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৩৫০০০ বা এরকম সংখ্যক কোয়েসার অবশিষ্ট আছে, তন্মধ্যে ২০০টি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি কোয়েসার গড়ে প্রায় এক মিলিয়ন বছর বাঁচে।

এখন প্রশ্ন হলো কী সেই ইঞ্জিন যা সৌরজগতের মতো ছোট্ট একটা জায়গা থেকে একটি গ্যালাক্সির শতগুণ বিকিরণ করে? এতো ছোট জায়গার মধ্যে এই বিপুল আয়োজন একমাত্র কৃষ্ণবিবরের পক্ষেই সম্ভব। বলা হচ্ছে, কোয়েসারের শক্তিকেন্দ্র হলো কোনো অতিভারি ঘূর্ণ্যমান কৃষ্ণবিবর। এরকম একটি কৃষ্ণবিবরের ভর হতে পারে $১০^৯$ সূর্যভর। এই কৃষ্ণবিবরের চারপাশে থাকে এক বিশাল অ্যাক্রেশন ডিস্ক। এই ডিস্কে প্রচুর গ্যাস ও ধূলিকণা থাকে যারা ঘুরতে ঘুরতে কৃষ্ণবিবরে পতিত হয়। দেখা গেছে, যেসব গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অতিভারি কৃষ্ণবিবর আছে তারা বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রচুর শক্তি উৎপাদন করতে পারে। যদি কোনো সক্রিয় গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থ অতিভারি কৃষ্ণবিবরে বছরে প্রায় এক সৌরভর পরিমাণ পদার্থ পড়তে থাকে তবে শক্তি উৎপাদনের হার বহু গুণে বেড়ে যায়। এই ধারণা যদি সত্যি হয় তবে কোয়েসারকে নতুন সৃষ্ট গ্যালাক্সির তারুণ্যে ভরপুর ক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। এমনও দেখা গেছে, দুটি গ্যালাক্সির সংঘর্ষের ফলে কোয়েসার জন্ম নিতে পারে। এক্ষেত্রে যে গ্যালাক্সি দুটির মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে তাদের মধ্যে যেটি বেশি ভারি সেইটির কেন্দ্রস্থ অতিভারি কৃষ্ণবিবর অপর গ্যালাক্সির সকল নক্ষত্র ও গ্যাসকে আত্মসাৎ করে ফেলে। আসলে এদের মধ্যে চলতে থাকে ভীষণ সব প্রক্রিয়া যার ফলে তীব্র বিকিরণের উদ্ভব হয়। এ থেকেই কোয়েসারের উপস্থিতি প্রমাণ করা যায়। সম্প্রতি এই উপায়ে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ একটি কোয়েসার PG 1012 + 008 আবিষ্কার করেছে যা দুটি গ্যালাক্সির সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন হয়েছে এবং এর দূরত্ব ১.৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। এ কারণে বিশ্ব যখন বয়সে তরুণ ছিল তখনই কোয়েসারের সংখ্যা বেশি ছিল বলে মনে করা হয়। পরে বিশ্বের প্রসারণের ফলে এইসব কোয়েসারসমূহ পরস্পর থেকে দূরে সরে গেছে।

কোয়েসার মহাবিশ্বের এক মহাবিস্ময়। বিশ্বজগতের সৌন্দর্যে এরা একটি ভিন্নতর মাত্রা যোগ করেছে। আজকাল অনেকেই মনে করেন যে অধিকাংশ গ্যালাক্সিই একদা কোয়েসার ছিল, পরে সময়ের সাথে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে।

দলবদ্ধ গ্যালাক্সিগুচ্ছ

আমরা আগেই বলেছি, গ্যালাক্সিসমূহের অনিবার্য ধর্ম হলো এই যে এরা দলবদ্ধ থাকতে চায়। আড্ডাবাজ বাঙালিদের মতোই এদের অবস্থা। মহাবিশ্বের সৌন্দর্যকে এরা আরেকমাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে। গ্যালাক্সির স্তবকদের অনেকটা অলংকার বলে মনে হয়। অলংকৃত, স্তবকসজ্জিত মহাবিশ্বের সৌন্দর্য মানুষকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে। এই মহাজাগতিক সৌন্দর্যের কাছে যেকোনো মানবীয় সৌন্দর্য তুচ্ছ, তুচ্ছ মানুষের অহংকার। বিশ্বের তুলনায় মানুষ যে কতোখানি তুচ্ছ তা জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়লেই জানা যায়। এই তুচ্ছতাবোধ মানুষকে হীনমন্য করে না, বরঞ্চ বিনয়ী হতে শিক্ষা দেয়।

তিরিশের দশকে ফ্রিট্জ জুইকি নামের এক বিজ্ঞানী দীর্ঘদিনের শ্রমসাধ্য গবেষণায় দেখতে পেলেন যে গ্যালাক্সিগুলো প্রকৃতপক্ষে কোটি কোটি আলোকবর্ষ ব্যাপী ছড়িয়ে থাকা একেকটি স্তবকের অন্তর্ভুক্ত। তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন বিশ্বের সাংগাঠনিক একক গ্যালাক্সি নয়, বরঞ্চ গ্যালাক্সির স্তবক (ক্লাস্টার)। আমাদের গ্যালাক্সি অ্যান্ড্রোমিডা সহ আরো প্রায় ৩০টি ক্ষুদ্র গ্যালাক্সি সহ স্থানীয় গ্যালাক্সিগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। আবার স্থানীয় গুচ্ছ আরো কয়েকটি গ্যালাক্সির স্তবকের সাথে একটি মহা গ্যালাক্সিস্তবকের (সুপারক্লাস্টার) অন্তর্ভুক্ত। এর কেন্দ্র কন্যারাশির দিকে অবস্থিত। একে বলে স্থানীয় সুপারগ্যালাক্সি।

গ্যালাক্সিস্তবক নানারকমের হতে পারে। গুচ্ছস্তবকে ২ থেকে ১০০ গ্যালাক্সি থাকতে পারে। এর বিস্তৃতি হতে পারে ৫০ লক্ষ আঃবর্ষ বা তারও বেশি। স্থানীয় গ্যালাক্সিগুচ্ছ আসলে একটি গুচ্ছস্তবক। এছাড়া ১ থেকে ৫ কোটি আঃবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত বর্তুলাকার স্তবক আছে যেখানে কয়েক হাজার গ্যালাক্সি একত্রিত থাকতে পারে। এখানে মূলত উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিই দেখা যায়।

১৯৫৮ সালে জর্জ আবেল প্রায় ২৭১২টি সমৃদ্ধ গ্যালাক্সিস্তবকের হদিস দেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে এরা আবার মহাস্তবক গঠন করে যেখানে ৫ /৬ টি স্তবক একত্রিত থাকে। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর দাবী বিতর্কিত ছিল। আজ আমরা জানি যে গ্যালাক্সি স্তবকসমূহ একত্রিত হয়ে মহাস্তবক গঠন করে যার বিস্তৃতি ২০ কোটি আলোকবর্ষের বেশি। বেশ কয়েকটি মহাস্তবকের নাম উল্লেখ করা যেতে পার ঃ স্থানীয় মহাস্তবক, সাদার্ন সুপারগ্যালাক্সি, পারসিয়াস সুপারগ্যালাক্সি ইত্যাদি।

মজার ব্যাপার হলো এই মহাস্তবকগুলো সুতার মতো আঁকাবাঁকা রেখা বরাবর সজ্জিত বলে মনে হয়। অনেকটা জীবকোষের মতো। দুটি কোষের পরস্পর ছেদ করা স্থানে অধিকাংশ গ্যালাক্সিকে জড়ো থাকতে দেখা যায়। জীবকোষে যেমন ভ্যাকুওল দেখা যায়, এখানেও তেমনি ভয়েড বা শূন্যস্থান দেখা যায় যেখানে সুবিশাল স্থানব্যাপী ১/২ টির বেশি গ্যালাক্সি দেখা যায় না। এই বিন্যাস অনেকটা সাবান ফেনার মতো (বুদ্বুদকে ঘিরে থাকে সাবান পানি)।

গ্যালাক্সিদের এই অভিনব কোষ কাঠামোর উদ্ভব সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা চলছে। এপর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে সার্থক তত্ত্বটি রুশ বিজ্ঞানী জেল'দোভিচ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন আদিযুগে বিশ্বের পদার্থসমূহ সুষমভাবে বন্টিত থাকলেও এদের ঘনত্ব সর্বত্র একই ছিল না। কোনো কোনো অঞ্চলের ঘনত্ব ছিল বেশি। এই অঞ্চলগুলো বিশ্বের শীতল হবার সাথে সাথে ঘনীভূত হতে থাকে এবং কালক্রমে গ্যালাক্সিস্তবকের জন্ম দেয়। এই তত্ত্বের নাম 'প্যানকেক তত্ত্ব'। অর্থাৎ ঐ সমস্ত অঞ্চলের আকৃতি ছিল প্যানকেক বা পাটিসাপটা পিঠার মতো। দুটো প্যানকেক যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে গ্যালাক্সিসমূহ জড়ো হয়েছে এবং অন্যত্র গঠিত হয়েছে শূন্যস্থান। এভাবে ঠিক জীবকোষের অনুরূপে গ্যালাক্সিস্তবকের কাঠামো তৈরি হয়েছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করে যেসমস্ত চিত্র পাওয়া গেছে তা পর্যবেক্ষণের সাথে মিলে যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মহাস্তবকেরও স্তবক থাকা কি সম্ভব? প্রয়াত জি. ডি-ভোকোলোর এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখেছেন। কম্পিউটার মডেল ব্যবহার করে তিনি দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে ৩০০ মেগাপারসেক দূরত্বেও কাঠামোর অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ের স্তবকের অস্তিত্ব সম্ভব। তবে অনেকেই তৃতীয় পর্যায়ের কাঠামো স্বীকার করেন না।

এভাবে মহাবিশ্বে একের পর এক কাঠামোর স্তর আবিষ্কৃত হচ্ছে। গ্যাসের ঘনীভূত গোলক হিসেবে নক্ষত্র, অসংখ্য নক্ষত্রের সমাহারে গ্যালাক্সি, শ'খানেক গ্যালাক্সি মিলে স্তবক গঠন করে, ৫/৬টি স্তবকের সমন্বয়ে মহাস্তবক গঠিত হয়েছে। কাঠামোর এই সাংগাঠনিক পারম্পর্য কি এখানেই থামবে, নাকি এটা অসীম? কেউ এ প্রশ্নের উত্তর জানে না। বিজ্ঞানীরা এ অবস্থার সাথে পেঁয়াজের খোসার তুলনা করেছেন যেখানে একের পর এক স্তর আছে। এই অসীমতাই বিশ্বকে অপার সৌন্দর্য দান করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

চিত্রকরের বিশ্ব ভুবনখানি,
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া-পেটা—
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়, দেখার জিনিস এটা।।

গ্যালাক্সির জন্মকথা

অনন্ত গ্যালাক্সিরাজির জন্ম হলো কী করে? এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে গ্যালাক্সিসমূহের বয়স মোটামুটি কাছাকাছি, অর্থাৎ এরা সমসাময়িক। গ্যালাক্সি সৃষ্টির সাথে গ্যালাক্সি স্তবক, মহাস্তবক, তথা মহাবিশ্বে ব্যাপক কাঠামোর উদ্ভব জড়িত। স্বভাবতই এ পুরো বিষয়টি অত্যন্ত জটিল তত্ত্বের কচকচানি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা এখানে খুব সংক্ষেপে সৃষ্টি কাহিনীটি লিখছি।

আমরা আগেই বলেছি গ্যালাক্সির মহাস্তবক সৃষ্টির অন্যতম সার্থক তত্ত্ব হলো জেল'দোভিচের 'প্যানকেক' তত্ত্ব। অবশ্য বিপরীত তত্ত্বও আছে এবং কোনটি যে সঠিক তা ঠিক বলা সম্ভব নয়। এক তত্ত্বমতে প্রাচীন বিশ্বের পদার্থসমূহ হতে প্রথম তৈরি হয়েছিল গ্যালাক্সিস্তবক, তারপর গ্যালাক্সি-আকৃতির মেঘখণ্ড, অতঃপর এই মেঘখণ্ড ভেঙে পর্যায়ক্রমে নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে। অপর তত্ত্বমতে প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে নক্ষত্র, তারপর নক্ষত্র মিলিত হয়ে গ্যালাক্সি এবং গ্যালাক্সির সমাহারে স্তবক। তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে যা মনে হয় তা হলো এই যে, সম্ভবত দ্বিতীয় চিত্রটিই সঠিক। এই দ্বিতীয় তত্ত্বের নাম 'বটম-আপ মডেল'।

'প্যানকেক' তত্ত্বমতে বিশ্বের আদিম পদার্থসমূহের মধ্যে ছিল স্থানবিশেষে ঘনত্বের তারতম্য। এইসমস্ত অঞ্চলের আকৃতিও ছিল সুবিশাল। বিশ্ব সৃষ্টির ১ মিলিয়ন বছর পরে যখন পদার্থ ও বিকিরণ পরস্পর থেকে বিযুক্ত হয়ে গেল তখন থেকে এই অঞ্চলসমূহ মহাকর্ষের আকর্ষণে ঘনীভূত হতে শুরু করে। এর ফলে সৃষ্টি হয় চ্যাপ্টা পাটিসাপটা বা প্যানকেক আকৃতির সুবিশাল মেঘখণ্ড। এই সমস্ত মেঘখণ্ড থেকেই ক্রমে গ্যালাক্সি স্তবকের জন্ম হয়েছে।

আমাদের ছায়াপথের জন্ম হয়েছে সূক্ষ্ম গ্যাসের একটি গোলকাকার সংগ্রহ থেকে যার ঘনত্ব ছিল প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে মাত্র একটি পরমাণু। একে বলে ভ্রূণগ্যালাক্সি। কালক্রমে পার্শ্ববর্তী মেঘখণ্ডের আকর্ষণে এতে জন্ম নেয় মৃদু ঘূর্ণনবেগ। এই ভ্রূণছায়াপথের সর্বোচ্চ ব্যাস হতে পারে ১০০ কিলোপারসেক। মহাকর্ষীয় ঘনীভবনের ফলে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে গ্যাসের ঘনত্ব ও বেগ বেড়ে যায় এবং সম্ভবত প্রথম প্রজন্মের নক্ষত্র জন্ম নেয়। এরা শুধুই H_2 ও He সমৃদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। এসব তারার অভ্যন্তরে এবং পরে এদের সুপারনোভা বিস্ফোরণে অনেক ভারি মৌল সংশ্লেষিত হয় এবং আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভ্রূণছায়াপথের বাইরের দিকে ঘূর্ণনবেগ ছিল কম, ফলে এখানে তারা তৈরির প্রক্রিয়া ধীরে শুরু হয়। কিন্তু যদি সর্বত্র তারা তৈরির প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়ে যেতো তাহলে আমাদের ছায়াপথের আকৃতি হতো উপবৃত্তাকার। কিন্তু আমাদের ছায়াপথের ক্ষেত্রে অনেক গ্যাস অবশিষ্ট ছিল এবং এরা তারা তৈরির প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ঘূর্ণন বাড়ার ফলে স্ফীত অংশের সৃষ্টি হয়।

অবশিষ্টাংশ কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চারপাশে চাকতি বা ডিস্কের সৃষ্টি করে। ভ্রূণছায়াপথের অবস্থা থেকে চাকতি অংশ তৈরি পর্যন্ত কয়েক'শ মিলিয়ন বছর সময় লেগেছে। অন্যদিকে ঘনত্বের কুণ্ডলিত তরঙ্গের কারণে কুণ্ডলিত বাহুর সৃষ্টি হয়। এটি একটি জটিল ভৌত প্রক্রিয়া।

এভাবে সুবিশাল মেঘখণ্ডের মহাকর্ষীয় ঘনীভবনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে আকাশগঙ্গা সহ অন্যান্য গ্যালাক্সি। আগেই বলেছি এ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে অসমাহিত অনেক সমস্যা। এসব সমস্যার আশু সমাধান খুব একটা সহজ নয়। প্রায় ১২ বিলিয়ন বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী পুনরুদ্ধার করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেমে নেই। তাঁরা অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন। আলেক্সান্দার দ্যুমার মতো বলতে হয় ঃ "মানুষ শুধু অপেক্ষা করতে পারে, আর করতে পারে আশা।"

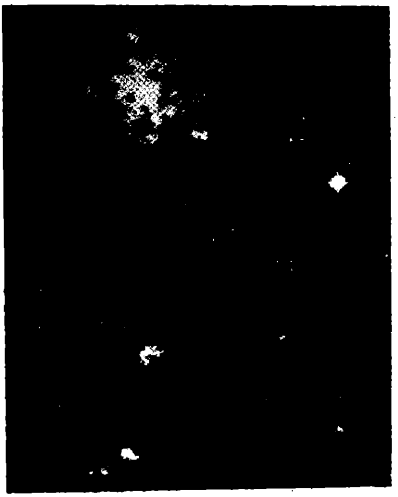

"মহাবিশ্বে মহাকাশে
মহাকাল-মাঝে"

প্রসারমান বিশ্ব

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ মনে করত যে সে সবকিছুর কেন্দ্রে অবস্থিত। তারা ভাবত পৃথিবী সমগ্র বিশ্বচরাচরের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত। মানুষের মাঝে সবসময়ে এধরনের একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এভাবে পৃথিবীকেন্দ্রিক মতবাদ গড়ে ওঠে যা সবচেয়ে সুসংহত রূপ পায় টলেমীর হাতে। পরবর্তীতে তা যাজকতন্ত্রের হাতে পড়ে এবং ধর্মের বাতাবরণে ডালপালা ছড়াতে থাকে। কিন্তু কোপার্নিকাস যখন তাঁর বৈপ্লবিক সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ দিলেন তখন ঐ প্রচলিত মতবাদ সাংঘাতিক ধাক্কা খেল। কোপার্নিকাস পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে সেখানে সূর্যকে স্থাপন করলেন। ফলে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হলো। পরবর্তীতে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র থেকেও বিচ্যুত হয়। হার্লো শেপলী নামের এক বিজ্ঞানী দেখালেন যে, আমাদের সূর্য আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আসলে বিশ্বের কোনো কেন্দ্র নেই। আধুনিক বিশ্বচিত্রের এটি একটি স্বীকার্য। কিন্তু মনে হয় অনেকেই আজো ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি।

সূর্যও আহামরি ধরনের কোনো কিছু নয়, বরঞ্চ সাধারণ গোছের একটি নক্ষত্র (পূর্ববর্তী রচনাগুলোতেই আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি)। এবারে আমরা বিশ্বের একটি বিশেষ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করব।

বলা হচ্ছে, বিশ্ব প্রসারমান। মানে প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে। ১৯২৯ সালে এডুইন পি. হাব্‌ল (Hubble) এটি গবেষণা করে দেখতে পান। কীভাবে তিনি এটি আবিষ্কার করলেন তা জানার আগে আরেকটি ব্যাপার জানতে হবে। আমরা অনেকেই হয়ত দেখেছি, রেলস্টেশনে দাঁড়ালে কাছে আসা রেলের বাঁশী তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। কিন্তু দূরে চলে যাওয়া রেলের বাঁশী মৃদু থেকে মৃদুতর মনে হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে ডপলার ক্রিয়া। প্রথম ক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমতে থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাড়তে থাকে। এবং এই ডপলার ক্রিয়া সবধরনের তরঙ্গের জন্য প্রযোজ্য, এমনকি আলোর জন্যও। কারণ আমরা জানি আলো বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ। ফলে কোনো একটি দূরবর্তী আলোক উৎস যদি আমাদের নিকটবর্তী হতে থাকে তবে উৎস থেকে পাওয়া আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট হতে থাকে ; আর যদি আলোর উৎস আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। এখন নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম এবং লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। ফলে আলোক উৎস থেকে প্রাপ্ত আলোকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তবে দেখা যাবে যে প্রথম ক্ষেত্রে এর বর্ণালি নীল প্রান্তে সরে গেছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বর্ণালি লাল প্রান্তে সরে যাচ্ছে। প্রথম ক্ষেত্রে বলা হবে বর্ণালির নীলাভসরণ ঘটছে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হবে বর্ণালির রক্তিমসরণ (red shift) ঘটছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে রক্তিমসরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডপলার ক্রিয়ার এই ফলাফল কতগুলো সমীকরণ সমাধান করে পাওয়া যায় তবে আমরা সমীকরণের জটিলতায় যাচ্ছি না।

হাব্‌ল অনেকগুলো দূরবর্তী গ্যালাক্সির আলো নিয়ে গবেষণা করে দেখতে পেলেন যে এদের প্রায় সবার বর্ণালিরই রক্তিমসরণ ঘটছে, অর্থাৎ অধিকাংশ গ্যালাক্সিই আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আরো একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো গ্যালাক্সির দূরত্ব যতো বেশি তার রক্তিমসরণ ততো বেশি। বর্তমানে এটি হাব্‌ল বিধি নামে পরিচিত। এটি হলো ঃ গ্যালাক্সির অপসরণ গতিবেগ = হাব্‌ল ধ্রুবক × গ্যালাক্সির দূরত্ব। হাব্‌ল্ ধ্রুবকের মান গড়পরতায় ৭০ কি. মি./সেকেন্ড/মেগাপারসেক। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে এর মান ১০০ h কি. মি./সেকেন্ড/মেগাপারসেক, যেখানে h এর মান ০.৪ থেকে ১ এর মাঝামাঝি। হাব্‌ল ধ্রুবক আসলে সময়-নির্ভর একটি রাশি।

মহাবিশ্বের এই প্রসারণকে বেলুনের সাথে কল্পনা করা যায়। ধরা যাক, বেলুনের ওপর কিছু ফুট্‌কি আছে। এখন বেলুনটিকে ফুলালে ফুট্‌কিগুলোর মধ্যের দূরত্ব বেড়ে যাবে। একইভাবে মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে দূরবর্তী গ্যালাক্সিসমূহের দূরত্ব বেড়ে যাবে। মনে রাখা দরকার, এই প্রসারণ কিন্তু স্থানীয় কোনো ঘটনা নয়। আমাদের ছায়াপথের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে না বা নিকটবর্তী গ্যালাক্সি অ্যান্ড্রোমিডা আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না। এই প্রসারণ শুরু হয় স্থানীয় গ্যালাক্সিগুচ্ছের বাইরে অর্ধ-মিলিয়ন পারসেক দূরত্বের ওপারে।

কিন্তু কেন এই প্রসারণ? আমরা জেনেছি সমগ্র বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি হয়েছে ১২ বিলিয়ন বছর আগে (এই মানটি হাব্‌ল ধ্রুবকের বিপরীত মান)। সেই আদিম বিস্ফোরণের ধাক্কায় বিশ্ব আজো প্রসারিত হয়ে চলেছে। তবে মহাকর্ষ এই প্রসারণ বেগকে বেশ খানিকটা থিতিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে কি মহাকর্ষ এই প্রসারণকে সম্পূর্ণ থামিয়ে দেবে? এটি নির্ভর করে বিশ্বের পদার্থের ঘনত্বের ওপর। বর্তমানে এর যা মান তাতে মনে হয় না প্রসারণ থামবে। কিন্তু যদি অদৃশ্য বস্তুর (dark matter) অস্তিত্ব সত্য হয় তবে তা ঘনত্ব বাড়িয়ে দেবে। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে যে বিশ্বের প্রসারণ ত্বরিত হারে বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ পূর্বে যা ছিল তার তুলনায় বর্তমানে বিশ্বের প্রসারণের হার বেড়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বাড়বে। তারপরও কি মহাকর্ষ এই প্রসারণকে থামিয়ে দেবার মতো শক্তিমান হবে?

কে জানে।

বিশ্বের পটভূমি বিকিরণ

১৯৬৪ সাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির হোমডেলে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীজে কাজ করছিলেন আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন। ওদের গবেষণার বিষয় ছিল উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তা গোলমাল শূন্য করা। ৭.৩৫ সে. মি. ওয়েভলেংথের রেডিও অ্যান্টেনা এবং গ্রাহক যন্ত্র নিয়ে ওঁরা কাজ করছিলেন। কিন্তু বারবার ওঁরা লক্ষ করলেন যে একটা ত্রুটি কোথায় যেন থেকেই যাচ্ছে। তাঁরা দেখলেন যন্ত্রের নকশাগত ত্রুটি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞাত প্রভাব বাদ দিয়েও একটা মৃদু রেডিও নয়েজ থেকেই যাচ্ছে। কোনো অর্থহীন, অবাঞ্ছিত শব্দকে নয়েজ বলে। সাধারণ রেডিওতে ফ্রিকোয়েন্সি বদলানোর সময়ে যে কিরকির শব্দ শোনা যায় সেটাও নয়েজ। অনেক খোঁজাখুজির পর পেনজিয়াস-উইলসন দেখলেন যে ওঁদের রেডিও অ্যান্টেনায় এক পায়রা দম্পতি বাসা বেঁধেছে। কিন্তু পায়রা দম্পতিকে সরিয়েও সেই নয়েজ রয়েই গেল। আরো গবেষণা করে ওঁরা দেখলেন যে রেডিও সংকেতটি দিক নিরপেক্ষ—মানে সবদিকেই সমান। দিনের অন্যান্য সময়ে, বছরের অন্যান্য ঋতুতেও একই থাকে। মনে হচ্ছে এটা সৌরজগতের বাইরে থেকে আসছে। তাঁরা এই বিকিরণের মান নির্ধারণ করলেন ৩.২° কেলভিন।

কেন এই বিকিরণ? বিশ্বসৃষ্টির সাথে এর কী সম্পর্ক? ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত দুটি তত্ত্ব পাওয়া যায়—স্থিতাবস্থার তত্ত্ব ও মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang)। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বমতে এক অতিঘন, অত্যুত্তপ্ত বিন্দুবস্তুর প্রবল বিস্ফোরণ দ্বারা বিশ্বের সূচনা ঘটে। প্রথম থেকেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় বিশ্ব প্রসারিত হতে থাকে। প্রথম কয়েক মুহূর্তে তাপমাত্রা ছিল কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন কেলভিন। কিন্তু বিশ্বের বেড়ে যাওয়ার (প্রসারণের) সাথে সাথে তাপমাত্রা কমে আসতে থাকে এবং মৌল তৈরি শুরু হয়। সৃষ্টির ১ মিলিয়ন বছর পর তাপমাত্রা নেমে আসে ৩,০০০ কেলভিনে। এর আগ পর্যন্ত বিকিরণ (বা ফোটন কণা) অন্য বিকিরণ বা জড়ের সাথে বিশেষ করে মুক্ত ইলেকট্রনের সাথে বিক্রিয়া করতো। ফলে বিশ্ব ছিল অনচ্ছ (opaque)। বিকিরণ অবাধে গমন করতে পারত না। কিন্তু যখন মৌল তৈরি হয়ে গেল তখন আর ইলেকট্রন মুক্ত রইল না। ফলে বিকিরণকে বাঁধা দেবার মতো কেউ রইল না। ফলে বিশ্ব হয়ে উঠল আলোকভেদ্য (স্বচ্ছ)। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এই মুহূর্ত থেকে বিকিরণ ও জড় পরস্পর বিযুক্ত হলো। বিশ্বের প্রসারণের ফলে বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। ফলে তা বর্তমানে বর্ণালির মিলিমিটার অংশে সংযুক্ত হবার কথা।

১৯৪০ সালে জর্জ গ্যামো এই বিকিরণের মান প্রদান করেন ১০° কেলভিন। তিনি ব্যবহার করেছিলেন মৌল সংশ্লেষণের তত্ত্ব। আলফের ও হেরম্যান বের করেছিলেন ৫ ডিগ্রী। পেনজিয়াস-উইলসন যখন তাঁদের গবেষণা সম্পন্ন করছিলেন তখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর. ডিকি, পি. জে. ই. পিবল্‌স্ এবং তাঁদের সহকর্মীবৃন্দ এই বিকিরণের তাত্ত্বিক দিকটি নিয়ে অনুসন্ধান করছিলেন। এই দুদলের মধ্যে দূরত্ব ছিল মাত্র কয়েক

মাইল, কিন্তু কেউ কারো খবর জানতেন না। পরে যখন ওঁরা জানতে পারলেন পরস্পরের গবেষণার বিষয় তখন ওঁরা পৃথকভাবে গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। ডিকি ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলো হলো ঃ ১. যেহেতু আদিম বিকিরণ সমস্ত বিশ্বের মধ্য দিয়ে ভেদ করেছে সেহেতু এর বর্তমান অবশেষ সর্বত্র সুষম হবে ; ২. এই বিকিরণের বর্ণালি ও কৃষ্ণবস্তুর বর্ণালি অভিন্ন হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণকে তাপমাত্রার মাধ্যমে প্রকাশ সম্ভব ; ৩. এইসময়কার অত্যুচ্চ এই তাপমাত্রার বর্তমান অবশেষ অবশ্যই রেডিওতে মিলিমিটার অংশে পাওয়া যাবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে পেনজিয়াস-উইলসন কর্তৃক প্রাপ্ত বিকিরণই সেই বহু প্রার্থিত বিকিরণ যা আমরা খুঁজছিলাম। বর্তমানে আমরা এই বিকিরণকে বলি মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ (background radiation) যার মান ২.৭ ডিগ্রী কেলভিন। এটি মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের এক জোরালো সমর্থক। রেডিওর শূন্য চ্যানেলে যে নয়েজ শোনা যায় তার কিছু অংশ এই পটভূমি বিকিরণের উপস্থিতির কারণে হয়ে থাকে। একই কারণে টেলিভিশনের যে চ্যানেলে কোনো ব্রডকাষ্টিং স্টেশন টিউন করা থাকে না সেই চ্যানেলে যে অনেক আলোর ফুটকি দেখা যায় তার কিছু অংশও উক্ত কারণে হয়ে থাকে।

সমস্যা হলো যে এই ৩° কেলভিন তাপমাত্রা যে ওয়েভলেংথে পাবার কথা সেটা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। কারণ বায়ুমণ্ডল দীর্ঘ অবলোহিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে ৬ মি. মি. পর্যন্ত বিকিরণ শোষণ করে। উচ্চাকাশে বেলুন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই বিকিরণ সম্পর্কে মোটামুটি সুনিশ্চিত হওয়া যায়। ১৯৮৩ সালে মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয় COBE (Cosmic Background Explorer) যা প্রমাণ করেছে যে পটভূমি বিকিরণ সবদিকে সুষম হওয়া সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট দিকে $১০^{৪}$ ভাগে মাত্র ১ ভাগ বিচ্যুতি ঘটে। এর কারণ পৃথিবী ও সৌরজগৎ কন্যাস্তবকের দিকে ধাবমান। ফলে গতির দিকে বিকিরণের মাত্রা একটু বেশি হবে।

মাইক্রোতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ বিশ্বমঞ্চে ঘটে যাওয়া সুপ্রাচীন এক মহান নাটকের বর্তমান অবশেষ। সেই পবিত্র ঘটনাক্রমের বর্তমান প্রতিধ্বনি খুঁজে পাবার জন্য ১৯৭৮ সালে পেনজিয়াস ও উইলসনকে নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়।

বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বসমূহ

বিশ্বসৃষ্টি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা শুরু হয় সুপ্রাচীনকালে। কিন্তু এ সমস্ত ভাবনাচিন্তা সবই আবর্তিত হতো ব্যক্তিচিন্তাকে ঘিরে। ব্যক্তিবিশেষের মতামতই প্রাধান্য পেত। তাছাড়া এসমস্ত চিন্তাভাবনা অধিকাংশই দৈবনির্ভর ছিল। মধ্যযুগে বাইবেলের বাইরে সৃষ্টিসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা করাই ছিল পাপ এবং কোনো কোনো দুঃসাহসিক তা করলেও তাদের পড়তে হয়েছে চার্চের কোপানলে। এতৎসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা গত শতাব্দীতেই নতুন শুরু হয়। এবং বর্তমানে এ ব্যাপারে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। এখন বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে (cosmology) প্রয়োজন পড়ছে আপেক্ষিকতত্ত্বের, কণাপদার্থবিজ্ঞানের, কেন্দ্রীন-পদার্থবিজ্ঞানের, তাপগতিবিজ্ঞানের, প্লাজমা ও কঠিনাবস্থার পদার্থবিজ্ঞান এবং সর্বোপরি জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের।

বিশ্ব সম্পর্কে তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা শুরু করেন আইনস্টাইন। ১৯০৫ সালে বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব ও ১৯১৫ সালে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রণয়নের পর তিনি বিশ্বসম্পর্কিত তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন বিশ্ব হলো সুস্থিত। কাজেই আইনস্টাইন যখন তাঁর বিখ্যাত ক্ষেত্রসমীকরণটি লিখলেন তখন দেখা গেল যে বিশ্ব সুস্থিত থাকতে পারে না। কিন্তু তা আইনস্টাইনের ধারণার ছিল পরিপন্থী। তাই তিনি একটি অতিরিক্ত পদ সংযোজন করেন—এটি মহাজাগতিক ধ্রুবক। একে বিকর্ষণী শক্তি হিসেবে দেখানো যায় যা আইনস্টাইনের আবদ্ধ বিশ্বের পদার্থের মধ্যের আকর্ষণ শক্তির সমান। এভাবে বিশ্ব সুস্থিত থাকে। দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৯ সালে ই. পি. হাব্‌ল যখন প্রমাণ করলেন যে বিশ্ব নিয়ত প্রসারমান তখন দেখা গেল আইনস্টাইনের অতিরিক্ত পদ সংযোজনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। ওঁর মূল সমীকরণটিই যথেষ্ট ছিল। পরে আইনস্টাইন একে তাঁর জীবনের "সবচেয়ে বড়ো ভুল" বলে অভিহিত করেন। এ ঘটনাটিকে অবশ্য অনেকে বিভিন্নভাবে রঙ চড়াতে চান। কিন্তু আসলে এর তাৎপর্য এই যে ব্যক্তিবিশেষের ধারণাই চরম নয়।

১৯২২ সালে রুশ গণিতবিদ আলেক্সান্দার ফ্রিডম্যান ও ১৯২৭ সালে বেলজিয়ান জর্জ লেমাইটার মহাবিস্ফোরণের পূর্বসূরী একটি তত্ত্ব দেন। এখানে বিশ্বকে স্থানিকভাবে দিকনিরপেক্ষ ও সমসত্ত্ব ধরে নেওয়া হয়েছে। এ দুজনের নকশার (model) মধ্যে পার্থক্য হলো প্রথমজন মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান শূন্য এবং দ্বিতীয়জন এর অশূন্যমানের পক্ষপাতী। ফ্রিডম্যানের মূল স্বীকার্য ধরে নিলে তিনটি সম্ভাবনা পাওয়া যায় ঃ ১. মহাবিশ্ব ধীরভাবে প্রসারমান এবং এক সময় তা বন্ধ হবে। ২. বিশ্ব এতো দ্রুত প্রসারমান যে প্রসারণ বন্ধ হবে না। ৩. বিশ্বের প্রসারণগতি এমন যে বিশ্ব কখনো চুপসে (collapse) যাবে না। এ নকশামতে বিশ্ব সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল। আইনস্টাইনের তত্ত্বে সময়ের কোনো শুরু এবং শেষ নেই—এটা অসীমভাবে বিস্তারিত। কিন্তু আধুনিক নকশায় সময়ের শুরু এবং শেষ আছে। এ দুই মুহূর্তকে মহাবিস্ফোরণ (big bang) ও মহাসংকোচন (big crunch) নামে অভিহিত করা হয়।

এখানে কিছু ব্যাপার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বিশ্ব সম্পর্কে একটি স্বতঃসিদ্ধ মেনে নেওয়া হয়। এটি হচ্ছে সৃষ্টিতত্ত্বের নীতি ঃ "ব্যাপক পটভূমিতে বিশ্ব সমসত্ত্ব ও দিকনিরপেক্ষ।" এডওয়ার্ড মিল্‌নে এটি প্রথম প্রস্তাব করেন। স্মর্তব্য যে এটি কোনো গণিতলব্ধ স্বীকার্য নয়। তবে এ স্বীকার্যকে মেনে নিয়েই বিশ্বের তত্ত্বসমূহ গড়ে উঠেছে। এবং এসব তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী ভালোই মিলেছে। কাজেই এতে অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব জানতে হলে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব জানা অপরিহার্য। কিন্তু এটা এতোটাই গণিতনির্ভর যে একে ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ কঠিন। এটি বলা সহজ, বোঝানো কঠিন, লেখা কঠিনতর। কাজেই বিষয়টি এখানে এড়িয়ে যেতে হচ্ছে।* বিশ্বের প্রতিটি নকশায় ঘুরেফিরে বিশ্বের বক্রতা আসে। এটি খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিশ্ব সমতল (ফ্ল্যাট) হতে পারে অথবা ধনাত্মকভাবে বাঁকা (গোলকের পৃষ্ঠের মতো) অথবা ঋণাত্মকভাবে বাঁকা (ঘোড়ার জিনের মতো) হতে পারে। আমাদের কাছে বাঁকানো পৃথিবীকে যেমন সমতল মনে হয় ঠিক তেমনি এই বিশ্ব স্থানীয়ভাবে সমতল হলেও ব্যাপক পটভূমিতে গোলকের পৃষ্ঠের মতো বাঁকানো। এজন্য বিশ্ব সসীম হলেও এর কোনো সীমা নেই। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব মিনকোওস্কির চতুর্মাত্রিক জগৎ।

১৯৪৮ সালে বন্ডি, হয়েল ও গোল্ড স্থিতাবস্থার তত্ত্ব (steady state) প্রস্তাব করেন। ওঁদের মডেলে সময়ের সাথে বিশ্বের কোনো পরিবর্তন হয় না। অনাদিকাল থেকে এটি ছিল, এটি আছে এবং থাকবে। বিশ্বের প্রসারণের প্রমাণ পাবার পর তত্ত্বে সঙ্গতি আনা হয় এভাবে যে বিশ্বে পদার্থ নিয়মিত তৈরি হচ্ছে। ফলে বিশ্বের ঘনত্ব একই থাকছে। প্রতি এক হাজার বছরে প্রতি ঘন মিটারে মাত্র একটি হাইড্রোজেন পরমাণুই যথেষ্ট। এই মান অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও এর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তত্ত্বে নেই। তাছাড়া পটভূমি বিকিরণের কোনো ব্যাখ্যা এ তত্ত্ব দিতে পারেনি।

আমরা এবার ফ্রিডম্যানের নকশায় ফিরে যাই। এ নকশাগুলোর সাধারণ অনুমানটি হলো কোনো এক সুদূর অতীতে সমস্ত বস্তুনিচয় একত্রিত ছিল। অর্থাৎ গ্যালাক্সিদের মধ্যের দূরত্ব ছিল শূন্য। অর্থাৎ এক অতি ঘন, অত্যুত্তপ্ত বিন্দু থেকেই বিশ্বের সূচনা। এই মাহেন্দ্র ক্ষণটিকেই বলে Big Bang বা মহাবিস্ফোরণ। এ তত্ত্বের নাম উষ্ণ মহাবিস্ফোরণ নকশা (Hot Big Bang Model)। এ তত্ত্বের প্রথমদিককার প্রস্তাবকদের মধ্যে ছিলেন জর্জ গ্যামো, ডেনিস সিয়ামা প্রমুখ। এ পর্যন্ত এটিই সবচাইতে সার্থক তত্ত্ব। কারণ এই তত্ত্বের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হলো— একটি সুষম বিকিরণ অবশেষ যা পটভূমি বিকিরণ হিসেবে সনাক্ত করা গেছে, বিশ্বের প্রসারণ এবং বিশ্বে পর্যবেক্ষিত হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের শতাংশের অনুপাত ৩ ঃ ১।

বলা হয়েছে, বিশ্বের আদিতে এক অতি ঘন, অত্যুত্তপ্ত বিন্দু ছিল। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ বিন্দুতে বিশ্বের ঘনত্ব ও বক্রতা অসীম। গাণিতিকভাবে এ ধরনের বিন্দুকে বলে ব্যতিক্রমী বিন্দু (point of singularity)। ১৯৭০ সালে স্টিফেন

---

* আগ্রহী পাঠক বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত লেখকের "জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান পরিচিতি" বইটি দেখতে পারেন। এখানে অন্যান্য আরো কিছু প্রয়োজনীয় বইয়ের রেফারেন্স আছে।

হকিং ও রজার পেনরোজ কয়েকটি শক্তিশালী উপপাদ্য প্রমাণের মাধ্যমে দেখান যে যদি সাধারণ আপেক্ষিকতা অভ্রান্ত হয় এবং মহাবিশ্বে যদি পর্যবেক্ষিত পরিমাণে পদার্থ থেকে থাকে তবে মহাবিস্ফোরণ এবং সেইসাথে ব্যতিক্রমী বিন্দুর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ ধরনের অসীমগর্ভ ব্যতিক্রমী বিন্দুর অস্তিত্ব খুবই অস্বস্তিকর। তাই হকিঙই আবার বিকল্প প্রস্তাব এনেছেন। ব্যতিক্রমী বিন্দুর পরিসরে কোয়ান্টাম প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হয়ত সাফল্য দেখাতে পারে। তাছাড়া মহাবিস্ফোরণ নকশারও কিছু অসুবিধা আছে। এদের জন্য আবার বিকল্প প্রস্তাব আছে—এদেরও আবার নিজস্ব সমস্যা রয়েছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে ঃ বিশ্বের কি তবে কোনো কেন্দ্র আছে? না, নেই। কারণ স্থান-কাল কাঠামোরই জন্ম হয়েছে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। বলা হয়ে থাকে, মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে বিশ্বের প্রতিটি এবং যেকোনো বিন্দুতে।

হকিঙের ভাবনাগুচ্ছ

বর্তমান সময়ের বিখ্যাততম পদার্থবিজ্ঞানী, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের লুকাসিয়ান প্রফেসর স্টিফেন উইলিয়াম হকিং বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে কয়েকটি তত্ত্ব দিয়েছেন। মোটর নিউরোন রোগে আক্রান্ত হয়ে হুইলচেয়ারে বন্দী হলেও তাঁর মস্তিষ্ক থেমে থাকেনি। তাঁর মুখের কথা জড়িয়ে গেলেও গণিতের ভাষা তাঁর কাছে সাবলীল। তাঁর তত্ত্বের মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কাল্পনিক কাল সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। আমরা জানি, বিশ্বের চারটি মাত্রা আছে। তিন মাত্রার স্থান আমরা দেখতে পাই। তাই স্থানের স্থানাংক 'বাস্তব'। কিন্তু সময়ের মাত্রাটি কাল্পনিক। বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বে এই মাত্রাটিকে লেখা হয়: $x_4 = ict$, এখানে $i = \sqrt{-1}$। এভাবে সময়কে কাল্পনিক সংখ্যা দিয়ে লিখলে স্থান ও সময়ের মধ্যে আর পার্থক্য থাকে না। যে স্থানকালে সময়ের স্থানাংক কাল্পনিক সেটা ইউক্লিডীয় স্থান। এ ধরনের স্থানকালে স্থান ও সময়ের মাত্রার মধ্যে কোনো ফারাক নেই। কিন্তু বাস্তব স্থানকালে পার্থক্য সুস্পষ্ট থাকে। কাল্পনিক সময় আসলে একটি নামমাত্র— গণিতে ছাড়া এর আর কোনো তাৎপর্য নেই। এতে করে স্থান ও সময়ের মধ্যেকার পার্থক্য দূর করা হয়। ইউক্লিডীয় স্থানকালে স্থান এবং সময়ের দিক অভিন্ন; কিন্তু বাস্তব স্থানকালে (যেখানে সময়-স্থানাংকের মান বাস্তব) তা অভিন্ন নয় —এ ক্ষেত্রে সময়ের দিক অবশ্যই আলোক-শঙ্কুর* (light cone) ভেতরে হবে। সহজ ভাষায় বলা যায় যে এই অবাস্তব কাল এবং ইউক্লিডীয় স্থানকাল কেবলমাত্র গাণিতিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় যাতে করে বাস্তব সময়ে বিশ্বের আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। যাহোক মহাকর্ষের চিরায়ত তত্ত্বের ভিত্তি বাস্তব স্থানকাল এবং এক্ষেত্রে মহাবিশ্বের আচরণের দুটিমাত্র সম্ভাবনা থাকে : হয় এটি অনন্তকাল থেকে রয়েছে নতুবা এর সৃষ্টি হয়েছে অতীতের কোনো ব্যতিক্রমী বিন্দু বা সিংগুলারিটি থেকে। কিন্তু মহাকর্ষকে যদি কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে মেলানো যায় তবে তৃতীয় সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়। হকিং সেইটেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। যে ইউক্লিডীয় স্থানকাল ব্যবহৃত হচ্ছে সেখানে সময় ও স্থানের অভিমুখ একই, ফলে স্থানকালের বিস্তার সীমিত হলেও ব্যতিক্রমী বিন্দুর অস্তিত্ব এড়ানো যায়। অনেকটা পৃথিবীর পৃষ্ঠের মতো, স্থানে সীমিত হলেও এর কোনো সীমানা নেই। এর অর্থ এই যে, বিশ্ব পূর্ণাঙ্গভাবে স্ববহ এবং বহিস্থ কিছু দ্বারা প্রভাবিত নয়। এটি সৃষ্টও হবে না, ধ্বংসও হবে না। হকিঙের ভাষায় "It Would Just BE"।

---

* সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে আলোক-শঙ্কুর কল্পনা করা হয় এজন্য যে এই শঙ্কুর ভেতরে যদি জগৎ-রেখা বা ওয়ার্ল্ড-লাইন থাকে তাহলে দুটি ঘটনার মধ্যের বিভেদ বা সেপারেশান ধনাত্মক বা বাস্তব হবে।

হকিঙের এই নতুন প্রস্তাবনা অনুযায়ী স্থানকাল এমন একটি তল যার আয়তন সীমিত কিন্তু কোনো সীমানা নেই। এটাই হকিঙের বিখ্যাত *সীমানাহীনতার নীতি* (no-boundary principle)। সীমানাহীনতার শর্ত অনুযায়ী বিশ্ব অনেকটা ভূপৃষ্ঠের মতো —স্থানে সীমিত হলেও এর কোনো সীমা নেই। ভূ-পৃষ্ঠের উত্তর মেরু থেকে যতোই দক্ষিণ মেরুর দিকে যাওয়া যায় স্থির দূরত্বে অক্ষাংশ বৃত্তগুলো ততোই বাড়তে থাকে ; কারণ বিশ্ব কাল্পনিক সময়ে প্রসারমান। বিষুবীয় অঞ্চলে এ ধরনের বিশ্ব সর্বোচ্চ আয়তনে পৌঁছে এবং কাল্পনিক সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে সংকুচিত হয়ে একটি বিন্দুতে পৌঁছে (দক্ষিণ মেরু)। যদিও এই দুই মেরুতে বিশ্বের আয়তন শূন্য তথাপি এরা কিন্তু কোনো ব্যতিক্রমী বিন্দু নয় (যেমন পৃথিবীর দুই মেরু কোনো ব্যতিক্রমী বিন্দু নয়)। এভাবে দেখা যায় হকিঙের সীমানাহীনতার শর্ত মেনে নিলে বাস্তব সময়ে বিশ্ব প্রসারমান হয় কিন্তু এর আদিতে কোনো আপত্তিকর ব্যতিক্রমী বিন্দুর অস্তিত্ব থাকে না। ব্যতিক্রমী বিন্দুর অস্তিত্ব থাকলে যে সমস্যা হয় তা হলো এই যে, বিজ্ঞানের চিরায়ত আইনকানুন ঐ অঞ্চলে ভেঙে পড়ে। আর কাল্পনিক সময়ের কথা বিবেচনা করলে বিশ্বের আদিতে অবশ্যম্ভাবী ব্যতিক্রমী বিন্দুর অস্তিত্ব সহজেই এড়ানো যায়। এখানেই হকিঙের তত্ত্বের সবচেয়ে জোরালো আবেদন।

কাল্পনিক সময়ে বিশ্ব কোনো ব্যতিক্রমী বিন্দুর ভেতর দিয়ে যায় না। তাই বাস্তব সময় ও কাল্পনিক সময়ে বিশ্বের ইতিহাস আলাদা হয়। প্রায় বারো বিলিয়ন বছর আগে বিশ্বের আয়তন ছিল সর্বনিম্ন, কিন্তু কাল্পনিক সময়ের ইতিহাসে এর ব্যাসার্ধ হবে সর্বোচ্চ। অর্থাৎ বাস্তব সময়ে মনে হবে যে বিশ্ব কোনো ব্যতিক্রমী বিন্দুতে বিধ্বস্ত হয় ; কিন্তু কাল্পনিক সময়ে সেরকম কোনো ব্যতিক্রমী বিন্দু থাকে না। প্রশ্ন হতে পারে, কোনটি সত্য—বাস্তব সময় না কাল্পনিক সময়? প্রশ্নটি এ কারণে অর্থহীন যে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পর্যবেক্ষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্ব তৈরি করা। অধিকতর কার্যকর পরিভাষা তাই গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া যে সময়ের জন্য কাল্পনিক সময়ের ধারণা প্রয়োগ করা হচ্ছে সেসময়ে বিশ্ব ছিল অতি ক্ষুদ্র। এতো ক্ষুদ্র যে তখন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্য নিতে হয়। সঙ্গতকারণেই চিরায়ত ধারণাসমূহ এখানে কার্যকর হবে না। বলা হচ্ছে, বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এক অতি ক্ষুদ্র, অত্যুত্তপ্ত, অতিঘন ব্যতিক্রমী বিন্দুর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এবং সুপ্রচলিত মহাবিস্ফোরণ নকশার (Big Bang model) মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই। ব্যাপক পটভূমিতে বিশ্বের প্রসারণ এবং বিশ্বমঞ্চে পটভূমি বিকিরণের উপস্থিতি এই ধারণার জোরালো সমর্থন দিচ্ছে। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করতে গেলে বারবারই আমাদের ফিরে যেতে হচ্ছে অতি ক্ষুদ্রের জগতে। তাই তৈরি হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বের এক নতুন এবং শক্তিশালী শাখার—*কোয়ান্টাম কসমোলজি* বা *কোয়ান্টাম সৃষ্টিতত্ত্ব*। হকিং, হার্টল, ডিউইট, হেলিওয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম কসমোলজির রহস্য উদঘাটনে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন। হকিঙের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে যেখানে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতাগুলি পাওয়া যায় এবং ডাউনলোড করা যায়। আগ্রহী পাঠকের জন্যে ঐ সাইটটির ঠিকানা দেওয়া হলো : http ://www. damtp. cam. ac. uk/user/ hawking/

এবার একটি মহাজাগতিক বেলুনের কথা চিন্তা করা যাক যা সতত প্রসারিত হচ্ছে। এই বেলুনের পৃষ্ঠ আমাদের কাছে আপাতভাবে মসৃণ মনে হবে। কিন্তু যদি একটি শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করি তবে দেখব এর পৃষ্ঠ অত্যন্ত অমসৃণ। এর পৃষ্ঠকে অত্যন্ত কম্পমান মনে হবে, মনে হবে যেন কিছুটা অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতার কারণ কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা যার প্রবর্তন করেছিলেন হাইজেনবার্গ। কোয়ান্টাম স্তরে মহাজাগতিক বেলুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে, কিছুটা অনিশ্চিত। হকিং এবং তাঁর সহকর্মীরা বলছেন যে, ঐ অনিশ্চিত কোয়ান্টাম বেলুনের পৃষ্ঠে একটি অতিক্ষুদ্র ফাঁপা ও স্ফীত অংশের (buldge) জন্ম হয়। সাধারণ বেলুনের কোনো দুর্বল অংশে এরকম কোনো বাড়তি অংশ তৈরি হলে বেলুনটি ফেটে যায়। কিন্তু মহাজাগতিক বেলুনে ঐ স্ফীত অংশ থেকে জন্ম নেবে একটি নতুন শিশুবিশ্ব (baby universe)। কিন্তু ঘটনাটি ঘটবে কাল্পনিক সময়ে, তাই আমরা এটি কখনোই প্রত্যক্ষ করব না। এই শিশুবিশ্বের সাথে আমাদের মূল বিশ্বের সংযোগ থাকবে একটি অতিক্ষুদ্র 'নাড়ী'র সাহায্যে। এই অভিনব 'নাড়ী'র নাম ওয়র্মহোল (wormhole) যার ব্যাস মাত্র $১০^{-৩৫}$ মিটার। এই ওয়র্মহোলগুলি খুবই আজব জিনিস। এরা হঠাৎ হঠাৎ অস্তিবান হয়, আবার পরক্ষণেই অন্তর্হিত হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এই ওয়র্মহোলদের কারণেই মহাজাগতিক বেলুনের পৃষ্ঠে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এই ওয়র্মহোলের সাথে সংযুক্ত কোনো শিশুবিশ্ব ক্ষুদ্র জীবনকালের নাও হতে পারে এবং প্রসারিত হয়ে বর্তমান বিশ্বের অনুরূপ কোটি কোটি আলোকবর্ষ ব্যাসবিশিষ্ট হতে পারে। এ ধরনের কোয়ান্টাম-বিশ্ব যেকোনো জায়গায়, যেকোনো সময়ে জন্ম নিতে পারে। অনেকে মনে করেন, আমাদের বিশ্বও অনুরূপ কোনো অসীমসংখ্যক বিশ্বের অতলান্তিক গোলকধাধাঁর একটি ক্ষুদ্র অংশ। এরকম দুটি বিশ্ব পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকবে ওয়র্মহোলের সাহায্যে। এইসব ওয়র্মহোল আমাদের বিশ্বকে অন্য বিশ্বের সাথে যুক্ত করতে পারে ; আবার একই বিশ্বের এক অংশকে অন্য অংশের সাথে যুক্ত করতে পারে। আজকাল অনেক বিজ্ঞানীই মনে করছেন যে এই ওয়র্মহোল ব্যবহার করে টাইম-মেশিন তৈরি করা যায়। কিভাবে ওয়র্মহোলকে টাইম-মেশিন হিসেবে ব্যবহার করা যায় তা জানবার জন্যে আগ্রহী পাঠক কিপ থর্নের লেখা অসাধারণ মনোগ্রাফ 'Black Holes and Time Warps' পড়ে দেখতে পারেন। প্রয়াত কার্ল সেগান তাঁর বিখ্যাত বিজ্ঞান কল্পোপন্যাস 'কন্ট্যাক্ট'-এ এই আইডিয়া ব্যবহার করেছেন।

হকিং মনে করেন যে, এই ওয়র্মহোলদের কারণেই কণিকাদের ভর, আধান আর সুস্থির থাকে না। যেমন একটি ইলেকট্রন তার চলার পথে যদি কোনো ওয়র্মহোল পায় তবে ইলেকট্রনটি ঐ ওয়র্মহোলের ভেতর পড়ে যাবে এবং অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে। তখন আরেকটি ইলেকট্রন অন্য বিশ্ব থেকে বা সংযুক্ত অংশ থেকে এই বিশ্বে এসে পড়ে। কিন্তু আমরা দেখছি ইলেকট্রনটি সরলপথে চলছে। এভাবে ওয়র্মহোল ইলেকট্রনের উপর একটি অনিশ্চয়তা যোগ করছে। বলা হচ্ছে, কণিকাদের ভর, আধান, মহাজাগতিক ধ্রুবক—বিশ্বের এসব মৌলিক সংখ্যা আসলে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিশ্বসমূহের গোলকধাঁধার জ্যামিতিক আকৃতিরই ফলাফল।

কসমোলজি আজ এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে যেখানে কোনো তত্ত্বই আর আজব মনে হয় না। আজকাল এমনসব তত্ত্ব প্রস্তাবিত হচ্ছে যা কখনোই পর্যবেক্ষণে ধরা যাবে না। মনে রাখতে হবে, এসব তত্ত্ব কিন্তু মোটেও উর্বর মস্তিষ্কের অলস চিন্তা নয়। প্রতিটি তত্ত্বেই উচ্চতর গণিত ব্যবহৃত হয় এবং সেসব গণিতের ফলাফল সহজ ভাষায় প্রকাশ করাও দুরূহ। সুকঠিন তত্ত্বকে সবার জন্য বোধগম্য করতে হলে নানারকম অ্যানালজি বা উদাহরণ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু অ্যানালজি থেকে বেশি দূর এগুনো যায় না ; আর তাই অ্যানালজি থেকে সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে অনেকেই নানারকম সাধারণীকরণে পৌঁছে যান। এটা অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক এবং অনভিপ্রেত ঘটনা। মনে রাখতে হবে তত্ত্বকে অবশ্যই গণিতের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে।

আর যাই হোক আজব কথা বললেই তো আর 'তত্ত্ব' হয়ে যায় না!!

বস্তুকণার গভীরে

বলা হচ্ছে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এক অতি ঘন, অত্যুত্তপ্ত, অতি ক্ষুদ্র ব্যতিক্রমী বিন্দুর প্রবল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। ব্যাপক পটভূমিতে (large scale) বিশ্বের প্রসারণ এবং বিশ্বমঞ্চে পটভূমি বিকিরণের অস্তিত্ব এই মহাবিস্ফোরণ নকশার সমর্থন দিচ্ছে। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব কর্তৃক প্রদত্ত এই ব্যতিক্রমী বিন্দুতে পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত জানা আইন ভেঙে পড়ে। কারণ অতিক্ষুদ্রের জগতে চিরায়ত বিজ্ঞান অকেজো। কাজেই এসময়কার যথার্থ ভৌত বিবরণ পেতে হলে আমাদের প্রয়োজন পড়বে কোয়ান্টাম ক্রিয়াসমূহের এবং অবশ্যই কণাপদার্থজ্ঞানের (particle physics)।

বস্তু কী? এটি কী দিয়ে তৈরি? এর জবাব খোঁজার প্রচেষ্টা শুরু হয় সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে। আধুনিক পরমাণু জগতের শুরু ঊনবিংশ শতকের জন ডাল্টনের তত্ত্ব দিয়ে। তিনি ডেমোক্রিটাস ও ভারতীয় দার্শনিক কণাদের কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেন যে 'পরমাণু' (atom) মৌলের অবিভাজ্য একক। ১৮৯৭ সালে টমসন এই পরমাণুরও গঠনোপাদান ঋণাত্মক আধানযুক্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন—যার ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ২০০০ ভাগের ১ ভাগ। ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখান যে পরমাণুর একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্রীন (nucleus) আছে যাতে পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত থাকে। তিনি সৌরজগতের আদলে পরমাণুর একটি নকশা দেন যাতে কেন্দ্রীনকে ঘিরে ইলেকট্রন ঘূর্ণ্যমান। অবশ্য কেন্দ্রীনে থাকে ধনাত্মক আধানের প্রোটন এবং আধানহীন নিউট্রন (যা স্যাডউইক আবিষ্কার করেন, যেকোনো পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সংখ্যা সমান, নিউট্রন সংখ্যার তারতম্য হলে আইসোটোপ পাওয়া যায়)। এর কিছু সমস্যা ছিল যা নীল্‌স্ বোর দূর করেন। তিনি ইলেকট্রনের জন্য শক্তির ভিত্তিতে কিছু অনুমোদিত কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দেন। ইলেকট্রন যখন এই কক্ষপথে চলে তখন কোনো শক্তি নির্গত হয় না। কেবল যদি এক শক্তিস্তর থেকে অন্য শক্তিস্তরে চলে যায় তবেই শক্তি নির্গত হতে পারে। কক্ষস্থ একটি ইলেকট্রনকে ৪টি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এদের বলে কোয়ান্টাম সংখ্যা। মজার ব্যাপার হলো যেকোনো দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা কখনোই অভিন্ন হবে না। এই নীতিটিকে বলে পাউলি'র বর্জন নীতি। অবশ্য সমারফিল্ড দেখিয়েছেন যে ইলেকট্রনের কক্ষপথ উপবৃত্তাকারও হতে পারে।

চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার একটি হলো স্পিন বা ঘূর্ণন সংখ্যা। অর্থাৎ আহিত কণার ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্টি হয় চৌম্বকক্ষেত্রের। সুবিধার খাতিরে বলা হয় ইলেকট্রনের ঘূর্ণন হতে পারে ঘড়ির কাঁটার দিকে অথবা উল্টোদিকে। এজন্য ইলেকট্রনের স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা $+\frac{১}{২}$ ও $-\frac{১}{২}$। বলে রাখা ভালো যে কণার এই 'ঘূর্ণন' প্রচলিত অর্থে ঘূর্ণন নয়। এটা বন্‌বন্ করে ঘোরে না। অতিক্ষুদ্র কণার পক্ষে এ ধরনের আচরণ সম্ভব নয়। এটা আসলে একটা সুবিধাজনক নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ঘূর্ণনের ধারণাটি সম্পূর্ণ গণিতনির্ভর। যাহোক কোনো

কণার স্পিন হতে পারে অর্ধ-পূর্ণসংখ্যার (যেমন $\frac{১}{২}, \frac{৩}{২}$) আবার হতে পারে পূর্ণসংখ্যার (যেমন ০, ১, ২)। প্রথম শ্রেণীর কণাদের বলা হয় ফার্মিয়ন বা ফার্মি কণা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কণা হলো বোসন বা বোস-কণা। ফার্মি কণা হলো ইলেকট্রন, এরা বর্জন নীতি মেনে চলে; সমস্ত জড়বস্তু ফার্মি কণা দিয়ে তৈরি। অন্যদিকে বোস কণা বর্জন নীতি মেনে চলে না। যাবতীয় বল বা মিথস্ক্রিয়া বোস-কণা দ্বারা বাহিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের একদা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামানুসারে বোস কণাদের নাম রাখা হয় বোসন। এটা বাঙালির জন্য এক পরম গর্বের বিষয় এবং যতোদিন বস্তুকণার অস্তিত্ব থাকবে ততোদিন বসুর নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হবে। বস্তুকণার স্পিনের ভিত্তিতে এই দুই শ্রেণীতেই এদের ফেলা যায়।

মিথস্ক্রিয়াগতভাবে কণাপরিবারকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। একদলের নাম হ্যাড্রন (Hadron), অন্যদলের নাম লেপ্টন (Lepton)। আমরা জানি, প্রকৃতির মৌলিক বল চারটি—সবল ও দুর্বল কেন্দ্রীন বল, বিদ্যুৎ-চৌম্বক এবং মহাকর্ষ বল। প্রথম তিনটি বলই পরমাণুর জগতে সক্রিয়। যে সমস্ত কণা সবল মিথস্ক্রিয়া (Strong force or interaction) প্রদর্শন করতে পারে তারাই হ্যাড্রন। প্রোটন, নিউট্রন হলো হ্যাড্রন পরিবারভুক্ত। হ্যাড্রনকে দুভাগে ভাগ করা যায়—ভারি ও হাল্কা কণা (Baryons and Mesons)। প্রোটন, নিউট্রন হলো ভারি কণা ; কিন্তু পায়ন, কেয়ন হলো হাল্কা কণা। কতগুলো হ্যাড্রন কণার উদাহরণ হলো ঃ প্রোটন, নিউট্রন, পাই-মেসন (পায়ন), কে মেসন (কেয়ন), ল্যাম্বডা-ক্যাসকেড-সিগমা হাইপেরন। এগুলো আসলে বিভিন্ন ভর ও শক্তির কণার নামমাত্র।

অন্যদিকে লেপ্টন কণা সবল বল ভিন্ন অন্য সব বলের সাথেই বিক্রিয়া করে। সুপরিচিত লেপ্টন সদস্য হলো ইলেকট্রন। এছাড়া মিউ এবং টাও লেপ্টনও আছে। এরা বেশ ভারি। প্রত্যেকের সাথে আবার সংশ্লিষ্ট নিউট্রিনো কণা আছে। নিউট্রিনো কণার ভর নেই তবে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে এটি একেবারে ভরশূন্য।

দেখা যাচ্ছে যে, লেপ্টন পরিবারের সদস্য মাত্র ছয়। অথচ হ্যাড্রনদের সদস্যসংখ্যা অজস্র—দুশোরও বেশি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে হ্যাড্রন কি সত্যিই মৌলিক? সম্প্রতি প্রস্তাবনা এসেছে হ্যাড্রনরা মৌলিক নয় বরঞ্চ কোয়ার্ক নামক ক্ষুদ্র কণার আবদ্ধ অবস্থা। লেপ্টন যেমন ছয়টি, কোয়ার্কও তেমনি ছয়টি। এভাবে প্রকৃতির কণাপরিবারে এক চমৎকার নান্দনিক প্রতিসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কুহকিনী কোয়ার্ক ঃ লেপ্টনদের কোনো অভ্যন্তরীন গঠন নেই, এ অর্থে এরা মৌলিক। কিন্তু হ্যাড্রন সে অর্থে মৌলিক নয়। এদের সদস্যসংখ্যা ২০০র বেশি। ১৯৬২ সালে মারে গেলমান ও ইউভাল নী'মান গাণিতিক প্রতিসাম্য ব্যবহার করে তিনটি মৌলিক কণার প্রস্তাব করেন। গেলমান এদের নাম দেন কোয়ার্ক। বলা হলো, প্রতিটি ভারি কণা তিনটি করে কোয়ার্ক এবং প্রতিটি হাল্কা কণা একটি কোয়ার্ক ও একটি প্রতিকোয়ার্ক সমন্বয়ে গঠিত হবে। কিন্তু লেপ্টন মাত্র ছ'টি অথচ কোয়ার্ক তিনটি। প্রতিসাম্যের

খাতিরে এটা বিসদৃশ। প্রকৃতি সবসময়ে সৌন্দর্যপ্রিয় এবং প্রতিসম। কাজেই পরবর্তী গবেষণায় আরো তিনটি কোয়ার্ক আবিষ্কৃত হলো। ফলে কোয়ার্কও ছয়টি, লেপ্টনও ছয়টি—এটাই মৌলিক কণার প্রতিসাম্য। কোয়ার্ক ছয়টি হলো—আপ ($+\frac{২}{৩}$), ডাউন ($-\frac{১}{৩}$), স্ট্রেঞ্জ ($-\frac{১}{৩}$), চার্ম ($+\frac{২}{৩}$), বটম ($-\frac{১}{৩}$), টপ ($+\frac{২}{৩}$) কোয়ার্ক। বন্ধনীতে চার্জ দেয়া আছে। লক্ষণীয় যে চার্জ ভগ্নাংশ। এতে অবাক হবার কিছু নেই; ইলেকট্রনের চার্জই নিম্নতম—এমন কোনো কথা নেই। তাহলে প্রোটন হবে $—p^+$ = আপ + আপ + ডাউন, এবং পায়ন $^+$ = আপ + প্রতি ডাউন। এভাবে অন্যান্য হ্যাড্রন গঠিত হবে। কোয়ার্কের একটি খুব মজার ধর্ম আছে। এটি হচ্ছে 'রঙ'। এর সাথে সাধারণ অর্থের রঙের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণ গাণিতিক একটি ধর্ম। তবে দৈনন্দিন রঙের সাথে এই ধর্মের সাদৃশ্য আছে। যেহেতু সাধারণ বস্তুকণার কোনো 'রঙ' নেই, অর্থাৎ এরা 'সাদা' বা 'বর্ণহীন', সেহেতু কোয়ার্কসমূহ অবশ্যই তিনটি রঙের হবে— লাল, সবুজ, নীল। প্রোটনের তিনটি কোয়ার্ককে তিনটি ভিন্ন রঙের হতে হবে নতুবা 'বর্ণহীন' প্রোটন হবে না। আবার পায়নের ক্ষেত্রে একটি কোয়ার্ক যদি লাল রঙের হয় সেহেতু অন্য কোয়ার্কটি অবশ্যই হবে প্রতিলাল (anti-red)। এই পুরো ব্যাপারটি ভীষণ জটিল। বলা হচ্ছে, কোয়ার্ক কখনো মুক্তভাবে দেখা যাবে না। কারণ যেহেতু আমাদের সমস্ত বস্তুকণা 'বর্ণহীন' এবং যেহেতু সমস্ত কোয়ার্ক 'রঙিন' কাজেই কোয়ার্ককে কখনো 'রঙহীন' করে দেখা যাবে না। হয়ত কুহকিনী কোয়ার্ক পরমাণুর অন্দরমহলে চিরবন্দিনী হয়েই রইবে। হয়ত ভবিষ্যতে (উচ্চশক্তির কোনো এক্সপেরিমেন্টে) রঙে ঝলমল পরমাণু কেন্দ্রীনের অবগুণ্ঠনবতী নেপথ্যবাসিনী কোয়ার্ক তার অবগুণ্ঠন খুলে লাজুক চোখে প্রকৃতির দেখা পাবে।

প্রকৃতির বলচতুষ্টয়

প্রকৃতির বস্তুসমূহের মধ্যে ক্রিয়াশীল মৌলিকতম বলের সংখ্যা চার। মাত্র চারটি মৌলিক বলই বিশ্বজগতের তাবৎ মিথস্ক্রিয়া (interaction) নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বসৃষ্টির মুহূর্তের সঠিক বর্ণনায় অবশ্যই চারটি বলের সাথে পরিচিতি থাকতে হবে। যেকোনো বলের (force) সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র থাকে (field)। এটা ক্ষেত্রতত্ত্বের স্বীকার্য। ক্ষেত্র হচ্ছে এমন কিছু যা স্থান-কাল ব্যাপী পরিবর্তনশীল। ক্ষেত্রের ধারণা সম্পূর্ণ বিমূর্ত। ক্ষেত্রকে কণায়িত করা যায় কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব অনুযায়ী। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রবাহী নিজস্ব কণিকা আছে। এটুকুন জানলেই আপাতত চলবে।

মহাকর্ষ (Gravitation) ঃ মহাকর্ষ দূরপাল্লার, কিন্তু অবপারমাণবিক স্তরে যেখানে অন্য তিনটি বল শক্তিশালী সেখানে সবচাইতে দুর্বল। ব্যাপক-পটভূমিতে মহাকর্ষের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করে নিউটনের মহাকর্ষ আইন। এর সমীকরণ রূপ হচ্ছে, $F = G\, m_1\, m_2 / r^2$; m_1 ও m_2 বস্তুদ্বয়ের ভর, r এদের দূরত্ব, G ধ্রুবক। এই সমীকরণের সাথে আমাদের পরিচয় মাধ্যমিক স্তরের নবম-দশম শ্রেণী থেকে। আইনস্টাইন মহাকর্ষের নিউটনীয় তত্ত্বকে পরিমার্জিত করে সার্বজনীনতা দান করেন। মহাকর্ষের এই পরিশীলিত রূপটিই পাওয়া যায় সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে। মহাশূন্যে গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ, গ্রহদের কক্ষপথ এসবই নির্ভর করে মহাকর্ষ সূত্রের ওপর। মহাকর্ষবাহী কণিকার নাম গ্রাভিটোন, এটি আলোর বেগে ধাবিত হয়, ভর শূন্য। পরীক্ষণে একে এখনো পাওয়া যায়নি।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল (Electro-magnetic force) ঃ বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তিকে একীভূত করেন ম্যাক্সওয়েল তাঁর সুবিখ্যাত চারটি সমীকরণ দিয়ে। মহাকর্ষের মতো বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল কুলম্বের ব্যস্ত-বর্গ আইন মেনে চলে ঃ $F = q_1\, q_2 / r^2$; q_1 ও q_2 হচ্ছে আধান বা মেরুশক্তি। এই আইনের পরিচয় আমরা পাবো উচ্চমাধ্যমিক স্তরে। এটিও দূরপাল্লার, তবে পরমাণুর স্তরেও যথেষ্ট শক্তিধর। বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ সম্পর্কে ম্যাক্স প্লাংক কোয়ান্টাম তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। এটি অনেক উচ্চতর বিষয়। বিদ্যুৎ-চৌম্বক মিথস্ক্রিয়াবাহী কণার নাম ফোটন।

দুর্বল / ক্ষীণ বল (Weak interaction) ঃ ১৯৩০ সাল থেকে বস্তুর তেজস্ক্রিয়তার জন্য দুর্বল কেন্দ্রীন বলকে দায়ী করা হয়। তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে কিছু বস্তুর স্বতঃবৃত্ত ভাঙন (spontaneous decay)। দুর্বল বল আসলে যেকোনো ধরনের ভাঙনের জন্য দায়ী। বিশেষ একটি উদাহরণ দেয়া যাক। নিউট্রন কণা ভেঙে প্রোটন, ইলেকট্রন ও প্রতি-নিউট্রিনো তৈরি হয়। যে ধরনের ভাঙনে ইলেকট্রন নির্গত হয় তাদের বলে বিটা ভাঙন। এর জন্যেও দুর্বল বল দায়ী। ১৯৬৭ সালে আব্দুস সালাম ও স্টিফেন ভাইনবার্গ দেখান যে দুর্বল বল ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল আসলে একটি একক বলের দুই ভিন্নরূপ। যথোপযুক্ত উচ্চশক্তিতে এ দুটি বল একীভূত থাকে। সেই একীভূত বল বহন করে চারটি কণা। এদের একটি ফোটন, বাকি তিনটি হলো $W^{\pm}$, Z°। এদেরকে আবিষ্কার করা হয়েছে। ফোটনের তুলনায় এই তিনটি কণা অত্যন্ত ভারি।

সবল বল (Strong interaction) ঃ প্রকৃতির বলচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বল। এটি কেবল পরমাণুর স্কেলেই ক্রিয়া করে অর্থাৎ $১০^{-১৫}$ মিটারই হলো এর পাল্লা বা সীমা। সবল বলের কারণেই প্রোটন ও নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রে (নিউক্লিয়াস) ঘনসংবদ্ধ থাকে। যেহেতু সবল বল বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের চাইতেও শক্তিশালী, সেহেতু প্রোটনসমূহের বিকর্ষণ সত্ত্বেও এরা একত্রিত থাকে। আবার প্রোটনের মধ্যে যে কোয়ার্ক আছে তাও সবল বলের কারণে আবদ্ধ থাকে। এবং সবল বল এতোটাই শক্তিশালী যে প্রোটন বা নিউট্রন (বা হ্যাড্রন) ভেঙে মুক্ত কোয়ার্ক কোনোদিনই বোধহয় পাওয়া যাবে না। কোয়ার্কসমূহ নিজেদের মধ্যে গ্লুয়ন নামক কণা বিনিময় করে। এটি সবল বলের ক্ষেত্রকণা। অবশ্য প্রোটন-নিউট্রন পাই-মেসন বিনিময় করে। কিন্তু পাই মেসন আবার কোয়ার্ক নির্মিত এবং গ্লুয়ন দ্বারা আবদ্ধ।

সবল বলের শক্তিমাত্রা যদি ১ হয় তবে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল হবে $\frac{১}{১৩৭}$; দুর্বল বল হবে $১০^{-৫}$ এবং মহাকর্ষ বল হবে $১০^{-৩৯}$ । দেখাই যাচ্ছে এদের শক্তিমাত্রার কতোখানি পার্থক্য। সালাম-ভাইনবার্গ-গ্ল্যাশো গণিতের দলতত্ত্ব (গ্রুপ থিওরী) ব্যবহার করে দেখিয়েছেন দুর্বল ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল অভিন্ন। একইভাবে সবল বলকে দলতত্ত্বের মাধ্যমে এদের সাথে একীভূত করে দেয়া যায় অত্যুচ্চ শক্তিতে ($\approx ১০^{১৫}$ জি. ই. ভি.)। এই পরিমাণ শক্তি পৃথিবীতে তৈরি করা সম্ভব নয়। সমস্যা হচ্ছে এই তিন একীভূত বলের সাথে মহাকর্ষের একীভবন সম্ভব হচ্ছে না। আইনস্টাইন মনে করতেন যে চারটি বলই আসলে কোনো একটি একক বলের বহিঃপ্রকাশ। বিজ্ঞানীদের কাছে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে এই একীভূত বলচুতষ্টয়। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের এ এক 'সোনার হরিণ' যাকে ধরেও ধরা যাচ্ছে না, নাগালের মাঝে পেয়েও সে যেন নাগালহীন। কবিগুরুর সাথে একই সুরে যেন পদার্থবিজ্ঞানীরাও গাইছেন ঃ

তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই।
ও সেই মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই।।
সে-যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা।
সে-যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে লাগায় চোখে ধাঁদা।
আমি ছুটব পিছে, মিছে-মিছে পাই বা নাহি পাই—

সৃষ্টির মাহেন্দ্র ক্ষণে

আমরা জেনেছি যে মহাবিস্ফোরণ নকশা মতে বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল একটি অতি ঘন, অত্যুত্তপ্ত, অতিক্ষুদ্র ব্যতিক্রমী বিন্দুর প্রবল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। বিশ্বের পর্যবেক্ষিত অধিকাংশ ঘটনাবলীর সাথে এই নকশা যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। বহুল পরিচিত এবং ব্যাপক সমর্থিত মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের আলোকে এবার সৃষ্টির পরম পবিত্র মাহেন্দ্র ক্ষণের একটি রূপরেখা তৈরি করা যায়। এ সময়ে অবশ্য কেবল তত্ত্বের ভাবনাই চলতে পারে। তাই একে 'ভাবচিত্র' বলাই অধিক সঙ্গত। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার, বিশ্বের প্রথম মুহূর্তগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কল্পনাতীতভাবে ক্ষুদ্র সময়কালে বিশ্বে ঘটে যেতে পারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আবার কয়েক মিলিয়ন বছরের সময়কালেও হয়ত তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে।

টাইম জিরো

এটি বিশ্বের একেবারে শূন্যতম সময় থেকে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর্যন্ত সময়কাল নির্দেশ করে। $১০^{-৪৪}$ সেকেন্ড সময়কে বলা হয় প্লাংকের সময়। প্ল্যাংকের সময়ের পূর্বে কী ঘটে থাকতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, কারণ পদার্থবিজ্ঞানের বিধিসমূহ প্ল্যাংক সময় পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ায়। এর বেশি আর এগোনো সম্ভব নয়। কারণ পরম একীভূত বলের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। কারণ মহাকর্ষকে প্রকৃতির অপর তিনটি বলের সাথে একীভূত করা সম্ভব হয়নি।

$১০^{-৪৪}$ সে. থেকে $১০^{-৩৫}$ সে.

এই অতি ক্ষুদ্র সময় ব্যবধানে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল প্রায় $১০^{২৭}$ কেলভিন। এই সময়ে প্রকৃতির তিনটি বল—সবল ও দুর্বল কেন্দ্রীয় বল এবং বিদ্যুৎ চৌম্বক বল একীভূত ছিল বলে মনে করা হয়। এ সময়ে বিশ্বের আকার ছিল $১০^{-২৪}$ সেন্টিমিটার। এই ক্ষুদ্র সময় ব্যবধানে বিশ্ব হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত গুণিত হারে বেড়ে যায়। একে বলে Inflation বা স্ফীতি। এই স্ফীতির ফলে বিশ্বের ব্যাসার্ধ বেড়ে যায় $১০^{৫০}$ গুণ। স্ফীতি কী করে হয় তা ব্যাখ্যাত হয় কণাপদার্থবিজ্ঞানের 'প্রতিসাম্য ভাঙন' নামক একটি প্রতিভাস দিয়ে।

$১০^{-৩৫}$ সে. থেকে $১০^{-১০}$ সে.

এ সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা অনেকখানি কমে যায়। সবল বল আলাদা হয়ে যায় কিন্তু অন্য দুটি বল একীভূত থাকে। বিশ্বের তাপমাত্রা দাঁড়ায় $১০^{১৫}$ কেলভিনে। এ সময়ে বিশ্বের আয়তন দাঁড়ায় প্রায় সৌরজগতের মতো ($১০^{১০}$ মিটার)।

$১০^{-১০}$ সে. থেকে ৩ মিনিট

এই সময় ব্যবধানে দুর্বল ও বিদ্যুৎচৌম্বক বলও পৃথক হয়ে যায়। অর্থাৎ এ সময়কার বিশ্বে চারটি বলই পৃথক অবস্থায় ছিল। আমরা জেনেছি যে মুক্ত কোয়ার্ক কখনো দেখা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এই সময়টাতেই মুক্ত কোয়ার্ক থাকা সম্ভব। এর পরপরই

সৃষ্টির মাহেন্দ্র ক্ষণে

আমরা জেনেছি যে মহাবিস্ফোরণ নকশা মতে বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল একটি অতি ঘন, অত্যুত্তপ্ত, অতিক্ষুদ্র ব্যতিক্রমী বিন্দুর প্রবল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। বিশ্বের পর্যবেক্ষিত অধিকাংশ ঘটনাবলীর সাথে এই নকশা যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। বহুল পরিচিত এবং ব্যাপক সমর্থিত মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের আলোকে এবার সৃষ্টির পরম পবিত্র মাহেন্দ্র ক্ষণের একটি রূপরেখা তৈরি করা যায়। এ সময়ে অবশ্য কেবল তত্ত্বের ভাবনাই চলতে পারে। তাই একে 'ভাবচিত্র' বলাই অধিক সঙ্গত। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার, বিশ্বের প্রথম মুহূর্তগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কল্পনাতীতভাবে ক্ষুদ্র সময়কালে বিশ্বে ঘটে যেতে পারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আবার কয়েক মিলিয়ন বছরের সময়কালেও হয়ত তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে।

টাইম জিরো

এটি বিশ্বের একেবারে শূন্যতম সময় থেকে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর্যন্ত সময়কাল নির্দেশ করে। $১০^{-৪৪}$ সেকেন্ড সময়কে বলা হয় প্লাংকের সময়। প্ল্যাংকের সময়ের পূর্বে কী ঘটে থাকতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, কারণ পদার্থবিজ্ঞানের বিধিসমূহ প্ল্যাংক সময় পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ায়। এর বেশি আর এগোনো সম্ভব নয়। কারণ পরম একীভূত বলের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। কারণ মহাকর্ষকে প্রকৃতির অপর তিনটি বলের সাথে একীভূত করা সম্ভব হয়নি।

$১০^{-৪৪}$ সে. থেকে $১০^{-৩৫}$ সে.

এই অতি ক্ষুদ্র সময় ব্যবধানে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল প্রায় $১০^{২৭}$ কেলভিন। এই সময়ে প্রকৃতির তিনটি বল—সবল ও দুর্বল কেন্দ্রীয় বল এবং বিদ্যুৎ চৌম্বক বল একীভূত ছিল বলে মনে করা হয়। এ সময়ে বিশ্বের আকার ছিল $১০^{-২৪}$ সেন্টিমিটার। এই ক্ষুদ্র সময় ব্যবধানে বিশ্ব হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত গুণিত হারে বেড়ে যায়। একে বলে Inflation বা স্ফীতি। এই স্ফীতির ফলে বিশ্বের ব্যাসার্ধ বেড়ে যায় $১০^{৫০}$ গুণ। স্ফীতি কী করে হয় তা ব্যাখ্যাত হয় কণাপদার্থবিজ্ঞানের 'প্রতিসাম্য ভাঙন' নামক একটি প্রতিভাস দিয়ে।

$১০^{-৩৫}$ সে. থেকে $১০^{-১০}$ সে.

এ সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা অনেকখানি কমে যায়। সবল বল আলাদা হয়ে যায় কিন্তু অন্য দুটি বল একীভূত থাকে। বিশ্বের তাপমাত্রা দাঁড়ায় $১০^{১৫}$ কেলভিনে। এ সময়ে বিশ্বের আয়তন দাঁড়ায় প্রায় সৌরজগতের মতো ($১০^{১০}$ মিটার)।

$১০^{-১০}$ সে. থেকে ৩ মিনিট

এই সময় ব্যবধানে দুর্বল ও বিদ্যুৎচৌম্বক বলও পৃথক হয়ে যায়। অর্থাৎ এ সময়কার বিশ্বে চারটি বলই পৃথক অবস্থায় ছিল। আমরা জেনেছি যে মুক্ত কোয়ার্ক কখনো দেখা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এই সময়টাতেই মুক্ত কোয়ার্ক থাকা সম্ভব। এর পরপরই

কোয়ার্কসমূহ আবদ্ধ হয়ে কণা তৈরি করে। ফলে এই সময়কার বিশ্ব বেশ সহজ হয়ে পড়ে। এবং বিশ্বে সমস্ত কণিকাসমূহ তৈরি যায়। তবে পরমাণু তৈরি হতে পারে না। কারণ তাপমাত্রা তখনো যথেষ্ট বেশি। এ সময়ে বিশ্ব ছিল অনচ্ছ। বিকিরণ ও কণা পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করত।

৩ মিনিট থেকে ৫ লক্ষ বছর

মহাবিস্ফোরণের ৩ মিনিট পর তাপমাত্রা অনেক কমে যায়। এই তাপমাত্রায় পরমাণু কেন্দ্রীন গঠন সম্ভব। প্রথম তৈরি পরমাণু কেন্দ্রীন হলো হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন। হাইড্রোজেনে একটি প্রোটনকে ঘিরে একটি ইলেকট্রন ঘূর্ণ্যমান। কিন্তু ইলেকট্রন বিকিরণের সাথে বা অন্য মুক্ত ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষ করে। ফলে শুধু হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন তৈরি হয়, পরমাণু তৈরি হতে পারে না। ৩ মিনিট সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা ছিল সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তাপমাত্রার ৭০ গুণ।

৫ লক্ষ বছর থেকে নিকট অতীত

এ সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা আরো কমে যায়। ৭ লক্ষ বছরের শুরুতে ইলেকট্রন আবদ্ধ হয়ে পরমাণু গঠন সম্পন্ন হয়। ফলে বিকিরণ আর বিক্রিয়া করবার মতো মুক্ত ইলেকট্রন না পাওয়ায় বিশ্ব আলোকভেদ্য হয়ে উঠল। পরমাণু তৈরি হবার পর ভরের ঘনীভবন (concentration) শুরু হলো। ধূলিকণাকে আশ্রয় করে যেমন মেঘমালা তৈরি হয়, ঠিক তেমনি ছোট ছোট বস্তুজোটকে আশ্রয় করে আরো বস্তু জমতে থাকে। এবং এভাবে ক্রমশ গ্যালাক্সি, নীহারিকা তৈরি হয়। এরপর নক্ষত্র তৈরি সুপরিচিত ঘটনা। তবে গ্যালাক্সি তৈরির ব্যাপারটি এখনো রহস্যময়। ঠিক কীভাবে ভরের ঘনীভবন শুরু হয় তা স্পষ্ট নয়। ধীরে বিশ্বের চেহারা চিরায়ত রূপ নেয়। ৭ থেকে ১০ লক্ষ বছরের মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৪-৫ হাজার কেলভিন। ব্যাস হলো এক কোটি আলোকবর্ষ।

বর্তমান

এই সমস্ত ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়েই বিশ্ব আমাদের চিরচেনা জগতের রূপ নিয়েছে। বর্তমানে বিশ্ব প্রসারমান এবং আদিম সেই তাপমাত্রার অবশেষ হলো ৩ ডিগ্রী কেলভিন পটভূমি বিকিরণ।

প্রশ্ন করা যেতে পারে , মহাবিস্ফোরণের আগে কী ছিল? এ প্রশ্নটি অর্থহীন এ কারণে যে স্বয়ং স্থান-কালেরই সৃষ্টি হয়েছে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে, কাজেই তার 'আগে' বলতে কিছু বোঝায় না। 'নেগেটিভ সময়' বলে কোনোকিছুর বাস্তব অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সময়ের নিজেরই যেখানে শুরু তার আবার অতীত কী করে সম্ভব!

এই হচ্ছে বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম কয়েক মুহূর্ত। ভাবতে অবাক লাগে যে অত্যল্প সময় ব্যবধানে অকল্পনীয় দ্রুততার সাথে অভাবনীয় সব ঘটনাক্রম সংঘটিত হয়েছে। এই ছন্দোবদ্ধ, সুনিপুণ প্রকৃতির লীলার ফলশ্রুতি আজকের রূপ-রস-গন্ধে ভরা এই প্রিয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

মহাবিশ্বের নিয়তি

মহাবিশ্বের সৃষ্টির মুহূর্তের কথা আমরা জেনেছি। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মাবলীর কথাও আমরা আলোচনা করেছি (যেমন- বিশ্বের প্রসারণ, তারার জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি)। এখন তাই প্রশ্ন জাগে, মহাবিশ্বের অন্তিম নিয়তি কী? এর পরিণতি কী হবে? আমাদের পরিণতিই বা কী হবে? দুর্ভাগ্যবশত এই সব প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠিক আমাদের জানা নেই। কেউ জানে না এই বিশ্বের বা আমাদের চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে। তবে হ্যাঁ; একেবারেই যে কিছু জানি না তাও আবার নয়। বিশ্বের নিয়তি নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। এবার আমরা সেটাই দেখব যে বিশ্বের সম্ভাব্য নিয়তি কী হতে পারে।

বিশ্বের নিয়তির প্রশ্ন এর সৃষ্টির সাথে জড়িত। কীভাবে? বিশ্বের সৃষ্টি ঠিক কীভাবে হয়েছে তা জানা না থাকলে নিয়তির কথা ভাবা যাবে না। কারণ সৃষ্টির সেই পরম পবিত্র মাহেন্দ্র ক্ষণে বিশ্বের অবস্থা ঠিক কীরকম ছিল সেটাই পরবর্তীতে এর নিয়তি নির্ধারণ করে। তাই আমরা বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বগুলোর পুনরালোচনা করছি। ১৯২২ সালে রুশ বিজ্ঞানী আলেকজান্দার ফ্রিডম্যান আইনস্টাইনের ক্ষেত্রসমীকরণের একটি বিশেষ সমাধান প্রকাশ করেন। ওঁর মূল স্বীকার্যটি মেনে নিলে বিশ্বের সম্ভাব্য ৩টি মডেল পাওয়া যায়—১. বিশ্ব যথেষ্ট ধীরভাবে প্রসারমান, একসময়ে প্রসারণ বন্ধ হবে এবং সংকোচন শুরু হবে, ফলে বিশ্বের সমাপ্তি ঘটবে। এই বিশ্বের বক্রতা ধনাত্মক। ২. বিশ্ব এতো দ্রুত প্রসারমান যে প্রসারণ কখনোই বন্ধ হয় না; এ বিশ্বের বক্রতা ঋণাত্মক। ৩. বিশ্বের প্রসারণ এমন যে তা কখনো সংকুচিত হবে না, অর্থাৎ প্রসারণ ক্রান্তিক মানের; এই বিশ্বের বক্রতা শূন্য। এইসব মডেলের আলোকে বিশ্বের নিয়তি আলোচনা করার আগে আমাদের জানতে হবে বিশ্বের ধর্মাবলী কী কী। বলা হচ্ছে, বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ১২ বিলিয়ন বছর আগে ঘটে যাওয়া এক বিশাল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে যাকে আমরা মহাবিস্ফোরণ বা বিগ-ব্যাং বলি। এই মহাবিস্ফোরণ মডেলকে আমরা প্রামাণ্য ধরে নেই। এর সপক্ষে তিনটি প্রমাণ আছে - সেই বিস্ফোরণের ফলে বিশ্বের পর্যবেক্ষিত প্রসারণ, বিস্ফোরণের অবশেষ হিসেবে রয়ে যাওয়া পটভূমি বিকিরণ যার তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রী কেলভিন এবং পর্যবেক্ষিত হাইড্রোজেন-হিলিয়াম অনুপাত। এবার বিশ্বের বক্রতা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এ বিষয়টি বিশ্বের নিয়তির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

আমরা প্রায়ই অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির কথা শুনি। এখানে অবশ্য বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে স্থানের বক্রতা শূন্য - অর্থাৎ কোনো ত্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি দুই সমকোণ। কিন্তু অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে স্থান সমতল নয়, বাঁকা। স্থানের বক্রতা দুরকমের হতে পারে—ধনাত্মক বা ঋণাত্মক। ধনাত্মকভাবে বাঁকা স্থানে ত্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি দুই সমকোণের তুলনায় বেশি এবং ঋনাত্মকভাবে বাঁকা স্থানে তা কম। ধনাত্মক বক্রতার স্থানের উদাহরণ গোলকের (পৃথিবীর) পৃষ্ঠ আর ঋণাত্মক বক্রতার উদাহরণ ঘোড়ার জিনের পৃষ্ঠ।

এখন আমরা বিশ্বের নিয়তির কথায় আসি। যদি বিশ্ব প্রসারণের পর আবার সংকুচিত হয় তবে সে বিশ্বকে আবদ্ধ বিশ্ব (ক্লোজ্‌ড ইউনিভার্স) এবং অনন্ত প্রসারমান হলে তাকে উন্মুক্ত বিশ্ব (ওপেন ইউনিভার্স) বলে। কিন্তু কীভাবে জানা সম্ভব বিশ্ব আবদ্ধ না উন্মুক্ত? এটা বিশ্বের বক্রতার উপর নির্ভরশীল। আবদ্ধ বিশ্বের বক্রতা ধনাত্মক, কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্বের বক্রতা শূন্য অথবা ঋণাত্মক। নীতিগতভাবে মহাবিশ্ব কীরকম বাঁকা তা স্থানীয়ভাবে কোনো গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করে বলে দেওয়া সম্ভব। স্থানের বক্রতা জানা থাকলে ফ্রিডম্যান মডেল থেকে বিশ্বের নিয়তি নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু বিশ্বের বক্রতা এতোই ব্যাপক কাঠামোর যে এমনকি গ্যালাক্সি স্কেলেও তার বক্রতা নির্ণয় একান্তই দুঃসাধ্য।

তাহলে কীভাবে জানা যাবে বিশ্বের নিয়তি? বেশ কয়েকটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পদ্ধতি আছে যার সাহায্যে জানা যায় বিশ্বের অন্তিম নিয়তি কী। একটি উপায় হচ্ছে বিশ্বের মন্দন পরিমাপ। মন্দন কেন হয়? আমরা জানি যে বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু গ্যালাক্সিসমূহ পরস্পরকে মহাকর্ষ বলের সাহায্যে আকর্ষণ করছে। আর তাই এই প্রসারণের হার কমে আসছে। এই মন্দনের হার নির্ভর করে বিশ্বে পদার্থের গড় ঘনত্বের উপর। এখন বিশ্বকে আবদ্ধ করতে যে পরিমাণ পদার্থের প্রয়োজন তার ঘনত্বকে সংকট ঘনত্ব বলে। বর্তমান ঘনত্ব আর সংকট ঘনত্বের অনুপাতকে *ঘনত্ব প্যারামিটার* বলে; এর কোনো মাত্রা নেই কারণ এটি কেবল একটি অনুপাত মাত্র। একে গ্রীক অক্ষর ওমেগা (Ω) দিয়ে লেখা হয়। এই অনুপাত যদি ১ এর কম বা সমান হয় তাহলে বিশ্ব উন্মুক্ত এবং বেশি হলে আবদ্ধ হবে। মন্দন মাপা যায় কীভাবে? যেকোনো দুটি গ্যালাক্সির অরীয় বেগ মেপে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে একজন মানুষের সারা জীবনেও এই গতিবেগের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না যাতে করে মন্দন সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বিশ্বের বয়স নির্ণয় করেও এর নিয়তি সম্পর্কে জানা যায়। গ্যালাক্সির গুচ্ছস্তবকে দৃশ্যমান লালচে বা বয়োবৃদ্ধ তারাদের বয়স নির্ণয় করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। এখান থেকে হিসাব করে বিশ্বের যে বয়স পাওয়া যায় তা হলো ৮ থেকে ১৬ বিলিয়ন বছর। অবশ্য এই মান বিশ্বের বয়সের নিম্নসীমা ও উর্ধ্বসীমা নির্দেশ করে। বয়সের এই মান থেকে অংক কষে বিশ্বের নিয়তির হদিস পাওয়া যায়। বিশ্বের পদার্থের গড় ঘনত্ব নির্ণয় করেও এ সমস্যার সমাধান করা যায়। ঘনত্ব নির্ণয় করার নিয়ম হলো—কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের স্থানে গ্যালাক্সির সংখ্যা গণনা করে তারপর তাদের ভর দিয়ে গুণ দিয়ে এবং তারপর ঐ স্থানের আয়তন দিয়ে ভাগ করলে গড় ঘনত্ব পাওয়া যায়। এভাবে হিসাব করে বর্তমান ঘনত্বের যে মান পাওয়া যায় তা সংকট ঘনত্বের ১০ শতাংশের মতো হয়। অর্থাৎ বিশ্ব হবে উন্মুক্ত। কিন্তু গ্যালাক্সিস্তবকের অন্তর্ভুক্ত গ্যালাক্সিসমূহের বেগ পর্যবেক্ষণ করে এদের যে ভর পাওয়া যায় তা দৃশ্যমান ভরের অন্তত পাঁচ গুণ। এই অতিরিক্ত ভর এলো কোথা থেকে? এ ধরনের পদার্থকে কোনো পদ্ধতিতেই সনাক্ত করা যায় না; তাই এদের বলে *ডার্ক ম্যাটার* বা অদৃশ্য বস্তু। এ ধরনের পদার্থ সনাক্ত করা গেলে বিশ্বের নিয়তি নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। নিচের চিত্রে বিশ্বের সম্ভাব্য পরিণতি দেখানো হয়েছে। (কামানের গোলা ভূমি থেকে নিক্ষিপ্ত করলে যদি এর বেগ বেশি থাকে তবে তা আর ফিরে আসে না; আর যদি বেগ কম থাকে তবে তা একটি অধিবৃত্তাকার পথে ফিরে আসে; ঠিক সেরকমভাবে বিশ্বের নিয়তিও নিচের ৩টি ছবিতে বোঝানো হয়েছে।)

বিশ্বের সম্ভাব্য নিয়তি

	উন্মুক্ত	সংকট	আবদ্ধ
ঘনত্ব প্যারামিটার, Ω	$\Omega < 1$	$\Omega = 1$	$\Omega > 1$
স্থানের জ্যামিতি	বক্রতা ঋণাত্মক	শূন্য বক্রতা	বক্রতা ধনাত্মক
বিশ্বের নিয়তি	অনন্ত প্রসারণ	অনন্ত প্রসারণ	সংকোচন এবং ধ্বংস 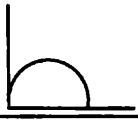

এতোক্ষণ আমরা দেখলাম বিশ্বের সম্ভাব্য নিয়তি কী হতে পারে এবং তা জানার উপায়ই বা কী? এখন সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করব এই সম্ভাব্য মডেলগুলোয় বিশ্বের অবস্থা কী রকম হবে। বিশ্ব যদি উন্মুক্ত হয় তাহলে কী হবে? এটা যদিও ভবিতব্যের বিষয় তবু পদার্থবিজ্ঞানের জানা আইনগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা এর সম্ভাব্য অবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। অবশ্য এর জন্য আমাদের কোনো জ্যোতিষের দ্বারস্থ হতে হয় নি; হবেও না কোনোদিন। উন্মুক্ত বিশ্বে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে পারে। প্রথমত, সব নক্ষত্রের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য এই পরিস্থিতিতে আসতে এখনো অনেক বাকি। অবশেষে এরা সাদা বামন, নিউট্রন তারা অথবা কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে। কোন তারার শেষ পরিণতি কী হবে তা নির্ভর করে তারার ভরের উপর। এ সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়ত, সমস্ত নক্ষত্র তাদের গ্রহগুলোকে পরিত্যাগ করবে। কীভাবে এটি ঘটে তা ব্যাখ্যা করা বেশ জটিল। এখানে সে আলোচনা আমরা মূলতুবি রাখছি। অংক কষে গ্রহ পরিত্যাগের সময়কাল হিসাব করা যায়। একইভাবে গ্যালাক্সি থেকেও নক্ষত্র বিতাড়িত হবে। এই ঘটনার জন্য মূলত তারায় তারায় সংঘর্ষের ঘটনা দায়ী। তৃতীয়ত, গ্যালাক্সিসমূহ তাদের অধিকাংশ তারা হারিয়ে ফেলবে এবং বাকি পদার্থ ঘনীভূত হয়ে এদের কেন্দ্রে বিশাল কৃষ্ণবিবরের সৃষ্টি করবে। এই প্রক্রিয়ায় একটি গ্যালাক্সিস্তবকের কেন্দ্রে একটি সুবিপুল এবং সুবিশাল কৃষ্ণবিবর তৈরি হবে। ফলে এই ঘটনার পর বিশ্বে অবশিষ্ট থাকবে অতিভারি কৃষ্ণবিবর, সাদা বামনতারা, নিউট্রন তারা এবং তারার অবশেষ হিসেবে রয়ে যাওয়া কৃষ্ণবিবর। চতুর্থত, উপরোক্ত ঘটনাবলীর পরে যে ঘটনাটি ঘটবে তা অত্যন্ত জটিল একটি বিষয় এবং সেটা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে এই সময় পর প্রোটন ভাঙন ঘটবে (যদি তা সত্য হয়)। এই বিষয়টির অবতারণা করতে হলে কণাপদার্থবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে, তাই আমরা এখানে এর আলোচনা উহ্য রাখছি। প্রোটন ভাঙনের পর অবশিষ্ট থাকে ইলেকট্রন, পজিট্রন এবং ফোটন কণা। শেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো কৃষ্ণবিবরের বাষ্পীভবন। এই ঘটনা প্রথম ব্যাখ্যা করেন বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং। ওঁর মতে কৃষ্ণবিবরসমূহ অত্যন্ত ক্ষীণ হারে বিকিরণ করে এবং তার ভর যতো বেশি হবে বিকিরণের হারও ততো কম। আর তাই অংক কষে কৃষ্ণবিবরের বাষ্পীভবনের যে

সময়কাল নির্ণয় করা হয়েছে তা রীতিমতো কল্পনাতীত। এসব ঘটনার পর বিশ্বে অবশিষ্ট থাকে ইলেকট্রন-পজিট্রন গ্যাস, ফোটন, নিউট্রিনো ইত্যাদি। এছাড়া থাকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাদা বামন ও নিউট্রন তারা। স্মর্তব্য যে উন্মুক্ত বিশ্ব অসীমকাল ব্যাপী প্রসারমান। পদার্থবিজ্ঞানীরা অবশ্য আশা করেন যে সাদা বামন এবং নিউট্রন তারা পর্যাপ্ত দীর্ঘকাল পর কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে। এবং তারাও হকিং-বিকিরণের মাধ্যমে একসময়ে উবে যাবে। নিচে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময়কাল দেয়া হলো। এটি হিসাব করেছেন ফ্রিম্যান ডাইসন।

বিশ্ব ত্বরিত হারে প্রসারিত হলে সম্ভাব্য নিয়তি		মহাবিস্ফোরণের প্রথম কয়েক মুহূর্ত, বছর
	স্থান ও কালের আবির্ভাব :	$১০^{-৫১}$
	মহাজাগতিক স্ফীতি :	$১০^{-৪৪}$
	বিদ্যুৎ-চৌম্বকত্বের আবির্ভাব :	$১০^{-১৮}$
	পরমাণু কেন্দ্রীনের উদ্ভব :	$১০^{-৫}$
		মহাবিস্ফোরণের পর, বছর
	প্রশম পরমাণুর উদ্ভব :	$১০^{৫}$
	প্রথম নক্ষত্রের উদ্ভব :	$১০^{৬}$
	সূর্যের উদ্ভব :	৩×১০^{৯}
	স্ফীতির পুনরাবির্ভাব, বিশ্বের দৃশ্যমান অংশের হ্রাস :	৫×১০^{৯}
	বর্তমান :	১.২×১০^{১০}
	সূর্যের মৃত্যু :	১.৫×১০^{১০}
	গিবন্‌স্-হকিং তাপমাত্রায় বিশ্বের শীতলীভবন :	৭×১০^{১১}
	স্থানীয় স্তবকের বহিস্থ গ্যালাক্সিসমূহের দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া :	৫×১০^{১২}
	নক্ষত্র সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সমাপ্তি :	$১০^{১৪}$
	নক্ষত্রের গ্রহ পরিত্যাগ :	$১০^{১৫}$
	গ্যালাক্সীসমূহের কৃষ্ণবিবরে রূপান্তর :	$১০^{৩০}$
	চলতি হারে শক্তি গ্রহণের ফলে গ্যালাক্সীয় জ্বালানি নিঃশেষ :	$১০^{৩৭}$
	কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়ায় পদার্থের ভাঙন :	$১০^{৬৫}$
	ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সংযোগে নতুন পদার্থের সংশ্লেষণ :	$১০^{৮৫}$
	গ্যালাক্সীয় কৃষ্ণবিবরদের উবে যাওয়া :	$১০^{৯৮}$

ফ্রিম্যান ডাইসনের গণনাকৃত উন্মুক্ত বিশ্বের সময়পঞ্জি		
	কম ভরের নক্ষত্রের শীতল হবার সময়কাল :	$১০^{১৪}$
	নক্ষত্র থেকে গ্রহ পরিত্যাক্ত হবে :	$১০^{১৫}$
	গ্যালাক্সি থেকে নক্ষত্র পরিত্যাক্ত হবে :	$১০^{১৯}$
	মহাকর্ষীয় বিকিরণের মাধ্যমে কক্ষপথের পতন :	$১০^{২০}$
	হকিং বিকিরণের ফলে কৃষ্ণবিবরের বাষ্পীভবন :	$১০^{৬৪}$
	পরম শূন্য তাপমাত্রায় পদার্থের ভাঙন :	$১০^{৬৫}$
	সকল পদার্থের লৌহে রূপান্তর :	$১০^{১৫০০}$
	সকল পদার্থের কৃষ্ণবিবরে রূপান্তর :	$১০^{১০^{২৬}}$
	সকল নক্ষত্রের কৃষ্ণবিবর/নিউট্রন তারায় রূপান্তর :	$১০^{১০^{৭৬}}$

এবার আমরা আলোচনা করব আবদ্ধ বিশ্বের কথা। এ বিশ্বে প্রসারণের পর শুরু হবে সংকোচন। তারপর হবে মহাসংকোচন বা বিগ-ক্রাঞ্চ। প্রসারণ একসময়ে সর্বোচ্চ হবে। এ ধরনের বিশ্বের স্থায়িত্বকাল নিয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে। এক্ষেত্রে পটভূমি বিকিরণের তাপমাত্রা প্রসারণের দশায় কমতে থাকে এবং সংকোচনের দশায় বাড়তে থাকবে। এরপরের ঘটনাবলী বিশ্ব সৃষ্টির পর হতে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তারই পুনরাবৃত্তি হবে এবং একসময় বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। মহাসংকোচন বা Big Crunch এর পর কী ঘটবে? এই প্রশ্নটি বেশ খিটমিটে। এক অর্থে মহাসংকোচনেই যেহেতু স্থান এবং কাল দুটোরই (আপাত) ধ্বংস সূচিত হয় সেহেতু তারপর কী ঘটবে তা জিজ্ঞেস করা অর্থহীন; কারণ তার আর 'পর' নেই। আবার যেহেতু বিগক্রাঞ্চ সিংগুলারিটিতে আমাদের জানা ভৌতবিধিসমূহ ভেঙে পড়ে তাই তারপর কী ঘটবে বা আদৌ কিছু ঘটবে কিনা সেটা আমরা জানি না। তাছাড়া মহাসংকোচনে যে বিশাল কৃষ্ণবিবরের আবির্ভাব হয় সেটার ধ্বংস কীভাবে ঘটে তা আমাদের জানা নেই। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে কোনো এক অজ্ঞাত প্রক্রিয়ায় সমস্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া আবার শুরু হবে। অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংস একটি চক্র মেনে চলে (হয়ত তা পর্যায়ক্রমিক)। হয়ত এই চক্রের পর্যায় অসীম। আসলে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর এখনো জানা যায়নি। তবে গবেষণা কিন্তু থেমে নেই।

আমাদের জানা মতে বিশ্বে পদার্থের গড় ঘনত্ব ৭·৫ × $১০^{-৩২}$ গ্রাম/সি. সি.। কিন্তু সংকট ঘনত্ব ৫ × $১০^{-৩০}$ গ্রাম/সি. সি.। অর্থাৎ প্রতি ঘনমিটারে মাত্র ৩ থেকে ১০ টি হাইড্রোজেন পরমাণু। কিন্তু যদি অদৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব সত্যি হয় তাহলে পদার্থের ঘনত্ব বেড়ে যাবে এবং অবধারিতভাবে বিশ্বের নিয়তি নির্ধারিত হবে। এখন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ যা বলছে তা হলো আমরা যে বিশ্বে বাস করি তার জ্যামিতি ইউক্লিডীয়, স্থান সমতল, ঘনত্ব প্যারামিটারের মান ১ এর কম, এবং বিশ্ব অনন্ত প্রসারমান। বিশ্বের নিয়তি তাই এখনো অনির্ধারিত। জ্যোতিঃপদার্থবিদরা নিরলস গবেষণা করে চলেছেন সম্ভাব্য কয়েকটি

মডেলের মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে। হয়ত তার আগেই আমাদের নিজেদের নিয়তিই নির্ধারিত হযে যাবে। বিশ্বের নিয়তিতো নির্ধারিত হয়েই আছে; কেবলি আমাদের জানার অপেক্ষায় দিন গুণছে। বিশ্বের নিয়তি সৃষ্টির সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে, কারণ তখন যে পরিমাণ পদার্থ (অদৃশ্য বা দৃশ্যমান) সৃষ্টি হয়েছিল সেটাই বিশ্বের অন্তিম নিয়তি ঠিক করে রেখেছে। তাহলে কি সবই পূর্বনির্ধারিত? ওমর খাইয়ামের ভাষায়:

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই
সৃষ্টিকর্ত্রী প্রলয়রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।।

বহির্বিশ্বে প্রাণ

বহির্বিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ ? এ প্রশ্ন যেকোনো চিন্তাশীল মানুষকেই ভাবিয়ে তোলে। কিন্তু এর নিশ্চিত উত্তর কেউ জানে না। আজ পর্যন্ত বহির্বিশ্বে প্রাণীর অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই সুবিপুল বিশ্বের লক্ষ-কোটি তারার মেলায় এমন কোনো তারা কি কোথাও নেই যার কোনো গ্রহে প্রাণের স্ফূরণ ঘটেনি ? এই প্রশ্নের একটি না-বোধক উত্তর সহজে মেনে নেওয়া যায় না। আমরা আগেই দেখেছি, আমাদের এই আকাশগঙ্গা কিংবা মিল্কি-ওয়ে ছায়াপথে তারার সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি। গড়ে যেকোনো গ্যালাক্সির তারার সংখ্যা প্রায় দশ হাজার কোটি; আর এ রকম গ্যালাক্সির সংখ্যাও প্রায় দশ হাজার কোটি। তাহলে বিশ্বে তারার সংখ্যা প্রায় $১০^{১১} \times ১০^{১১} = ১০^{২২}$। এই অভাবনীয় তারার মেলায় আমরাই একমাত্র প্রাণী তা কিন্তু ভাবা যায় না।

প্রাণীর বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে? সহজ করে বলতে গেলে এগুলো হলো বিপাক (পুষ্টি, শ্বসন, রেচন), চলন, বৃদ্ধি, উদ্দীপনাজাত প্রতিক্রিয়া, অভিযোজনের ক্ষমতা, প্রজনন এবং ছন্দোবদ্ধতা। আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের মূল উপাদান হলো: কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন। এ মৌলগুলো বিশ্বের সর্বত্রই যথেষ্ট পরিমাণে সুলভ হলেও প্রাণের আবির্ভাব সবখানে হয়নি। কারণ এদের বিশেষ সমাবেশই প্রাণের বিকাশে সাহায্য করে। সঠিক পরিবেশে সঠিক যৌগের উপস্থিতিতে সঠিক জৈব অনুঘটকের সাহায্যেই কেবল প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব। কার্বন অণুর বিশেষ ধর্ম হলো এই যে এটি সহজেই অন্য অণুর সাথে যুক্ত হয়ে বিশাল অণুর শৃংখল তৈরি করে। সিলিকনেরও এরকম যুক্ত হওয়ার সহজাত প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কার্বনের ভিত্তিতে তৈরি জৈব যৌগই পৃথিবীর পরিচিত প্রাণের প্রধান গঠনোপাদান। মজার ব্যাপার এই যে কার্বনের এসব জৈব যৌগ আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানের গ্যাসমেঘেও পাওয়া গেছে। হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, ফরমালডিহাইড, নানা রকমের অ্যালকোহল এবং পানিসহ প্রায় ৪০ রকমের জৈব যৌগ এ অঞ্চলে পাওয়া গেছে। উচ্ছল প্রাণের জন্য আরো প্রয়োজন শক্তির একটি উৎস যা প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখে। এসব উপাদানের একত্র সমাবেশ ঘটলেই প্রাণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা তাই চেষ্টা করছেন এরকম উপযোগী পরিবেশ খুঁজে বের করে প্রাণের সম্ভাবনা যাচাই করতে। তাছাড়া বেশ কিছু ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ডে পাওয়া গেছে জীবনের জন্যে অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড যা নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরির প্রধান উপাদান। কাজেই অনেকেই আজ ধারণা করছেন যে পৃথিবীতে প্রাণের জন্য অপরিহার্য জৈব যৌগের আবির্ভাব বোধহয় মহাশূন্য থেকেই হয়েছে। আরো একটি ব্যাপার এই যে প্রাণের মৌলিক যে উপাদানগুলির কথা উপরে বলা হয়েছে তাদের নির্দিষ্ট সমাবেশেই কেবল জটিল অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি সম্ভব; কিন্তু ঐ বিশেষ সমাবেশটি ঘটার সম্ভাবনা অনেক কম। তাই বলা হয় এই বিশ্বে আমাদের এই ফুটন্ত চঞ্চলতার জীবন আসলে একটি প্রান্তিক সম্ভাবনার ব্যাপার। পৃথিবীর বাইরে যে এই প্রান্তিক সম্ভাবনা ঘটবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কাজেই বহির্বিশ্বে প্রাণের সন্ধান মহাকাশ বিজ্ঞানের এক জরুরি দায়িত্ব।

সৌরজগতে প্রাণের সন্ধান

এ পর্যন্ত আমাদের জানা মতে পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যা প্রাণের কোলাহলে মুখরিত হয়েছে। অবশ্য মঙ্গল নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, বর্তমানে মঙ্গলে প্রাণের কোনো স্পন্দন পাওয়া না গেলেও দূর অতীতে সেখানে অন্তত অণুজীবের বিকাশ ঘটেছিল। পূর্বের ভয়েজার ও সম্প্রতি গ্যালিলিও এবং মঙ্গলে পাথফাইন্ডারের মিশন থেকে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে যার সাহায্যে দূরের গ্রহগুলিতে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার আগে প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত শর্তাবলী জানা প্রয়োজন। যেমন নক্ষত্র থেকে দূরত্ব, তাপমাত্রা, জলীয় দ্রাবকের (যেমন পানি, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি) উপস্থিতি, নক্ষত্রের জীবনকাল ইত্যাদি। নক্ষত্রের চারিদিকে যে বলয় প্রাণের জন্য উপযোগী তাকে *ইকোসিস্টেম* বলে। এই ইকোসিস্টেমের দূরত্ব নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। প্রাণের উপযোগী তাপমাত্রা যদি ২০০ থেকে ৩৭৩ কেলভিন ধরা হয় তাহলে দেখা যায় যে সূর্যের ক্ষেত্রে এই ইকোসিস্টেমের বিস্তৃতি ০.৬ থেকে ১.৯ জ্যোতির্বিদ্যার একক (জ্যোতির্বিদ্যার একক হলো সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব)। আরো উজ্জ্বল তারার ক্ষেত্রে এই বিস্তৃতি আরো বেশি। যেমন লুব্ধকের ক্ষেত্রে এই বিস্তৃতি ২.৮ থেকে ৯.৭ জ্যোতির্বিদ্যার একক। কিন্তু লুব্ধকের জীবনকাল সূর্যের তুলনায় অনেক কম। আসলে বেশি উজ্জ্বল তারা কম সময়ের মধ্যেই তাদের সব জ্বালানি পুড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়—কাজেই কম উজ্জ্বল ও শীতল তারাই প্রাণের বিকাশের জন্য বেশি উপযোগী। সৌরজগতের ক্ষেত্রে দেখা যায় পৃথিবী ছাড়া শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ প্রাণের জন্য বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বুধ সূর্যের এতো কাছে যে এখানে প্রাণের বিকাশের কোনো সম্ভাবনাই নেই।

শুক্র : যদিও শুক্রগ্রহকে পৃথিবীর যমজবোন বলা হয় তথাপি এটি প্রাণের জন্য তেমন উপযোগী নয়। কারণ এর পুরু মেঘস্তর। পুরু মেঘের জন্য শুক্রের পৃষ্ঠে তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৭০০ কেলভিন এবং চাপ পৃথিবীর ১০০ গুণ। এই পুরু মেঘস্তরে প্রধানত থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং কার্বনিল সালফাইড। সহজেই বোঝা যায় এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে প্রাণের বিকাশ সম্ভব নয়। কিন্তু আজ থেকে চার বিলিয়ন বছর আগে এই চরম অবস্থা ছিল বলে মনে হয় না। তখন সূর্যের তাপমাত্রা ছিল এখনকার তুলনায় ৩০% কম। তাই তখন শুক্রের পৃষ্ঠতাপমাত্রা ছিল পৃথিবীর এখনকার পৃষ্ঠতাপমাত্রার চেয়ে ১০০ ডিগ্রি সে. বেশি। এই তাপমাত্রায়ও প্রাণ সৃষ্টি সম্ভব— কেননা একইরকম তাপমাত্রায় পৃথিবীতে উষ্ণ-প্রস্রবণ কিংবা সমুদ্রতলের ভেন্টে বেশ কিছু জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াকে দেখা গেছে। পরে যখন সূর্যের তাপমাত্রা বেড়ে যায় তখন শুক্রের পৃষ্ঠস্থ পানি বাষ্পাকারে উড়ে যায় এবং মেঘ তৈরি করে। এই মেঘের কারণে গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে শুক্রের তাপমাত্রা বাড়তেই থাকে। এই প্রক্রিয়ায় আরো পানি বাষ্পীভূত হয়, আরো মেঘ তৈরি হয় যা তাপমাত্রাকে অধিকতর অসহনীয় করে তোলে। পজিটিভ ফিডব্যাকের এই প্রক্রিয়ার ফলেই আজ শুক্রগ্রহ একদম *খটখটে নটবর*।

মঙ্গল : সম্প্রতি মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে জোর গবেষণা শুরু হয়েছে। কিন্তু সমস্যা এই যে এর পৃষ্ঠের তাপমাত্রার সর্বোচ্চ মান ২২০ কেলভিন যা পানির জমাটাংকের ৫৩ কেলভিন নিচে। এই অতীব নিম্ন তাপমাত্রার জন্যে সেখানে কোনো প্রাণের প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ না থাকলেও আদিতে অন্তত অণুজীবের অস্তিত্ব থাকার জোরালো সম্ভাবনা আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে গিওভান্নি শিয়াপারেল্লি প্রথম মঙ্গলে জালের মতো রেখার অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করেন। পরে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জ্যোতির্বিদ পার্সিভাল লোয়েল এগুলোকে বুদ্ধিমান মঙ্গলবাসীদের দ্বারা খননকৃত খাল বলে অভিহিত করেন। পরবর্তীতে ভাইকিং নভোযানের অভিযানের পরে এ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব কেবল কল্পকাহিনীকারদের গল্পেই সীমাবদ্ধ ছিল। অতিসম্প্রতি ১৯৯৬ সালে ন্যাসার জনসন স্পেস সেন্টার এবং স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা অ্যান্টার্কটিকায় প্রাপ্ত একটি উল্কাপিণ্ডকে মঙ্গল থেকে আগত বলে প্রমাণ করেন এবং তাতে বহুপূর্বে মৃত ৩৮০ ন্যানোমিটার দীর্ঘ অণুজীবের ফসিল আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। এই বিখ্যাত উল্কাপিণ্ডের নাম ALH84001। একে ১৯৮৪ সালে অ্যান্টার্কটিকায় পাওয়া গিয়েছিল এবং এর ওজন হলো ১.৯ কিলোগ্রাম। এটি ছাড়াও আরো অনেক উল্কাপিণ্ডকে মঙ্গল থেকে আগত বলে সনাক্ত করা গেছে। এদের অক্সিজেন আইসোটোপের বন্টন এবং অন্যান্য খনিজের উপস্থিতি থেকে এদেরকে মঙ্গলেরই অংশ বলে সনাক্ত করা গেছে। ঐ বিশেষ উল্কাপিণ্ডটিতে কার্বন-১৩ আইসোটোপের আধিক্য দেখা গেছে যা মঙ্গলের বাতাবরণের প্রভাবে হয়েছিল বলে মনে হয়। যে কারণে এই উল্কাপিণ্ডটিকে মঙ্গলের প্রাণের জাদুঘর বলে অভিহিত করা হচ্ছে তার প্রথম কারণ হলো এর কার্বনেটের বর্তুলগুলোয় (globules) ম্যাগনেসাইট ($MgCO_3$) ও সাইডেরাইটের ($FeCO_3$) প্রাধান্য যা পৃথিবীতে দুর্লভ। এছাড়া মিহি ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4) ও সালফাইডের গুড়োও দেখা যায়। বিশেষ করে ম্যাগনেটাইটকে চেইনের আকারে সজ্জিত দেখা গেছে যা প্রায়শই পৃথিবীর ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। কারণ যখন তারা পানি থেকে লোহা ও অক্সিজেন তৈরি করে তখন তারা এধরনের কেলাস গঠন করে যা নিজেদেরকে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র বরাবর সজ্জিত রাখে। দ্বিতীয় কারণ, ঐ উল্কাপিণ্ডে প্রাপ্ত কার্বনের বিশেষ জৈব যৌগের উপস্থিতি। এই বিশেষ ধরনের যৌগটির নাম পলিসাইক্লিক অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন যার অবশ্য রয়েছে অনেক রকমভেদ। কার্বনেটের বর্তুলের সাথে এই যৌগটির উপস্থিতিই বিজ্ঞানীদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাছাড়া অতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে তা পার্থিব জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াদের দ্বারা কৃত জৈবক্রিয়ার অনুরূপ। অবশ্য এই ব্যাখ্যার সাথে সবাই একমত নন। অনেক ভূ-তাত্ত্বিক এই সব মাইক্রো-বস্তুকণার অজৈব এবং পার্থিব উৎসের সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। তাই প্যাথফাইন্ডার কর্তৃক বিশ্লেষিত মঙ্গলের মাটির উপর আরো অধিক

গবেষণার প্রয়োজন যাতে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্বের বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গিয়েছে যারা ভূ-পৃষ্ঠের অনেক নিচে আলো ও অক্সিজেন বিহীন অঞ্চলে দিব্যি বেঁচে আছে। এরা ভূগর্ভের তাপকে কাজে লাগায়। এদের বলে *থার্মোফিলিক বা তাপ-সন্ধানী ব্যাকটেরিয়া*। এদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে অনেকেই আজকাল বলছেন যে মঙ্গলের পৃষ্ঠের গভীরে হয়ত এধরনের ব্যাকটেরিয়ার আবাস থাকতে পারে। মঙ্গলে সম্প্রতি তরল পানি প্রবাহের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই মঙ্গলে অণুজীবের উপস্থিতির জোরালো সম্ভাবনা আছে।

মঙ্গলের চেয়ে দূরবর্তী অন্যান্য গ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা অনেক কম—কারণ এদের তাপমাত্রা অনেক কম এবং এদের গঠন অনেকটা সূর্যের অনুরূপ। তাছাড়া এরা পূর্বোল্লিখিত ইকোসিস্টেমেরও বাইরে। তবে লক্ষণীয় যে এদের বাতাবরণে অ্যামোনিয়া, মিথেন এবং পানি পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ করে বৃহস্পতির বাতাবরণে পানি, অ্যামোনিয়া, মিথেন, অ্যাসিটিলিন, ইথেন ও ফসফিন পাওয়া গেছে। বিভিন্ন মেঘস্তরের ভেতরে বজ্রবিদ্যুতের কারণে এসব জৈবযৌগের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়। অতিসম্প্রতি গ্যালিলিও নভোযান বৃহস্পতি এবং এর উপগ্রহ ইউরোপাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। এ থেকে এই অঞ্চলের গঠনোপাদানগুলি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

ইউরোপা : ইউরোপা বৃহস্পতির সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহ এবং আমাদের চাঁদের চেয়ে কিছু ছোট। এর পৃষ্ঠভাগ আগাগোড়া বরফে মোড়া। কিন্তু এর অভ্যন্তরভাগে রয়েছে তরল পানির এক মহাসমুদ্র যা যুগপৎ তেজস্ক্রিয় ক্ষয় এবং জোয়ার-বলজনিত তাপমাত্রার কারণে প্রাণের জন্য বিশেষ উপযোগী বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। গ্যালিলিও নভোযান কর্তৃক খুব কাছ থেকে নেওয়া ছবি বিশ্লেষণ করে (অনেকটা পৃথিবীর মতো) বরফের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ড দেখা গেছে। মনে হয় যেন এরা বরফের কোনো বড়ো টুকরো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুদূর ভেসে এসে আবার জায়গায় জমে গিয়েছে। কিন্তু এটা নিশ্চিত নয় যে ওরা অপেক্ষাকৃত নরম উষ্ণ বরফের ওপর দিয়ে পিছলে সরে এসেছে নাকি তরল পানির ওপর দিয়ে ভেসে এসেছে। তবে পৃষ্ঠে উল্কাপাতের ফলে সৃষ্ট খাতের লক্ষণীয় অভাব থেকে একথা বলা যায় যে ইউরোপার পৃষ্ঠভাগ সর্বক্ষণই নতুন বরফ দিয়ে আবৃত হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, এই বরফ আসছে কোত্থেকে— পৃষ্ঠের নিচ থেকে নাকি নিচের পানি জমে বরফ হয়ে? বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে ইউরোপার অভ্যন্তরভাগ সম্ভবত আগ্নেয়-সক্রিয়। এই তাপমাত্রাকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করে এখানে প্রাণের বিকাশ হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

বৃহস্পতির অন্য দুটি উপগ্রহ - ক্যালিস্টো এবং গ্যানিমিডে যদিও জমাট পানি এবং অন্যান্য জৈবযৌগ পাওয়া গিয়েছে; তথাপি এদের প্রয়োজনীয় তাপের কোনো উৎস নেই। তাই এদের প্রাণ ধারণেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। এছাড়া শনির সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহ টাইটানে রয়েছে জৈবযৌগের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এর পুরু বাতাবরণে রয়েছে নাইট্রোজেন,

মিথেন এবং ইথেন। এই মিথেন সূর্যালোকে ভেঙে গিয়ে জৈবযৌগের লম্বা চেইন তৈরি করে। টাইটানের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৯৪ কেলভিন– যা প্রাণের জন্য অপরিহার্য তরল পানি থাকার পক্ষে কিংবা অনালোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করার পক্ষে অতীব শীতল। সৌরজগতের অপরাপর গ্রহের মধ্যে মঙ্গল এবং ইউরোপাই আমাদের জানামতে সম্ভাব্য স্থান যেখানে প্রাণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই উপস্থিত আছে।

বহির্বিশ্বে প্রাণ : সূর্য ছাড়া আমাদের ছায়াপথের অন্য কোনো নক্ষত্রে প্রাণ বিকশিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। আমাদের ছায়াপথের চল্লিশ হাজার কোটি তারার মাঝে কি আর কোনো তারা নেই যার রয়েছে পৃথিবীর মতো রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে ভরপুর একটি গ্রহ? আমাদের গ্যালাক্সি ছাড়াও যে অগণিত গ্যালাক্সি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই বা কী হবে? "মহাকাশে যে দুটি গ্যাসের সর্বাধিক প্রাচুর্য রয়েছে সে দুটো হলো হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। জীবদেহেও হাইড্রোজেন পরমাণু আছে প্রচুর পরিমাণে। আর হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন মিলে হয় পানি, এছাড়া হাইড্রোজেনের আরো ক্ষমতা রয়েছে- হাইড্রোজেন কার্বনের সাথে মিলিত হয়ে নানারকম যৌগিক পদার্থের (হাইড্রোকার্বন) জন্ম দিতে পারে। এজন্যেই একে বলা হয় জীবনের ভিত্তি।.... মহাকাশে যেসব নতুন তারকার জন্ম হচ্ছে সেসব তারকার মেঘমণ্ডলে যেসব গ্যাস আছে সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো হাইড্রোজেন, কার্বন, হিলিয়াম, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণু। এসব পরমাণু দ্বারা এমন কিছু অণুর সৃষ্টি হয় যেগুলো প্রাণ সৃষ্টির সহায়ক। এগুলোর মধ্যে কিছু সরল যৌগিক পদার্থ রয়েছে যেগুলো পারস্পরিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লাইসিন নামে একধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মহাকাশের অবস্থা সর্বত্র অনুকূলে না হলেও জীবন সৃষ্টিকারী এ ধরনের রাসায়নিক পদার্থের জন্ম হতে পারে।" বিশ্বে বুদ্ধিমান সভ্যতার সংখ্যা কতো হতে পারে তা বের করার জন্য একটি সমীকরণ আছে যার নাম *ড্রেক সমীকরণ*। আসলে এই সমীকরণে অনেকগুলি সম্ভাবনা গণনা করা হয়। যেমন—ছায়াপথে নতুন তারা তৈরির হার; সেসব তারার গ্রহব্যবস্থা থাকার সম্ভাবনা ; সেসব গ্রহব্যবস্থার যেসব গ্রহে প্রাণের অনুকূল পরিবেশ (যেমন গ্রহের তাপমাত্রা ৩০০ কেলভিনের কাছাকাছি এবং তরল দ্রাবক, যেমন পানির, উপস্থিতি ইত্যাদি) আছে তার গড় সংখ্যা ; সেইসব গ্রহে প্রাণের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা ; এইসব প্রাণধারণে সক্ষম গ্রহসমূহে বুদ্ধিমান প্রাণ আবির্ভাবের সম্ভাবনা ; তাদের আন্তঃনাক্ষত্রিক যোগাযোগের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা ; এবং অতঃপর এইসব সভ্যতার গড় আয়ুষ্কাল ইত্যাদি। এইসব সম্ভাবনা সম্ভাব্য নক্ষত্রের বিশাল মানকে অনেক কমিয়ে দেয়। বিভিন্নজনের হিসাবে এই বুদ্ধিমান সভ্যতার সংখ্যা ১০০ থেকে এক লক্ষ হতে পারে। সম্ভাবনার মানগুলি আসলে কাল্পনিক; এদের সঠিক মান জানতে হলে আরো তথ্যের প্রয়োজন। সম্প্রতি এমন অনেক তারা পাওয়া গিয়েছে যাদের ঘিরে গ্রহ-ব্যবস্থা আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৯৫ সালে প্রথম এ ধরনের গ্রহ সম্বলিত তারা আবিষ্কৃত হয়। এরকম আটটি তারার, যাদের নিশ্চিতভাবে গ্রহ-ব্যবস্থা আছে, সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিচের সারণিতে দেওয়া হলো :

তারার নাম	ভর (বৃহস্পতির তুলনায়)	পর্যায়কাল (দিন)	অর্ধবৃহদাক্ষ (জ্যোতির্বিদ্যার এককে)	দূরত্ব (পারসেক)
এইচডি ৭৫২৮৯	০.৪২	৩.৫১	০.০৪৬	২৮.৯৪
৫১ পেগাসি	০.৪৭	৪.২২৯৩	০.০৫	১৫.৩৬
রো-১ ৫৫ ক্যাংক্রি	০.৮৪	১৪.৬৪৮	০.১১	১২.৫৩
রো কোরোনা বোরিয়ালিস	১.১	৩৯.৬৪৫	০.২৩	১৭.৪৩
১৬ সাইগ্নি-বি	১.৫	৮০৪	১.৭	২১.৬২
৪৭ আর্সা মেজরিস	২.৪১	৩.০বছর	২.১	১৪.০৮
টাও বুটিস	৩.৮৭	৩.৩১২৮	০.০৪৬২	১৫.৬
৭০ ভার্জিনিস	৬.৬	১১৬.৬	০.৪৩	১৮.১১

এই তারাদের ভর নিয়ে এখনো বেশ সন্দেহ আছে। এদের সম্পর্কে দুটো তথ্য বেশ আশ্চর্যজনক। প্রথমত, দুটো নব-আবিষ্কৃত গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার (অথচ সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের কক্ষপথ প্রায় গোলাকার)। দ্বিতীয়ত, অনেক গ্রহই তাদের নক্ষত্রের খুব বেশি কাছে - বুধ সূর্যের যতোখানি কাছে তার চেয়েও কাছে। এই গ্রহগুলি এতোবেশি ভরবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এরা নক্ষত্রের এতো বিপজ্জনক কাছে থেকে ঘুরছে তা বিস্ময়কর। এই ব্যাপারগুলি বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলছে। তাছাড়া এখন পর্যন্ত গ্রহ, অতি-গ্রহ (সুপার-প্লানেট) এবং ধূসর বামনতারার (ব্রাউন ডোয়ার্ফ) মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। ধূসর বামনতারা হলো এমন এক ধরনের তারা যাদের ভর সাধারণত বৃহস্পতির চেয়ে কিছু বেশি হয়। এ ধরনের তারায় ভর ও তাপমাত্রা কম থাকায় তাপ-কেন্দ্রীন বিক্রিয়া, অর্থাৎ হাইড্রোজেনের দহন, শুরু হতে পারে না। তাই এদের বলা হয় 'না-জ্বলা নক্ষত্র'। তবে প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে এধরনের তারা ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে ; একসময়ে সংকুচিত ও ঠাণ্ডা হয়ে ধূসর বামনতারা গঠন করে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বৃহস্পতির ১৩ গুণের চেয়ে কম ভারি বস্তু যাদের ডিউটেরিয়াম দহন ঘটে না তারা নিশ্চিতভাবে গ্রহ। এই ধরনের গ্রহ আছে এমন তারার সংখ্যা ৩০টিরও বেশি। তাছাড়া অতিসম্প্রতি জোড়াতারাকে ঘিরে ঘূর্ণ্যমান গ্রহের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এই তথ্য বিজ্ঞানীদেরকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। এমনকি গ্রহ-ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রচলিত তত্ত্বও আজ যাচাই করে দেখার সময় এসেছে বলে মনে হচ্ছে। সম্প্রতি একশৃঙ্গীমণ্ডলের (মনোসেরোস) একটি তারার এবং তিমিমণ্ডলের (সিটাস) একটি তারার পাশে যথাক্রমে শনিগ্রহের আশি শতাংশ ও সত্তর শতাংশ ভরবিশিষ্ট দুটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের বেশ উৎফুল্ল করেছে এ কারণে যে আরো ছোট গ্রহের উপস্থিতিও মোটামুটি অপরিহার্য। সৌরজগতের বাইরে গ্রহ প্রাপ্তি সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্যের জন্যে ইন্টারনেটের Extra-Solar Planet Encyclopedia ওয়েবসাইটটি দেখা যেতে পারে এর ঠিকানা এ বইয়ের শেষে "জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি ওয়েবসাইট"-এ দেয়া হয়েছে।

দূর-দূরান্তের নক্ষত্রের নিকটবর্তী গ্রহ খুঁজে বের করা অনেক কঠিন কাজ। এতো দূর থেকে এদেরকে চিহ্নিত করা খুব মুশকিল কারণ এরা এদের তারার প্রচণ্ড উজ্জ্বলতায় হারিয়ে যায়। কেবলমাত্র বৃহস্পতির কাছাকাছি ভরবিশিষ্ট হলে তবেই এরা তারার চলার পথকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। ফলশ্রুতিতে এই তারাগুলি টলতে টলতে চলে। এতে করে তারার আলোর বর্ণালির বেশ পরিবর্তন হয়। এই বৈশিষ্ট্য থেকেই এই তারাদের কাছাকাছি গ্রহ আছে বলে সনাক্ত করা যায়। গ্রহের ভর যথেষ্ট হলে এই প্রভাব পর্যবেক্ষণে ধরা দেবে। তাই মনে হয় কোনো তারার আশেপাশে পৃথিবীর অনুরূপ ছোট গ্রহকে দেখার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। ২০১০ সাল নাগাদ মহাশূন্যে স্থাপিত ইন্টারফেরোমিটার Terrestrial Planet Finder কাজ শুরু করলে আরো বহির্জাগতিক গ্রহ আবিষ্কৃত হবে বলে আশা করা যায়।

বহির্বিশ্বে প্রাণের সন্ধান মানুষ করতে শুরু করেছে এই মাত্র কদিন হলো। এই সংক্রান্ত যেকোনো গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের সাধারণ নাম হলো 'সেটি' (Search for Extraterrestrial Intelligence)। এর অন্তর্গত একটি প্রজেক্ট হলো ওজমা প্রজেক্ট যার পরিচালক ছিলেন ফ্র্যাংক ড্রেক। একাজে নানাধরনের বেতার দুরবিন ব্যবহার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। উক্ত বিশেষ প্রজেক্টটিতে ১.৪২ গেগাহার্জ কম্পাংকে টাও সেটি এবং এপসাইলন এরিডানি নামের তারাকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। 'সেটি'র অধীনে মহাশূন্যকে বিভিন্ন কম্পাংকের মাইক্রোতরঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিশেষ করে ১ থেকে ১০০ গেগাহার্জ কম্পাংকে। কারণ এই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে আনুষঙ্গিক রেডিও গোলমাল (নয়েজ) তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এই কম্পাংকের পরিসরে ফরমালডিহাইড, ফরমিক অ্যাসিড এবং পানির সংকেত অন্তর্ভুক্ত। বহির্বিশ্বে প্রাণের সাথে যোগাযোগের একটি বড় অন্তরায় হলো আলোর নির্দিষ্ট দ্রুতি এবং নক্ষত্রদের মধ্যের অকল্পনীয় দূরত্ব। এ জন্যেই যখন আমরা কোনো সংকেত প্রেরণ করি তখন তা অন্য কোনো সভ্যতার কাছে পৌছে আবার এর উত্তর আমাদের কাছে ফিরে আসতে কয়েক শত বছর সময় লেগে যায়। তাই এ কাজে সংকেত প্রেরণের চাইতে বরং সংকেত গ্রহণের ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত। এই কাজে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি বাঘা বাঘা রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি আরেসিবোর বিশাল ৩০০ মিটার ব্যাসের রেডিও টেলিস্কোপটি দিয়ে মৌলিক সংখ্যার ক্রম (২, ৩, ৫, ৭.....) ক্রমাগত প্রেরণ করা হয় এই আশায় যে এটি হয়ত কোনো কালে কোনো বুদ্ধিমান সভ্যতার হাতে পড়বে। কারণ মৌলিক সংখ্যার এই ধরনের ক্রম কোনো প্রাকৃতিক উৎস থেকে আসতে পারে না। 'সেটি' এ পর্যন্ত প্রাণের কোনো হদিস পায়নি। তবে গবেষণা থেমে থাকেনি। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা প্রতিনিয়ত করেই যাচ্ছেন। একটা কথা বলে রাখা ভালো, আমরা প্রায়ই যেসব ইউ. এফ. ও. বা এইধরনের অপার্থিব প্রাণীর কাজকলাপের বিবরণ পাই তা আদৌ সত্য নয়—এরা হয় শ্রেফ কাহিনী রচয়িতাদের কাজ নচেৎ কোনো ভৌত ঘটনার ইচ্ছামূলক বিকৃত বিবরণ। টিভিতে *এক্স-ফাইলস* সিরিজে যেসব অতিপ্রাকৃত রোমহর্ষক ঘটনা দেখানো হয় সেগুলিরও প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

পৃথিবীর প্রাণের এই বিচিত্র সম্ভারের উৎস খুঁজতে গিয়ে আজকাল আমাদেরকে দূর আকাশের দিকে তাকাতে হচ্ছে। জীবনের প্রয়োজনীয় জৈব উপাদান সম্ভবত পৃথিবীর নিজস্ব সম্পদ নয়। বোধহয় এর উদ্ভব সুদূর কোনো আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে এবং তারপর এটি পৃথিবীতে এসেছে কোনো গ্রহাণু বা উল্কার পিঠে চড়ে। সৌভাগ্যবশত অবিকৃত অবস্থায় তা পৃথিবীর পরিবেশে চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নেয়। আর তারপর বিবর্তনের ক্রমধারায় বিকশিত হয় সবুজ জীবন। মানুষ সেই সবুজ পল্লবিত জীবনের অন্যতম অভিনেতা। কবিগুরুর কবিতায় :

এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়.....
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি, ...
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা.....
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।।

বিশ্বের সৌন্দর্য

বর্তমান বইয়ের বিভিন্ন অংশে আমরা মহাবিশ্বের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েছি। আমরা জানি যে লক্ষ কোটি নক্ষত্রের এক অসাধারণ মিলনমেলায় আমাদের বাস, আমাদের বসতি। আমাদের চারিদিকে অগুণতি তারা, গ্যালাক্সি আর নীহারিকা বিস্তৃত আর বিধৃত হয়ে আছে। কবির প্রাণ যেখানে আশ্রয় খোঁজে কাব্যে :

আকাশ ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানি আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।

আমাদের সবার চেতনার গহীন বিস্ময় তখন কবির কণ্ঠে স্বগতোক্তির মতোন বেজে ওঠে। মহাবিশ্ব এক অনির্বচনীয় আনন্দের উৎস। এই আনন্দ আসে অনন্ত সৌন্দর্য থেকে। বস্তুগতভাবে রূপকল্পিত এই বিস্ময়ের মহাবিশ্ব-রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে অতিতপ্ত, জমাটবদ্ধ গ্যাস আর ধূলিকণার প্রলয়ে। এই জমাট গ্যাসের আধার হলো বিচিত্র রকমের নক্ষত্র। অনেক নক্ষত্র মিলে গ্যালাক্সি আর গ্যালাক্সিদের জোট হলো গ্যালাক্সিস্তবক। এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি আকারে যেমন কল্পনাতীত বিশাল, এদের মধ্যের দূরত্বও তেমনি অকল্পনীয়। মহাবিশ্বের অনন্ত বিস্তৃতির প্রেক্ষাপটে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কল্পনা আমাদের নিয়ে যায় রোমাঞ্চকর অনুভূতির এক আশ্চর্য রূপময়তায়। রোমান্টিকতার এক অসাধারণ রূপক মহাকাশের এইসব নক্ষত্রেরা। প্রয়াত মহাকাশবিদ কার্ল সেগান তাঁর সাড়া জাগানো বই '*কসমস*'-এ এরকমই ইঙ্গিত দিয়েছেন:

> *"বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে সামান্যতম চিন্তাও আমাদের বিচলিত করে —মেরুদণ্ডে শিহরণ জাগায়, হঠাৎ চুপ করে যেতে ইচ্ছে হয়। এমন একটা ক্ষীণ অনুভূতি আসে যেন বহু উঁচু থেকে পড়ার একটা দূরবর্তী স্মৃতি। বোঝা যায় যে আমরা গভীরতম রহস্যের দিকে এগিয়ে চলেছি।"*

মানুষের ক্ষুদ্রতা এখানেই প্রকটতর।

মানুষের অস্তিত্বের এই নিতান্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতার সামান্যতা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বিপুল বিস্তৃত মহাবিশ্বের অনন্ত পরিপ্রেক্ষিতের চেতনা ও দর্শনে, অভিব্যক্তিতে ও প্রেষণায়। আসিরীয় সভ্যতার সময় থেকেই এই প্রেষণার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় প্রায় চার হাজার বছর আগে নিকটপ্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষেরাই প্রথম আকাশের কথা ভাবতে শুরু করে। এই অঞ্চলের একটি গুহায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের হাতে আঁকা ছবি পাওয়া গেছে। মানুষ হয়ত আরো আগেই আকাশকে দেখেছে। কিন্তু জানা আর বোঝার শুরু সম্ভবত তখনই। প্রাচীন পর্যবেক্ষকরা দেখলেন কোনো নির্দিষ্ট (বা একগুচ্ছ) তারা আকাশে দেখা দিলে কোনোটির জন্য হচ্ছে বন্যা, কোনোটির জন্য বা খরা। যেমন প্রাচীন মিশরে যখন ভোররাতে অর্থাৎ সূর্য ওঠার আগে আকাশে সিরিয়াস বা লুব্ধক দেখা যেতো তখন নীলনদে বন্যা হতো। এই পর্যবেক্ষণ থেকে মিশরীয় জ্যোতিষরা সিদ্ধান্ত নেয় যে সিরিয়াস বন্যার জন্যে দায়ী। এভাবে জ্যোতিষ্ককে ভাগ্যের জন্য দায়ী করা হয়

এবং এর আরো পরে কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস ও গণিত সম্পৃক্ত হয়ে গড়ে উঠল জ্যোতিষশাস্ত্র। পরবর্তীকালে এর থেকে বিশুদ্ধ যুক্তির (গণিতের) অংশ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গড়ে উঠল আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান। আদিম পর্যবেক্ষকরা আকাশের কতকগুলি তারা নিয়ে মন গড়া ছবি কল্পনা করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট পুরাণও রচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারাচিত্রে যেসব নক্ষত্রমণ্ডলী কল্পিত হয়েছে সেগুলির কোনো ভৌত তাৎপর্য নেই। কেবল আমাদের দৃষ্টিরেখা বরাবর বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত থাকে বলেই এমনটি কল্পনা করা যায়। একই রাশির অন্তর্গত বিভিন্ন তারার দূরত্বও বিভিন্নরকম। এসব তারাচিত্র সুপ্রাচীন মোসোপটেমীয় সভ্যতা থেকে আজো প্রচলিত আছে। অথচ পৃথিবীর অয়নচলনের (precession) জন্য এদের ভৌত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেকখানি। গ্রীসে হেলেনীয় সভ্যতার সময়ে সূর্যের মহাবিষুব (vernal equinox) ঘটতো মেষরাশিতে। অর্থাৎ ২১শে মার্চ সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশ করতো এবং নববর্ষ শুরু হতো। কিন্তু অয়নচলনের জন্য সেটি এখন ঘটে মীনরাশিতে। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে রাশিচক্র এবং ৪১৯ অব্দে কোষ্ঠিবিচার শুরু হয়। ফলিত জ্যোতিষের চর্চাও শুরু হয় এখান থেকে। বলা হয়, প্রাচীন পারসিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জরথুস্ত্র (বা জোরোস্টার) ফলিত জ্যোতিষের চর্চা শুরু করেন। সেই থেকে এই চর্চা অব্যাহত আছে আজো। কিন্তু এ ভাবনাটি হাস্যকর যে, কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্ররাশি পৃথিবীর কোনো ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারণ করছে। অবশ্য অজ্ঞাত কারণে বিশেষ করে মেয়েরা আজো হাতের রেখায় যথেষ্ট বিশ্বাস রাখে। কাজেই যারা তাদের নরম হাতের পরশে ধন্য হতে চান তাদের জন্য হস্তরেখার তাৎপর্য বিশ্লেষণ জরুরি বৈকি!

বিশ্বের সমগ্র সাংগাঠনিক স্তরেই রয়েছে কাঠামোর সুশৃংখল বিন্যাস। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে কাঠামো বিন্যাসের এই প্রকৃতি আমাদের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটি দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত প্রশ্ন করা যায়: *The Universe is either a Chaos or a Cosmos*। আসলে এটি একটি যৌক্তিক হেত্বাভাস (fallacy)। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর গ্রীক কবি হেসিওড লিখিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ থিওগোনীতে প্রাচীন গ্রীসের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এর বর্ণনানুসারে জানা যায় প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করতো যে সৃষ্টির প্রথম অবস্থা ছিল 'ক্যাওস' (Chaos)। এটি সর্বপ্রথমে সৃষ্ট হয়। সৃষ্ট হওয়ার পর ক্যাওস 'নাইট' নামক দেবীর সাথে মিলিত হয়। অন্যান্য দেবতা ও মানুষ আসলে এদেরই সন্তান-সন্ততি। বিশৃঙ্খলা বা ক্যাওস থেকে তৈরি বিশ্ব ছিল সেই গ্রীক বিশ্বাসের অনুসারী যে, অবোধ্য প্রকৃতি খেয়ালী দেবতাদের মর্জিমাফিক চলে। ষষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আয়োনিয়ায় মানবসভ্যতার প্রথম জ্ঞানের স্ফূরণ ঘটল। দেখা গেল, প্রকৃতিকে জানা সম্ভব। প্রকৃতির অন্তরালে রয়েছে নিয়মতান্ত্রিকতার এক সুদৃঢ় ভিত্তি। এমন কিছু বিধি আছে যা প্রকৃতিও অনুসরণ করতে বাধ্য। বিশ্বের এই নিয়মতান্ত্রিক আচরণকে বলা হলো 'কসমস' (Cosmos)। মহাবিস্ফোরণের প্রথম কয়েক মুহূর্তের সেই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা (ক্যাওস) থেকে সময়ের বিবর্তনে বর্তমানের সুশৃঙ্খল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে (কসমস) পরিণত হয়েছে। কাজেই ব্রহ্মাণ্ড এককভাবে ক্যাওসও নয় কসমসও নয়—দুয়ে মিলে এক অনন্য সত্তা। ক্যাওস থেকে কসমসে বিশ্বের এই বিবর্তন একইসাথে অন্ধকার থেকে যুক্তির আলোয় জ্ঞানের উত্তরণও বটে। এই বিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কোনো

প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান নয়। এটি অর্জিত জ্ঞান। প্রায় ছয় হাজার বছর আগে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় আমরা পেয়েছি পৃথিবী-কেন্দ্রিক অ্যারিস্টটল-টলেমীয় বিশ্বচিত্র, পেয়েছি কোপার্নিকাস-গ্যালিলিয়ের বিশ্বচিত্র। যতোই আমরা অগ্রসর হয়েছি ততোই সৃষ্টির নতুন নতুন স্তর উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা ভেবেছি এই বুঝি পরম সত্য।

আধুনিক তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্বসৃষ্টির যে চিত্রটি আমরা তৈরি করতে পেরেছি তা সংক্ষেপে এরকম : মহাবিস্ফোরণ বা বিগ-ব্যাঙের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির মৌলিক বলচতুষ্টয়, ভর-শক্তি, স্থান-কাল এবং দৃশ্যমান সবকিছুরই উৎপত্তি হয়েছে। সেই আদিম আগুনের গোলকের প্রধান উপাদান ছিল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। বিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত ও শীতল হতে থাকলে পদার্থের উপর মহাকর্ষ বল প্রধান্য বিস্তার করে এবং ফলত সৃষ্টি হয় গ্যালাক্সি ও নক্ষত্রমণ্ডলীর। তারার ভেতরে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পুড়ে ভারি পদার্থের সৃষ্টি হয়। নাক্ষত্রিক তন্দুরিতে সৃষ্ট এই ভারি পদার্থ ঐ নক্ষত্রসমূহের মৃত্যুর সময়ে প্রবল বিস্ফোরণের ফলে ছড়িয়ে পড়ে আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে। আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘের গ্যাসের সাথে এটি মিশে যায়। এই মেঘের শীতল, ঘন অংশ থেকে তৈরি হয় নতুন তারার। ঠিক একই রকম পদ্ধতিতে আমাদের গ্যালাক্সির বাইরের দিকের একটি আণবিক মেঘের থেকে সূর্যের জন্ম হয়েছে। এই ভ্রূণ-সূর্যের চারপাশের পাথুরে বস্তুকণা থেকে জন্ম নিয়েছে আমাদের পৃথিবী। আমাদের সৌভাগ্য যে এখানে পানির উপস্থিতি ছিল তিন দশাতেই (কঠিন, তরল ও বায়বীয়)। এই আদিম তরল সমুদ্রে কার্বনভিত্তিক রসায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় প্রাণের। এভাবে একসময়ে বুদ্ধিমান মানুষের আবির্ভাব ঘটে যারা আকাশের দিকে চাইল এবং ভাবতে শিখল। এই মানুষই এক সময়ে বিশ্বের সৃষ্টির রহস্যের জাল ছিঁড়তে আরম্ভ করে। প্রখ্যাত কবি জয় গোস্বামীর কাব্যময় ভাষায়ও ফুঁটে উঠেছে এই মহাজাগতিক ছন্দ। তিনি বলছেন:

"রাত্রির নির্জনে, দিগন্তের ধারে, সমস্ত বিশ্বের স্তব্ধতায়.... আছে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ভাসমান পদার্থপুঞ্জ। এরাই নানা অনুপাতে মিলে গিয়ে তৈরি করেছে আমার শরীর। বিনাশহীন সেই প্রবহমান শক্তিধারার মধ্যে থেকেই আমার সৃষ্টি। জন্ম। আবার বিনাশহীন এই শক্তিধারা, এই আগুন জল বাতাস এবং বাতাসহীন শূন্যের মধ্যেই একদিন মিশে যাবো আমি। সেও আর এক জন্ম। তখন আমি আদি অন্তহারা মহাদেশ। আমি অমৃতের সন্তান। কিন্তু বহমান শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে নিজের এই সম্পর্কের ধারণা আমি বুঝতে পারি কীভাবে? বুঝতে পারি রাত্রিবেলায়। দাঁড়াই যখন ছাতে, খোলা মাঠে। তাকাই যখন আকাশে, মাথার উপর আকাশ জোড়া অন্ধকার থেকে যখন ফুঁটে ওঠে নক্ষত্রপুঞ্জ। জানি, ওরা কেউ কেউ সূর্যের চেয়েও কয়েক গুণ, কয়েকশো গুণ বড়। অতিকায় শক্তির আধার। কোটি কোটি মাইল দূরে, তবু খালি চোখে তাকানো মাত্র দেখতে পাই। যেই দেখতে পেলাম অমনি এক যোগ ঘটল। যুক্ত হলাম আমি তারাজগতের সঙ্গে। কীভাবে? আলোর মধ্য দিয়ে। একবার তাকিয়েই। অত দূরের ওইসব নক্ষত্র, যারা প্রতি মুহূর্তে শক্তি বিকিরণ করছে, ওরা যেমন সত্যি, এই জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র এক মানবশরীর এই আমিও

প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান নয়। এটি অর্জিত জ্ঞান। প্রায় ছয় হাজার বছর আগে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় আমরা পেয়েছি পৃথিবী-কেন্দ্রিক অ্যারিস্টটল-টলেমীয় বিশ্বচিত্র, পেয়েছি কোপার্নিকাস-গ্যালিলিয়ের বিশ্বচিত্র। যতোই আমরা অগ্রসর হয়েছি ততোই সৃষ্টির নতুন নতুন স্তর উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা ভেবেছি এই বুঝি পরম সত্য।

আধুনিক তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্বসৃষ্টির যে চিত্রটি আমরা তৈরি করতে পেরেছি তা সংক্ষেপে এরকম : মহাবিস্ফোরণ বা বিগ-ব্যাঙের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির মৌলিক বলচতুষ্টয়, ভর-শক্তি, স্থান-কাল এবং দৃশ্যমান সবকিছুরই উৎপত্তি হয়েছে। সেই আদিম আগুনের গোলকের প্রধান উপাদান ছিল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। বিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত ও শীতল হতে থাকলে পদার্থের উপর মহাকর্ষ বল প্রধান্য বিস্তার করে এবং ফলত সৃষ্টি হয় গ্যালাক্সি ও নক্ষত্রমণ্ডলীর। তারার ভেতরে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পুড়ে ভারি পদার্থের সৃষ্টি হয়। নাক্ষত্রিক তন্দুরিতে সৃষ্ট এই ভারি পদার্থ ঐ নক্ষত্রসমূহের মৃত্যুর সময়ে প্রবল বিস্ফোরণের ফলে ছড়িয়ে পড়ে আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে। আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘের গ্যাসের সাথে এটি মিশে যায়। এই মেঘের শীতল, ঘন অংশ থেকে তৈরি হয় নতুন তারার। ঠিক একই রকম পদ্ধতিতে আমাদের গ্যালাক্সির বাইরের দিকের একটি আণবিক মেঘের থেকে সূর্যের জন্ম হয়েছে। এই ভ্রূণ-সূর্যের চারপাশের পাথুরে বস্তুকণা থেকে জন্ম নিয়েছে আমাদের পৃথিবী। আমাদের সৌভাগ্য যে এখানে পানির উপস্থিতি ছিল তিন দশাতেই (কঠিন, তরল ও বায়বীয়)। এই আদিম তরল সমুদ্রে কার্বনভিত্তিক রসায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় প্রাণের। এভাবে একসময়ে বুদ্ধিমান মানুষের আবির্ভাব ঘটে যারা আকাশের দিকে চাইল এবং ভাবতে শিখল। এই মানুষই এক সময়ে বিশ্বের সৃষ্টির রহস্যের জাল ছিঁড়তে আরম্ভ করে। প্রখ্যাত কবি জয় গোস্বামীর কাব্যময় ভাষায়ও ফুঁটে উঠেছে এই মহাজাগতিক ছন্দ। তিনি বলছেন:

"রাত্রির নির্জনে, দিগন্তের ধারে, সমস্ত বিশ্বের স্তব্ধতায়.... আছে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ভাসমান পদার্থপুঞ্জ। এরাই নানা অনুপাতে মিলে গিয়ে তৈরি করেছে আমার শরীর। বিনাশহীন সেই প্রবহমান শক্তিধারার মধ্যে থেকেই আমার সৃষ্টি। জন্ম। আবার বিনাশহীন এই শক্তিধারা, এই আগুন জল বাতাস এবং বাতাসহীন শূন্যের মধ্যেই একদিন মিশে যাবো আমি। সেও আর এক জন্ম। তখন আমি আদি অন্তহারা মহাদেশ। আমি অমৃতের সন্তান। কিন্তু বহমান শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে নিজের এই সম্পর্কের ধারণা আমি বুঝতে পারি কীভাবে? বুঝতে পারি রাত্রিবেলায়। দাঁড়াই যখন ছাতে, খোলা মাঠে। তাকাই যখন আকাশে, মাথার উপর আকাশ জোড়া অন্ধকার থেকে যখন ফুঁটে ওঠে নক্ষত্রপুঞ্জ। জানি, ওরা কেউ কেউ সূর্যের চেয়েও কয়েক গুণ, কয়েকশো গুণ বড়। অতিকায় শক্তির আধার। কোটি কোটি মাইল দূরে, তবু খালি চোখে তাকানো মাত্র দেখতে পাই। যেই দেখতে পেলাম অমনি এক যোগ ঘটল। যুক্ত হলাম আমি তারাজগতের সঙ্গে। কীভাবে? আলোর মধ্য দিয়ে। একবার তাকিয়েই। অত দূরের ওইসব নক্ষত্র, যারা প্রতি মুহূর্তে শক্তি বিকিরণ করছে, ওরা যেমন সত্যি, এই জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র এক মানবশরীর এই আমিও

তেমন সত্যি। একটি আলো আমাদের যুক্ত করছে। ওই সব নক্ষত্র, এমন কি না-দেখা সব তারা, যে-উপাদানে তৈরি সেই উপাদান, অন্যভাবে মিশে তৈরি করেছে আমাকেও । আর তখনই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী উপাদানগুলির আত্মীয়তায়, শক্তিপুঞ্জের টানে, আমার শরীর..... বাস্তবের সব চাপ সভ্যতার সব আঘাত, এবং ব্যক্তির খণ্ডিত সীমা ছাড়িয়ে, যেন প্রায় এক স্বপ্নে, বহমান সৃষ্টিধারার মূল শক্তির মধ্যে সে মুক্তি পায়। অতিকায় রূপ ধরে। আকাশ ভেদ করে যায় তার মাথা এবং শেষে, মানবশরীরও তার থাকে না। শরীর তখন মিলিয়ে যায়।"(-মৃত্যুর পর মৃত্যু পেরিয়ে ; সাপ্তাহিক 'দেশ', ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯৮)

রাতের আকাশের ঝলমলে তারার মেলা আমাদেরকে আকর্ষণ করে। মন হারিয়ে যায় এক সুবিশাল ব্যাপ্তিতে। ব্যাপ্তির এই এক মিস্টিক আকর্ষণ রয়েছে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ভাষায়: *"রহস্যই সর্বাতীত সৌন্দর্যের প্রতীক, এই অনুভূতির সাথে যার পরিচয় ঘটেনি, অনন্ত রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যার মন অপার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয় না -ধরতে হবে তার মৃত্যু হয়েছে, মন আর চোখ দুয়েরই"*। আসলে বৃহতের কাছে মানবমন সবসময়েই কেন জানি পরাস্ত হয়। কিন্তু একই সাথে কার্য-কারণ সম্পর্কও মানুষ ঠিক খুঁজে বের করে। এটাই ক্রিটিকাল থিঙ্কিঙের ফল। মিস্টিক ও ক্রিটিকাল—চিন্তার এই দুই পদ্ধতি মানুষকে দ্বন্দ্বের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রশ্ন করা এবং সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা—জ্ঞানের এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে পাথেয় করে মানবসভ্যতা এগিয়ে চলেছে। মানুষ তার চিন্তা-বুদ্ধি-জ্ঞান-মনীষা দিয়ে জ্ঞানসমুদ্রের বালুকাবেলায় দীপ্ত পদচারণা শুরু করেছে।

বিশ্ব দিকনিরপেক্ষ ও সমসত্ত্ব। এই সুসামঞ্জস্যতাই বিশ্বকে অপরূপ করে তুলেছে। বিশ্বের সৌন্দর্য যেমন আবহমানকাল থেকে ব্রাত্য মানুষের চোখে ধরা পড়েছে, তেমনি ধরা পড়েছে বিজ্ঞানীর কাছে গণিতের সূত্রে, কবির কবিতায়, দার্শনিকের চিন্তায়, ভাবুকের ভাবনায়, লেখকের লেখনীতে। সেই অসীম নান্দনিক বিশ্বচিত্র বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন উপমায়, বিভিন্ন চিত্রকল্প, রূপক কিংবা বিমূর্ত প্রত্যয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে আমাদের চিন্তায়-চেতনায়-মননে-কর্মে-বিশ্বাসে এবং উপলব্ধিতে আর অনুভবে। বিশ্ব কেন এতো সুন্দর? কিংবা কার জন্যে এই অপরূপ অপার্থিব মহাজাগতিক সাজ? এ প্রশ্নের উত্তর অনাদিকাল থেকে আজো রয়ে গেছে কুহকী, যাদুগাঁথার কোনো মহাকাব্যের মতোন। বিশ্ব সুন্দর কারণ তা সুন্দর। এই সৌন্দর্যের কোনো তুলনা যেমন নেই তেমনি কোনো কারণও নেই। এটাই অনন্ত বিশ্বের মহাবৈশ্বিক নন্দনতত্ত্ব। ড. কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর অননুকরণীয় গদ্যে অনন্ত মহাবিশ্বের কাব্যিক বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি চমৎকার স্বপ্নের উদ্ধৃতি দিয়েছেন:

> *অনন্ত জগতের কথা চিন্তা করিতে গেলে বুদ্ধি কেন, কল্পনাও আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। স্বপ্নরাজ্যও এই বিশাল, ভয়াবহ, মহান অনন্তকে ধারণা করিতে অক্ষম। এ বিষয়ে জাঁ পল রিশটারের লিখিত একটি চমৎকার স্বপ্নবৃত্তান্ত আছে। কোনো ব্যক্তিকে আকাশের ঘেরাটোপের ভিতর লইয়া গিয়া অনন্ত স্থান-সমুদ্রের ভিতর দিয়া জগতের পর জগৎ দেখানো হইল। অবশেষে*

সম্মুখবর্তী অসীমের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন সে হৃদয়াবেগে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বলিল "স্বর্গীয়দূত ক্ষান্ত হও। আমি আর অগ্রসর হইতে পারি না- এই অনন্তের সম্মুখে আমার চিত্ত ব্যথিত, পীড়িত। বিশ্বপিতার অপার মহিমা অসহনীয়। আমাকে এখন অনন্ত, উন্মুক্ত, ব্যাপ্তির নির্যাতন হইতে রক্ষা কর- আমি যে ইহার কোনো শেষ দেখিতেছি না"। তখন স্বর্গীয়দূত তাঁহার উজ্জল হস্তের সঙ্কেতে ঐ আকাশের মহাকাশের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "বিশ্ব-স্রষ্টার জগতের অন্ত কোথাও নাই ; আর ঐ দিকে দেখ ইহার আদিও নাই।" (-অসীমের সন্ধানে)

অতলান্তিক স্বপ্নবোধের আধার এই যে মহাবিশ্ব, তার গাঢ় ও গহীন সৌন্দর্যের কথা পবিত্র কোরআন শরীফের একটি আয়াতে এক অন্যতর ব্যঞ্জনায় প্রতিফলিত হয়েছে :

"তুমি -- সৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমার দৃষ্টি তোমারই কাছে ফিরে আসবে ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে"।। (৬৭ :৩৯)

শেষের অধ্যায়

মহাবিশ্বের অসীম শূন্যতার মাঝ দিয়ে অবশেষে আমরা আমাদের মহাজাগতিক যাত্রার শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছি। সভ্যতার প্রথম ক্ষণ থেকে মানুষ জ্ঞানার্জনের যে বীজ বপন করেছিল তারই শস্য আজ আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছোচ্ছে। কিন্তু মানুষ তার যাত্রা কখনো থামায় না। নতুনের সন্ধানে অজানাকে জানতে সে সব সময়েই তৎপর। কারণ মানুষের অন্তরে বাস করে একটি শিশু যে সদা কৌতূহলী। এই কৌতূহলই মানুষকে বারবার অনন্ত যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। তাই বিংশ শতাব্দীর মানুষ এই থার্ড মিলেনিয়ামের দ্বারপ্রান্তে এসে শুরু করেছে এক মহাযাত্রার। আমরা আসলে এই মহান 'স্পেস ওডেসী'র প্রথম অধ্যায়ের দর্শকমাত্র। এই মহাকাব্যের রচনা শুরু হয়েছে কেবল। কবে এর শেষ আমরা তা জানি না; আদৌ শেষ হবে কিনা তাও জানা নেই। ভবিষ্যতের মানুষ হয়ত এর উত্তর দেবে। অনন্ত বিস্তৃত মহাকাশ তার অসীম রহস্যের ডালা সবে খুলতে শুরু করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে সাথে এই রহস্যেরও সমাধান হতে শুরু করেছে। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন মহাকাশ হয়ে উঠবে মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র— স্পেস ওডেসীর প্রথম অধ্যায়ে এই আশাবাদ অন্তত ব্যক্ত করা চলে।

প্রয়াত জ্যোতির্বিদ কার্ল সেগানের (১৯৩৪-১৯৯৬) অননুকরণীয় রোমান্টিক ভাষ্য দিয়ে ***'মহাকাশের কথা'*** *শেষ করা যায় :*

> *" If you look at [the image of the Earth, from deep space], you see a dot, That's here. That's home, That's us. On it, everyone you have ever heard of, every human being who ever lived, lived out their lives. The aggregate of all our joys and sufferings, thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilizations, every king and peasant, every young couple in love, every teacher of morals, every mother and father, every inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species, lived [there] on a mote of dust, suspended in a sunbeam.*
>
> *The Earth is a very large stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and in triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of the dot on scarcely distinguishable inhabitants of some other corner of the dot. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged*

position in the universe, are challenged by this point of pale light.

Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity— in all this vastness— there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. It is up to us. It's been said that astronomy is a humbling, and I might add, a character-buiding experience. To my mind, there is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, [this distant image] underscores our responsibility to deal more kindly and compassionately with one another and to preserve and cherish that pale blue dot, the only home we've ever known."

গ্রন্থসূত্র

সাধারণ পাঠকের জন্যে ঃ

- ❑ *মহাকাশে কী ঘটছে– আবদুল্লাহ আল মুতী, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।*
  মহাকাশ সম্বন্ধে এটি একটি অসাধারণ বই। মহাবিশ্বের প্রায় সকল বস্তু ও ধর্মাবলী নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলায় লেখা সাধারণ পাঠকের জন্য এর চেয়ে সহজ বই আর হতে পারে না। মহাকাশ সম্পর্কে আগ্রহী সকলেরই এ বইটি পড়া উচিত।
- ❑ *সৌরজগত— সুব্রত বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, তৃতীয় সংস্করণ।*
  সৌরজগত নিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করা হয়েছে এ বইটিতে। অনেক সাম্প্রতিক ও ঐতিহাসিক তথ্য এখানে পাওয়া যাবে। বইটি নিঃসন্দেহে সংগ্রহে রাখার মতো।
- ❑ *আকাশ ভরা সূর্যতারা— ড. এ. এম. হারুন-অর-রশীদ, আহমদ পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৮।*
  সূর্যের জন্ম ও মৃত্যু—জর্জ গ্যামো, অনু. আলী আসগর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
  নক্ষত্রের বিভিন্ন ধর্মাবলী, ভৌত প্রকৃতি, তারাবর্ণালি ইত্যাদি নিয়ে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা প্রথম বইটিতে করা হয়েছে। দ্বিতীয় বইটিতে নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু, বিশেষ করে সূর্যের, সহজভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই বইটি এখন বাজারে দুর্লভ।
- ❑ *Comets—Carl Sagan & Ann Dryan, 1986.*
  ধূমকেতু—ড. আলী আসগর, ঢাকা, ১৯৮৫।
  প্রথম বইটিতে ধূমকেতু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেগানের অনবদ্য আলোচনার সাথে যুক্ত হয়েছে ধূমকেতু সংক্রান্ত সার্বিক তথ্যাদি এবং সেই সাথে অসংখ্য ছবি। দ্বিতীয় বইটি কিশোরদের জন্যে বিশেষ উপযোগী। কিশোরদের জন্য আরেকটি উপযোগী বই হলো জাহিদ হাসানের লেখা *এসো ধূমকেতুর রাজ্যে।*
- ❑ *জ্যোতির্বিজ্ঞান শব্দকোষ—ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।*
  জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত যেকোনো শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য এই বইটি দেখা যেতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠক যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুমাত্র জানতে চান তাদের জন্য একটি মূল্যবান সহায়ক হিসেবে এই বইটি কাজে দেবে।
- ❑ *পদার্থবিজ্ঞানে বিপ্লব— ড. এ. এম. হারুন-অর-রশীদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।*
  পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে ভালো সাধারণ আলোচনার জন্য বইটি জরুরি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব সহজে আলোচনা করা হয়েছে।
- ❑ *বিশ্ব ও সৌরজগত— মোঃ আবদুল জব্বার, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৬।*
  মহাবিশ্ব নিয়ে এখানে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। মহাকাশ সম্পর্কে বাংলায় লেখা প্রথম দিককার বই। বাংলাদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ প্রফেসর জব্বারের এই বইটিতে অনেক তথ্যই এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে।
- ❑ *জানবার কথা, প্রথম খণ্ড (মহাবিশ্ব)—ড. রমাতোষ সরকার, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ভারত, ১৯৭৯।*
  বেশ পুরনো বই। উপরের বইটির মতোই, তবে সৌরজগত বিষয়ে প্রায় কোনো আলোচনাই নেই। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে।

- ***মহাবিশ্বে ভ্রমণ—জয়ন্ত নারকিলার, রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশান্স, কোলকাতা।***
  Inside stars— Biman Basu, Publication & Information Directoret, CSIR. New Delhi.
  কিশোরদের উপযোগী অসাধারণ দুটি বই। প্রথমটিতে বিশেষ করে কসমোলজির বিভিন্ন তত্ত্ব প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু নক্ষত্র ও তার বিবর্তন। দুটো বইয়ের ভাষাই সহজবোধ্য।
- *Cosmos— Carl Sagan, Ballantine Books, 1992.*
  মহাকাশ সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকের তো বটেই সকলের জন্যই অবশ্যপাঠ্য একটি বই। কার্ল সেগান তাঁর বিখ্যাত কাব্যিক ঢঙে এখানে বর্ণনা করে গেছেন বিশেষ করে সৌরজগতের নানা বিষয়। তারাদের জীবন-মৃত্যু নিয়েও আলোচনা আছে। একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই উচিত এ বইটি সংগ্রহে রাখা।
- *A Brief History of Time—Stephen Hawking, Bantam Books. 1988.*
  এটিও উপরের বইটির মতো সকলের অবশ্যপাঠ্য একটি বই। আধুনিককালের বিখ্যাততম বিজ্ঞানীর লেখা এই বইটিতে বিশেষ করে কসমোলজির বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন এটি ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার তালিকার শীর্ষে ছিল। তবে বইটি বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত, নতুবা অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হতে হয়।
- *Prisons of Light: Black Holes— Kitty Ferguson, Cambridge University Press. 1996*
  নক্ষত্রের বিবর্তন এবং কৃষ্ণবিবর নিয়ে বেশ সহজ আলোচনা পাওয়া যাবে। কৃষ্ণবিবর নিয়ে বিশদ করে আলোচনা আছে।
- *Watching the Universe—John Gribbin, Universities Press, India. 1998.*
  এই বই অনেকগুলো মজাদার প্রবন্ধের সংকলন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সহজ ভাষায় লেখা।

মহাকাশ বার্তা পত্রিকাটি সাধারণের জন্যে অত্যন্ত জরুরি একটি পত্রিকা। এ পত্রিকা নিয়মিত পড়লে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক হালের খবর পাওয়া যাবে।

অগ্রসর পাঠকের জন্যে ঃ

- ***কৃষ্ণবিবর— জামাল নজরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।***
  মৌলিক কণা— ড. এ. এম, হারুন-অর-রশীদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।
  মহাকাশের পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে যারা অধিকতর জানতে চান এ দুটি বই তাদের জন্য। আধুনিক টেকনিকাল বর্ণনা সমৃদ্ধ এ বই দুটি সকলেরই কাজে লাগবে। সহজ বাংলায় অনেক জটিল তত্ত্বকে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- ***জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান পরিচিতি—ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০।***
  'মহাকাশের কথা' বইতে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তার অধিকাংশই আগ্রহী পাঠক এই বইটিতে পাবেন অনেক বেশি বিস্তারিতভাবে। কাজেই যারা বিষয়ের গভীরে যেতে চান তারা অবশ্যই এই বইটি পড়ে নেবেন।
- ***অস্তিত্বের অভ্যন্তরে—ড. এস. সফিউল্লাহ, ঢাকা, ১৯৯২।***
  এ বইটিতে কসমোলজি ছাড়াও বিজ্ঞানের আরো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে চমৎকার আধাটেকনিকাল বর্ণনা করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ভৌত ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করেছে যা অনভিপ্রেত।

- *In search of Big Bang— John Gribbin, Corgi Books, 1986.*
  এই বইটিতে কসমোলজির বিভিন্ন খুঁটিনাটি অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। অগ্রসর পাঠকের জন্যে অবশ্যপাঠ্য একটি বই।
- *The Structure of the Universe—J.V. Narlikar, Cambridge University Press, India, 1993.*
  Seven Wonders of the cosmos—J.V. Narlikar, Cambridge University Press, India, 1999.
  কসমোলজির কয়েকটি নির্বাচিত বিষয় নিয়ে প্রথম বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্যালাক্সিদের নিয়ে এখানে ভালো সাধারণ আলোচনা আছে। দ্বিতীয় বইটি মহাবিশ্বের সাতটি বিষয় নিয়ে লেখা। অত্যন্ত সুন্দর একটি বই। সহজ ভাষায় লেখা এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কসমোলজির বেশ কিছু সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা আছে।
- *Evolution of the Universe—I.D. Novikov, Cambridge University Press, 1979.*
  Black Holes and the Universe—I.D. Novikov, Cambridge University Press, 1990.
  প্রথম বইটিতে কেবলমাত্র কসমোলজির কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। গ্যালাক্সি সৃষ্টির বিশদ আলোচনা এখানে আছে। দ্বিতীয়টিতে অধিকতর সহজভাবে কৃষ্ণবিবর ও কসমোলজির নির্বাচিত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- *Black Holes and Time Warps— Kip Thorne, W.W. Norton & Co., 1994.*
  একট অনবদ্য বই। সকল পাঠকের অবশ্য পড়া উচিত। বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা, নক্ষত্রদের সম্পর্কে তত্ত্ব, কৃষ্ণবিবর ও ওয়র্মহোলদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অনেক সাম্প্রতিক তথ্যের আলোচনা এখানে পাওয়া যাবে।
- *The First Three Minutes— S. Weinberg. Fontana Paperback, 1976.*
  বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম কয়েক মুহূর্তের বিশদ বর্ণনা এখানে অ-গাণিতিকভাবে আলোচিত হয়েছে। এটি অগ্রসর পাঠকের পাঠের উপযোগী অবশ্যপাঠ্য একটি বই এবং একটি ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলারও বটে। সম্প্রতি এ বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে 'পাঠক সমাবেশ'।
- *The Ultimate Fate of the Universe - Jamal Nazrul Islam, Cambridge University Press, 1983.*
  উপরের বইটির একটি সিকোয়েল এই বইটি। বিশ্বের অন্তিম নিয়তির অনেক খুঁটিনাটি এখানে অত্যন্ত সহজভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
- *Contemporary Astronomy - J. M. Pasachoff, Sanders College Publishers, 1981.*
  Astronomy: The Cosmic Perspective - Zeilik & Gaustad, J. Wiley & Sons, 1990.
  এ দুটি বই জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথাগত জ্ঞান আহরণের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। শেষোক্ত বইটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অনেক সাম্প্রতিক তথ্য এতে পাওয়া যায়।

অগ্রসর পাঠক Scientific American, Astronomy ও Sky & Telescope এ পত্রিকা তিনটি পড়ে দেখতে পারেন। এছাড়া **Encyclopedia Britannica, Mc-Graw Hill Encyclopedia of Science & Technology** ও **Cambridge Atlas of Astronomy** এ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে প্রভূত তথ্য আছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ওয়েবসাইট

- NASA : http ://www.nasa.gov
- JPL : http ://www. jpl. nasa. gov
- Cambridge University Cosmology site : http ://www. damtp. cam. ac. uk/user/gr/public/index. html
- National Solar Observatory : http ://www. sunspot. noao. edu/index . html
- Scientific American : http ://www. sciam. com
- Nature : http ://www. nature.com
- Astronomy : http ://www. kalmbach.com/astro/ astronomy.html
- The Astronomy cafe : http ://www2. ari.net/home/ odenwald/cafe.html
- Hipparcos Astrometry Mission : http:// astro.estec.esa.nl/ SA-general/Projects/Hipparcos/hipparcos.html
- Usenet Relativity FAQS : http ://www.math.ucr.edu/ home/baez/ gr/gravity.html
- General Relativity by John Baez : http://math.ucr.edu/ home/baez/ gr/outline1.html
- FAQs on black Hole : http://cfpa.berkeley.edu/ BHfaq.html
- Cosmology Tutorial : http ://www.astro.ucla.edu/~wright/ cosmology-faq.html
- American Astronomical Society : http ://www.aas.org/
- Latest HST pictures : http ://www.oposite.stsci.edu/ pubinfo/latest.html
- Views of Solar System : http://bang.lanl.gov/solarsys/ eng/host.html
- Extra-Solar Planet Encyclopedia : http ://www.obspm.fr/ encycl/encycl.html
- Spacelink : http://nyquist.ee.ualberta.ca/~wanigan/ spacelink/space-link.html
- Yahoo Astronomy Site : http://dir.yahoo.com/Science/ Astronomy & http://dir.yahoo.com/Science/Astronomy/ Web-directories/
- Links to Astronomy : http ://www.cvc.org/astronomy/i ndex.htm
- Pular's Astronomy Links-a huge list: http ://www.users.dircon.co.uk/ ~jmwebb/links.html
- Pulsar Site : http ://www.jb.man.ac.uk/~pulsar or http:// pulsar. princeton.edu/rpr.shtml
- Expanding Unverse : http ://www.tpl.toronto.on.ca/TRL/astronomy/TERMS. HTM
- The Particle Adventure Homepage : http://pdg.lbl.gov/cpep/adventure_home.html

NB. The addresses of the websites mentioned above are subject to change. So if any URL address fails to connect don't panic. Try another site. It is advised in any case to connect to the Yahoo Astronomy Site, which contains a large list of many interesting astronomy sites.

সৌরজগতের তথ্যাবলী

	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (মিলিয়ন কি.মি.)	৫৭.৯০৯	১০৮.২	১৪৯.৬	২২৭.৯৪	৭৭৮.৪	১৪২৩.৬	২৮৬৭.০	৪৪৮৮.৪	৫৯০৯.৬
ঘূর্ণনের নাক্ষত্রিক পর্যায় (দিনে) (sidereal period)	৮৭.৯৬৯	২২৪.৭০১	৩৬৫.২৫৬	৬৮৬.৯৮	৪৩৩২.৫৯	১০৭৫৯.২	৩০৬৮৮.৪	৬০১৮১.৩	৯০৪৬৯.৭
(ক্রান্তীয় বছরে)	০.২৪	০.৬১৫	১.০০০০৪	১.৮৮	১১.৮৬	২৯.৪৬	৮৪.০২	১৬৪.৭৭	২৪৭.৭
ঘূর্ণনের যুতিকাল (synodic period) (দিনে)	১১৫.৮৮	৫৮৩.৯২	-	৭৭৯.৯৪	৩৯৮.৮৮	৩৭৮.০৯	৩৬৯.৬৬	৩৬৭.৪৯	৩৬৬.৭৩
ভর (কিলোগ্রাম)	৩.৩X১০^{২৩}	৪৮.৭X১০^{২৩}	৫৯.৭৪X১০^{২৩}	৬.৪১৯X১০^{২৩}	১৮৯.৯X১০^{২৫}	৫৬.৮৬X১০^{২৫}	৮.৬৬X১০^{২৫}	১০.৩X১০^{২৫}	৬.X১০^{২১} থেকে ১.৬X১০^{২২}
গড় ঘনত্ব (গ্রাম/সে. মি. ^{৩})	৫.৪৩	৫.২৪	৫.৫২	৩.৯৪	১.৩১৪	০.৬৯	(১.৩)	১.৭৬	(০.৬-১.৭)
অক্ষীয় ঘূর্ণনের পর্যায় (d=দিন, h=ঘন্টা)	৫৮.৬৫d	২৪৩.০১d	২৩.৯৩h	২৪.৬২২৯h	৯.৮৪১h	১০.২৩৩h	১৭.৯h	১৪.২h	৬.৩৮h
কক্ষীয় তলের সাথে বিষুবরেখার আনতি	০°	১৭৭.৩°	২৩.৪৪°	২৫.১৯°	৩.০৮°	২৬.৭৩°	৯৭.৯২°	২৮.৮°	১২২.৪৬°
বিষুবীয় অঞ্চলে g-এর মান (মি./সে.^{২})	৩.৭৯	৮.৮৬৯	৯.৭৯৮	৩.৭২	২২.৮৮	১০.৫৯	৭.৭৭	১১.৬১	(৪.৩)
বিষুবীয় অঞ্চলে মুক্তিবেগ (মি./সে.)	৪.৩	১০.৪	১১.২	৫.০	৫৯.৫	৩৫.৬	২১.২২	২৩.৩	(৫.৩)
গড় কক্ষীয় গতিবেগ (কি.মি/সে.)	৪৭.৮৯	৩৫.০৩	২৯.৭৯	২৪.১৩	১৩.০৬	৯.৬৪	৬.৮১	৫.৪৩	৪.৭৪
উপকেন্দ্রিকতা	০.২০৫	০.০০৬	০.০১৬	০.০৯৩	০.০৪৮	০.০৫৫	০.০৪৭	০.০০৯	০.২৪৯
উপগ্রহ	-	-	১	২	১৭	২১	১৭	৮	১

বন্ধনীতে লেখা তথ্যে ভুলের সম্ভাবনা ১০%